তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত

দ্বিতীয় খণ্ড

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম্-এ, ডি-লিট্
পদ্মবিভূষণ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান

নিবেদন

'তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের জন্য আমরা তৎপর হইয়াছিলাম কিন্তু নানা বাধাবিঘ্নের দরুণ এতদিন তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। প্রধানতঃ পূজনীয় আচার্যদেবের শারীরিক অসুস্থতা ও বার্ধক্যজনিত অসামর্থ্যের দরুণ তাঁহার নিকট হইতে সাক্ষাৎভাবে সব লেখাগুলি সংগ্রহ করিয়া সুসম্বদ্ধভাবে যেরূপে প্রকাশ করার পরিকল্পনা ছিল, তাহা আর সম্ভব হইয়া উঠে নাই। তবু নবতিবর্ষের প্রান্তে উপনীত হইয়াও তিনি তাঁহার প্রজ্ঞাজ্যোতি যেভাবে বিকিরণ করিয়া চলিয়াছেন, তাহা হইতে যতটুকু সম্ভব চয়ন করিয়া এবং পূর্বে ইতস্ততঃ প্রবন্ধাদিরূপে তান্ত্রিক সাধনা সম্বন্ধে প্রকাশিত লেখাগুলির কিছু সংকলন করিয়া আমরা এই দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। ইহা ছাড়াও তাঁহার আরও বহু অমূল্য লেখা রহিয়া গেল, যাহা ভবিষ্যতে হয় তো কোনোদিন প্রকাশিত হইবে।

প্রথম খণ্ডে প্রধানতঃ অদ্বৈত শৈবাগম ও শাক্তাগমের দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্তের বহু নিগূঢ় রহস্যের উপর পূজনীয় আচার্যদেব আলোকপাত করিয়াছেন। এই খণ্ডের প্রথম দিকে বৌদ্ধ তন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার একটি বিশেষ মূল্যবান্ প্রবন্ধ আমরা উপস্থাপিত করিলাম। ইহাতে বুঝা যাইবে যে তান্ত্রিক সাধনার ধারা কতদূর ব্যাপক ছিল এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু—যাহাদের আমরা দর্শনের ক্ষেত্রে নাস্তিক ও আস্তিক এই দুই বিরুদ্ধ গোষ্ঠীভূত বলিয়া মনে করি, তাঁহারা তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্রে একই পথের পথিক এবং এক হিসাবে পরস্পরের পরিপূরক। ইহা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না যে বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতেই তান্ত্রিক ভাবধারা হিন্দু সাধনায় প্রবেশ করিয়াছিল অথবা হিন্দু তান্ত্রিক ভাবনা দ্বারাই বৌদ্ধরা পরে প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং হীনযান হইতে মহাযানের পথে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। সে যাহাই হোক্ না কেন, একটি বিষয় সুনিশ্চিত যে হিন্দুর মোক্ষ বা বৌদ্ধের নির্বাণ, যিনি যাহাই লাভ করিতে চা'ন তাঁহার পক্ষে তান্ত্রিক সাধনা অপরিহার্য বলিয়াই পরিগণিত ও সর্বজনস্বীকৃত। অদ্বৈত বেদান্তের ধারাতেও আচার্য শঙ্কর এই

সাধনাকে সাগ্রহে ও সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ চতুর্ধামে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার মঠগুলিতে এবং কাঞ্চীকামকোটিপীঠে তাঁহার দ্বারা শ্রীযন্ত্রের গুহ্য উপাসনার প্রবর্তন, যাহা আজও অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। এইভাবে একটু অভিনিবিষ্ট হইয়া লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে ভারতবর্ষে এমন কোনও সম্প্রদায়ই নাই যাঁহারা তান্ত্রিক সাধনার অনুবর্তন করেন না।

অথচ ব্যাপক দৃষ্টির অভাবে আমরা এই মহতী সাধনার ধারাকে সংকীর্ণ ইন্দ্রিয়লালসার পরিতৃপ্তির উপায়রূপেই দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি এবং তান্ত্রিক সাধনা বলিতে অবাধ ভোগলাম্পট্যের কদর্য ধারাকেই বুঝিয়া থাকি এবং সভয়ে তাহাকে পরিহার করিয়া চলি। অনধিকারী অযোগ্য ব্যক্তির তন্ত্রমার্গে প্রবেশেরই এটি কুফল বলিয়া পূজনীয় আচার্যদেব অভ্রান্তভাবেই নির্দেশ করিয়াছেন (পৃঃ ৪৬)। অবক্ষয়ের ফলে প্রেতের এই কঙ্কালমূর্তি দেখিয়া তান্ত্রিক সাধনার গৌরবোজ্জল মহিমার ধারণা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু আমাদের অশেষ সৌভাগ্য যে এই যুগে এমন ঋষিকল্প মহামনীষিবৃন্দের আবির্ভাব ঘটিয়াছে যাঁহাদের দিব্য দৃষ্টির প্রসাদে আমরা আবার নূতন করিয়া আমাদের প্রাচীন সাধনার ধারাকে চিনিতে ও বুঝিতে শিখিতেছি। সদ্য লোকান্তরিত স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী, শ্রীমৎ অনির্বাণ এবং পূজনীয় আচার্যদেব—এই ঋষিত্রয়ের বিস্ময়কর অবদানের কথা হয় তো আমরা এখনও যথাযথভাবে উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারি নাই।

পূজনীয় আচার্যদেব কাশীধামে গঙ্গাতীরে বসিয়া দিনের পর দিন যখন মাতৃকা-রহস্য সম্বন্ধে উপদেশামৃত বর্ষণ করেন, তখন হরজটাজালনিঃসৃত গঙ্গার পাবনী ধারার মত তাহার প্রখর বেগে ও উদ্দাম তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতাম। বলার বেগের সঙ্গে হাতের লেখা তাল রাখিয়া চলিতে পারিত না, অথচ তাঁহাকে থামাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া লেখারও উপায় ছিল না, কারণ তিনি বলিতেন এবং নিজেও উপলব্ধি করিতাম যে সে-সময় একটি current (স্রোতোধারা) চলে, তাহাতে ছেদ পড়িলে বা আঘাত করিলে তাহা রুদ্ধ হইয়া যায়। এইটিই তাঁর দীর্ঘতম শেষ উপদেশ এবং এটি অতি গুহ্য তত্ত্ব বলিয়া তিনি কোথাও প্রকাশ করিতে তখন নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেক মরমী সাধক ইহা দ্বারা উপকৃত হইবেন ভাবিয়া এই অপূর্ব মহোপদেশ

আমরা এখানে প্রকাশ করিয়া দিলাম, এজন্ত তাঁহার কাছে আমি ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

তান্ত্রিক সাধনা বলিতে আমরা শাক্তসাধনাকেই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু শক্তি বলিতে কি বুঝায় তাহার সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের নাই। শক্তিই এখানে মাতৃকা। "মাতৃকা শব্দের অর্থ 'মা'। মাতৃকা বা মহামাতৃকা বিশ্বজননী" (পৃঃ ৫৭)। আচার্যদেবের এই গভীর উক্তির মধ্য দিয়া আমরা তান্ত্রিক সাধনার মর্মবাণীকে উদ্ঘাটিত হইতে দেখি এবং উপলব্ধি করি 'মায়া ও মাতৃকা একই বস্তু', যাহা হইতে এই বিশ্বের অনন্ত বৈচিত্র্যের উৎপত্তি। 'মাতৃকাচক্রবিবেক' নামক প্রাচীন গ্রন্থে তান্ত্রিকের এই উদ্‌ঘোষ তাই অতি সত্য ও যথার্থ—

তস্মাৎ পরৈব জননী সমুপাসনীয়া
ব্যোম্নঃ পরস্য গতজাড্যমিদং হি রূপম্‌।
বধ্নাতি চেয়মিদমংশসমূচ্ছ্রয়েণ
জন্তূন্‌ বিমোচয়তি চোন্নমিতাহমংশাৎ॥

অতএব সেই পরা জননীই তান্ত্রিকের কাছে—শুধু তান্ত্রিক কেন, নিখিল জীবের কাছে—একমাত্র উপাস্যা, কারণ তিনিই 'ইদং' রূপ বিশ্বের বিস্ফারে সকলকে বন্ধন করেন, আবার 'অহং' রূপ চেতনাকে উন্নমিত করিয়া, তুলিয়া ধরিয়া প্রাণিবর্গকে মোচন করেন।

এই মাতৃকার অনুশীলনের নামই জপ। পূজনীয় আচার্যদেব কয়েকটি নিবন্ধে এই জপতত্ত্বের রহস্য উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন—'বুঝে লহ যে জান সন্ধান'। পরিশেষে, এই জপ-সাধনা বা তান্ত্রিক সাধনার ফলরূপে যাহা দেখা দেয় তাহা হইল আত্মার পূর্ণ জাগরণের ফলে দেহসিদ্ধি, বিদেহ-কৈবল্য নহে। পূজনীয় আচার্যদেব এই দেহসিদ্ধি বলিতে কি বুঝায় এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকলপ্রকার আধ্যাত্মিক সাধনায় যে ইহাই চরম ও পরম লক্ষ্যরূপে স্বীকৃত ছিল, তাহা এই খণ্ডের শেষ নিবন্ধটিতে দেখাইয়া দিয়াছেন। এইভাবে তান্ত্রিক সাধনার এবং তাহার সিদ্ধি বা ফলের বিশ্বজনীনতা অভ্রান্তভাবে এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমরা যেন এই 'অজিহ্মা রাজপদ্ধতিঃ'কে, এই সরল রাজমার্গকে অনুসরণ করিয়া আপন স্বরূপোপলব্ধির পরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারি। ইহাই পরামাতৃকা বাগীশ্বরীর চরণে প্রার্থনা।

পরিশেষে, তান্ত্রিক সাধনার আর একটি বিশেষ মূল্যবান্‌ দিক্‌ রহিয়াছে,

তাহার প্রতি পূজনীয় আচার্যদেব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এটি হইল সৃষ্টির তত্ত্ব বা রহস্য, যাহার উদ্ঘাটনে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও ব্যাপৃত রহিয়াছে। তন্ত্র বা আগমশাস্ত্র সৃষ্টিকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেয় নাই বা তাহাকে উপেক্ষাও করে নাই। সৃষ্টির পরম রহস্যের আবরণ উন্মোচনই বরং ইহাকে প্রেরণা জোগাইয়াছে, বলা চলে। বৈদিক ঋষিরও ছিল সেই একই আকুল জিজ্ঞাসা: 'কুত আজাতা? কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ?' ইহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া তান্ত্রিক উপনীত হইয়াছেন কামকলাতত্ত্বে। এই কামই হইলেন সবিতা, জগৎ প্রসবিতা, 'কামাখ্যো রবিঃ'। সূর্য হইতেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য চলিতেছে, ইহা আমরা অনুধাবন করিতে পারি না। সূর্য একদিকে সবকিছুর আপূরণ করিয়া চলিয়াছে, অন্যদিকে সবকিছুর হরণ বা শোষণও নিরন্তর করিয়া যাইতেছে। তাহার কারণ, এই সূর্য হইল দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ তত্ত্বের সামঞ্জস্যস্বরূপ। তান্ত্রিক পরিভাষায় ইহার একটির নাম অগ্নি, অপরটির নাম সোম। 'অগ্নিষোমীয়মিদং জগৎ'—ইহাই ছিল প্রাচীন আর্যবিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত। পূজনীয় আচার্যদেব যথার্থই বলিয়াছেন: "সূর্যকিরণ হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সংহার হয়—ইহা বালক-বালিকাও জানে, কিন্তু সূর্য হইতে চন্দ্রকলা প্রকট হইয়া জগতের যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করে—ইহা সাধারণ প্রৌঢ়গণও জানেন না। সূর্যের মধ্যেই অগ্নিশক্তিও আছে, সোমশক্তিও আছে। অগ্নিশক্তি দ্বারা ধ্বংসের কার্য হয়, সোমশক্তি দ্বারা সৃষ্টির কার্য হয়। সূর্যের অন্তর্বর্তী এই অগ্নিশক্তি ও সোমশক্তির ব্যাপার জগতে নিরন্তর চলিতেছে কিন্তু জগৎ তাহা জানে না" (পৃঃ ১০৩)। তান্ত্রিকের লক্ষ্য তাই সেই অমৃতময়ী সৃষ্টি, যাহাকে আচার্যদেব 'ভাগবতী সৃষ্টি এবং প্রেমময় জগতের আবির্ভাব' বলিয়াছেন, যেখানে জরা নাই, মৃত্যু নাই, রোগ নাই, শোক নাই। উপসংহারে, দেহসিদ্ধির প্রকরণে এই লক্ষ্যেরই আলোচনা দেখা যাইবে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানা সাধন পদ্ধতিতে যে এই একই লক্ষ্যের অনুসরণ করা হইয়াছে, তাহাও আচার্যদেব দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তবে তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার অতি নিপুণ বিশ্লেষণ ও বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের প্রয়াস দেখা যায়, যাহা অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না। সূর্যবিজ্ঞানের পরম সাধক পূজনীয় আচার্যদেব সেই লুপ্ত তান্ত্রিক বিজ্ঞানের রহস্য উদ্ঘাটনে তাঁহার সমগ্র সারস্বত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

আমাদের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় রাঢ়ভূমির প্রাণকেন্দ্র। এই রাঢ় অঞ্চলেই এক সময় তান্ত্রিক সাধনার বিভিন্ন পীঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বহু সাধক সেই ধারায় সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাই পূজনীয় আচার্যদেবের এই অমূল্য গ্রন্থখানি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইল, ইহাও আকস্মিক যোগাযোগ বলিয়া মনে হয় না। তিনিই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র সম্মানিত সদস্য (Honorary Fellow)। তাঁহাকে এইভাবে সম্মানিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার সঙ্গে যে সম্বন্ধের যোগসূত্র স্থাপন করিয়া লইয়াছে, তাহা দ্বারা তান্ত্রিক সাধনার পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে রাঢ়ভূমির বিশিষ্ট অবদানরূপেই এই গ্রন্থ-প্রকাশ একদিন স্বীকৃতি লাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্ণধার, সংস্কৃত সাহিত্যের দিক্‌পাল ডক্টর রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও এই রাঢ়ভূমিরই সুসন্তান। তাঁহার একান্ত উৎসাহ ও আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই এই গ্রন্থ-প্রকাশ সম্ভব হইল। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশন-বিভাগের অধিকর্তা শ্রীরথীন্দ্রকুমার পালিত এবং তাঁহার সহকর্মিবৃন্দ এই গ্রন্থের প্রকাশে বিশেষ আগ্রহ ও সহযোগিতা করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। আমাদের সংস্কৃত বিভাগের লিপিকারিণী কল্যাণীয়া শ্রীমতী মৃদুলা দে ও গবেষক ছাত্র শ্রীমান্ মৃত্যুঞ্জয় আচার্য অশেষ পরিশ্রম সহকারে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করিয়া দিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের আন্তরিক কল্যাণ কামনা করি। জ্ঞানোদয় প্রেসের স্বত্বাধিকারী ও কর্মিবৃন্দ নির্ভুল এবং দ্রুত ছাপার ব্যাপারে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন, তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। পরা জননী সকলের মঙ্গল সাধন করুন্—ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ

'তান্ত্রিকসাধনা ও সিদ্ধান্তে'র দুইটি খণ্ডই পুনর্মুদ্রিত হইয়া দ্বিতীয় সংস্করণে আত্মপ্রকাশ করিল, ইহা আনন্দের কথা। কিন্তু দুঃখের কথা যিনি ইহার পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জন করিতে পারিতেন, সেই স্বনামধন্য অলোক-সামান্য প্রতিভাধর মহামনীষী গ্রন্থকার ইতিমধ্যে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার এই অসামান্য অবদান যে তন্ত্রসাধনা ও তাহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সকলকে যথাযথ অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাহা এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের মধ্য দিয়াই প্রমাণিত। সকলের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ ও কৌতূহলের সৃষ্টি না হইলে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যাইত না এবং পুনর্মুদ্রণেরও প্রয়োজন দেখা দিত না।

দুইটি খণ্ডের বিষয়বস্তুই পৃথক্ ও স্বতন্ত্র এবং একত্রে দুইটি খণ্ড পাঠ করিলে মোটামুটি তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ হইবে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকলের কাছে দুইটি খণ্ডই আবার সুপ্রাপ্য করিয়া দিলেন, এজন্য বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থকার-পরিচিতি

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ তাঁহার জীবদ্দশায় এক প্রবাদ-পুরুষে পরিণত হইয়াছিলেন। তিনি যে শুধু সংস্কৃত, দর্শন এবং সাহিত্যের সকল বিভাগে অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন, তাহাই নহে; প্রাচীন বিদ্যায় তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার ফলে তিনি যে প্রজ্ঞাদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই প্রজ্ঞার আলোকে মনীষীদের জ্ঞানভাণ্ডারের যে মৌলিক জ্ঞানোজ্জ্বল ব্যাখ্যা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার জীবন অসাধারণ গৌরবমণ্ডিত হইয়াছে।

পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ভূমিষ্ঠ এই গোপীনাথজীর জীবন বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া কাটিয়াছে। তাঁহার মাতুলের সস্নেহ তত্ত্বাবধানে অধুনা বাংলাদেশের কয়েকটি বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ক্ষীণদেহী বালক গোপীনাথের স্বাস্থ্য ম্যালেরিয়ার প্রবল আক্রমণে ভাঙ্গিয়া পড়িলে তিনি জন্মভূমি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর জয়পুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানকার অধিবাসী জনৈক দয়ালু বাঙ্গালী ভদ্রলোক জয়পুরে তাঁহার কলেজীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। কিছুকাল পরে তিনি বারাণসীর কুইনস্ কলেজে চলিয়া আসেন এবং এইখানেই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবন গড়িয়া উঠে। কুইনস্ কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ডঃ আর্থার ভেনিসের সস্নেহ তত্ত্বাবধানে আধুনিক গবেষণা বিষয়ে তিনি বিশদ প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ডঃ ভেনিস এই অসাধারণ তীক্ষ্ণধী বালকের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেন ও যত্ন নেন। পরবর্তীকালে গোপীনাথজী এই কলেজের সরস্বতী ভবনের গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হন এবং তখন জ্ঞানদেবী সরস্বতীর সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডার যেন তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হয়। তিনি উক্ত গ্রন্থাগারের দুর্লভ গ্রন্থরাজি ও পাণ্ডুলিপির জ্ঞানসমুদ্রের গভীরে ডুব দেন এবং সযত্নে তাহার অনেকগুলি সম্পাদন করিয়া 'সরস্বতী ভবন গ্রন্থ সিরিজ' নামে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে সুধীজগতে তাঁহার যশ ছড়াইয়া পড়ে। পরবর্তীকালে তিনি কুইনস কলেজের

অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। কিন্তু তাঁহার গুরু কাশীনিবাসী যোগীরাজ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের পরামর্শে তিনি কিছুকাল পরেই অধ্যক্ষের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গভীর সাধনার জগতে আত্মনিয়োগ করেন।

গোপীনাথজীর অধ্যয়ন-ক্ষেত্র অতি বিশাল ও বিস্তৃত ছিল। ডঃ ভেনিস একসময়ে তাঁহাকে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও অনুশাসনলিপি পাঠের দীক্ষা দিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত এবং ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য সমস্ত শাখাও অধিগত করেন। এমন কি, তিনি বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনের ন্যায় অহিন্দু দর্শনগুলিরও চর্চা করেন এবং ইহাদের সম্বন্ধেও মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী আচার্য নরেন্দ্র দেবকে গোপীনাথজী এই স্বাধ্যায়ে সর্বদা উৎসাহিত করিতেন এবং পরবর্তীকালে নরেন্দ্র দেবও এই দার্শনিক বিদ্যায় মূল্যবান্ সংযোজন করিয়াছেন।

তন্ত্রবিদ্যার অনুশীলন প্রায় অজ্ঞাত ছিল; গোপীনাথজী এই ক্ষেত্রে বিশেষ অনুশীলন করেন। কাশ্মীর শৈবাগমের মধ্যে তিনি ভারতীয় জ্ঞানের সারবস্তু খুঁজিয়া পান। তিনি মনে করিতেন, এই শৈবাগমের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে সকল ভারতীয় দর্শনমতের মূল বিধৃত রহিয়াছে। তিনি তন্ত্রের এক নবতম ব্যাখ্যায় এই সকল মতের সমীকরণ করেন। কিন্তু ইহা তাঁহার পাণ্ডিত্যের একটি দিক্ মাত্র।

গোপীনাথজীর একটি স্বকীয় জীবনদর্শন ছিল; বিশ্বব্যাপী ভগবৎপ্রেমকে তিনি যে জীবনের বাস্তব সত্তা বলিয়া মনে করিতেন এবং তাহাই তাঁহার জীবনদর্শনের ভিত্তিভূমি ছিল। তিনি অনুভব করিতেন যে, ব্যক্তিগত মোক্ষ অথবা নির্বাণ জীবনের চরম প্রাপ্তি নহে। 'সর্বমুক্তি' অথবা বিশ্বচরাচরের মুক্তিই জীবনের চরম লক্ষ্য এবং সেই চরম লক্ষ্যের অভিমুখে সমগ্র সৃষ্টিপ্রবাহ অগ্রসর হইতেছে। তিনি বলিতেন, 'অখণ্ড মহাযোগ' দ্বারা একদিন এই 'সর্বমুক্তি' লাভ হইবে এবং সমগ্র জগতের সমস্ত দুঃখ দূর হইবে।

সূচীপত্র

বৌদ্ধ

হিন্দু

মনীষী মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

জন্ম : ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭   তিরোভাব : ১২ জুন ১৯৭৬

বৌদ্ধ

প্রাচীন বৌদ্ধ সাধনার ভিত্তি

(ক) শীল সমাধি ও প্রজ্ঞালাভ—নির্বাণ বা তৃষ্ণানিবৃত্তি, লৌকিক ও লোকোত্তর চিত্ত।

প্রাচীন বৌদ্ধ সাধনের ভিত্তি শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা অথবা সম্যক্ আচার ধ্যান ও জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইগুলি নির্বাণগামী সোপানের তিনটি ধারা। প্রাচীন বৌদ্ধগণের লক্ষ্য ছিল নির্বাণ ও তৃষ্ণার নিবৃত্তি। তৃষ্ণা অথবা বাসনা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দুঃখের মূল। সেইজন্য তৃষ্ণার নাশই দুঃখনিরোধের অবশ্যম্ভাবী কারণ বিবেচিত হইত। তৃষ্ণা স্বরূপতঃ সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত—নিম্নতম কামধাতু বা জড়জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যবর্তী রূপধাতু নামক জ্যোতির্ময় সাকার লোকে ও ঊর্দ্ধস্থ অরূপধাতু নামক নিরাকার লোকেও তৃষ্ণা আছে। সর্বোচ্চ ভূমির তৃষ্ণাকে ভবতৃষ্ণা বলে। কামাদি ত্রিধাতুতে তৃষ্ণার আশ্রয়স্বরূপ একটি চিত্ত থাকে, উহাকে লৌকিক চিত্ত বলে। লৌকিক ও লোকোত্তর চিত্তে প্রভেদ আছে। লোকচিত্তের উৎপত্তি হয় বাহ্য বস্তু হইতে অথবা উহার সংস্কার-প্রভাবিত আলম্বন হইতে। কিন্তু যখন বিবেকজ্ঞান অথবা সন্ন্যাসবশতঃ চিত্ত ঐ বাহ্য আলম্বন ত্যাগ করে ও উহার পরিবর্তে নির্বাণকে আলম্বন রূপে গ্রহণ করে তখন ঐ চিত্ত লোকোত্তর চিত্ত নামে বর্ণিত হয়। ঐ চিত্তের স্রোত নিরন্তর নিত্য শান্তির দিকে প্রবাহিত হয়।

(খ) ধ্যানের অযোগ্য ও যোগ্য চিত্ত।

পুরাতন সাধন-প্রণালীতে ধ্যান ও চিত্তের একাগ্রতার প্রক্রিয়াই মুখ্য সহায়ক রূপে পরিগণিত হইত। তবে মনে রাখিতে হইবে যে ধ্যান নানা-প্রকার। কামধাতুসংবদ্ধ নিম্নতম চিত্ত ধ্যানের অনুকূল নহে। কিন্তু যাবতীয় উত্তর চিত্তই লৌকিক বা লোকোত্তর ধ্যান চিত্তের অন্তর্গত। লৌকিক ও লোকোত্তর চেতনার স্রোতের মুখ্য ভেদ ইহাই যে প্রথমটি যদি কুশল-চিত্ত হয় তাহা হইলে জন্ম-মৃত্যুর পরম্পরা অবাধে চলে। কিন্তু লোকোত্তর চিত্তে এই স্রোত ক্রমশঃ দুর্বল হইতে হইতে অন্তে নির্বাণে পরিসমাপ্ত হয়।

কামধাতুর নিম্নতর চিত্ত, উপদেশের প্রভাবে ও উৎসাহ আর পরিশ্রমের ফলে এবং উপচার-সমাধির মাধ্যমে, উচ্চতর ধ্যানচিত্তে পরিণত হইতে পারে। উপচার-ধ্যান স্থির ও অচঞ্চল প্রতিভা হইতে নিষ্পন্ন হয়, পরিকর্ম বা উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত হইতে হয় না। প্রত্যক্ষ ও স্থূল দৃষ্টির বিষয়ীভূত আলম্বনকে পরিকর্ম নামে বর্ণনা করা হয়। অভ্যাসের পরিপক্ক অবস্থাকে উদ্‌গ্রহ বলা হয়। উহা মানসদৃষ্টির বিষয়। দ্বিতীয় নিমিত্তের উপর একাগ্রতার ফলে যথাসময়ে উহাতে একটি শুভ্র প্রকাশ সৃষ্ট হয়। ইহাই প্রতিভাগ নিমিত্তের স্বরূপ। এই প্রকাশ প্রকট হইবার পরে চিত্তের পাঁচ প্রকার নীবরণ বা আবরণ ক্ষীণ হইতে থাকে। ইহার পর সমাধির অবস্থা আগত হয়। ইহার নাম উপচার-সমাধি। ইহা একটি ধ্যানচিত্ত হইলেও সঙ্গে সঙ্গে কামধাতুর সীমা অতিক্রম করিতে পারে না।

(গ) ধ্যানচিত্তের উদয় ও বিকাশ—প্রাচীন সাধনার উদ্দেশ্য শ্রেষ্ঠ শ্রাবক বা শিষ্যজীবনগঠন—পরবর্তী সাধনার উদ্দেশ্য বিশ্বগুরুপদ-লাভ—লৌকিক কামচিত্ত হইতে লোকোত্তর চিত্তে পরিণতি ক্রম—পৃথগ্‌জন হইতে আর্যত্বলাভের ক্রম।

লৌকিক কামচিত্ত হইতে নির্বাণ ও চিরশান্তি প্রাপ্ত হওয়ার উপযোগী লোকোত্তর চিত্তে পরিণতি লাভের ক্রম উপবিলিখিত ক্রমের অনুরূপ। এই-স্থলেও উপচার-সমাধির মাধ্যমেই অগ্রগতি হইয়া থাকে। ভবাঙ্গ স্রোতের সূত্র ছিন্ন হওয়ার পর কামধাতুর বিশিষ্ট কুশলচিত্ত কয়েকক্ষণের জন্য (অর্থাৎ অযোগ্য লোকের পক্ষে চার ক্ষণের জন্য এবং যোগ্যের পক্ষে তিন ক্ষণের জন্য) ক্ষণিক পরিণাম (জবন) অনুভব করিয়া থাকে। এই শ্রেণীতে গোত্রভূ জবন নামক অন্তিমক্ষণ নির্বাণকে আলম্বন করিয়া থাকে। ইহাই চতুর্থ ক্ষণ। ইহার পূর্বে পরিকর্ম, উপচার ও অনুরূপ ক্ষণ বিদ্যমান থাকে। লৌকিক চেতনা হইতে লোকোত্তর চেতনাতে পরিণাম বিশ্লেষণই এই সব ক্ষণের বিচার বিষয়। পৃথগ্‌-জন ততক্ষণ পর্যন্ত আর্য হইতে পারে না যতক্ষণ তাহার চেতনাস্রোত ক্ষণমধ্যবর্তী ক্রমিক সোপান অতিক্রম না করে। ইহার তাৎপর্য এই যে পৃথগ্‌জন এই মনোবৈজ্ঞানিক ক্রম অবলম্বন করিয়াই আর্য হইতে পারে। গোত্রভূর পরবর্তী ক্ষণের নাম অর্পণাক্ষণ। ইহা চেতনার পরিণতির সূচক। প্রকারান্তরে

বলা যাইতে পারে যে এই রূপান্তরের ফলে পৃথগ্‌জন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এক নবীন চেতনাক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া থাকে। ইহার পর এক লোকোত্তর গোত্রের আবির্ভাব হয়, যাহা পূর্বজীবনের সকল প্রকার সম্বন্ধই বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। ইহার পরেও ঐ ক্ষণের আবির্ভাব-তিরোভাব হইয়া থাকে, যাহা মার্গক্ষণ নামে বর্ণিত হয়। এই মহাক্ষণে চারিটি আর্যসত্যের সাক্ষাৎকার হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ঐ মহাক্ষণে সকল ধাতুর ও সকল প্রকার প্রাণীর সকল প্রকার দুঃখের স্বরূপ দৃষ্টিগোচর হয় ও সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের হেতু যে অজ্ঞান তাহাও আনুষঙ্গিক উপসর্গ সহিত লক্ষিত হয়। ঐ সময় একই সঙ্গে সর্বপ্রকার দুঃখের নিবৃত্তি-রূপ নির্বাণ ও দুঃখনিরোধনামী মার্গ অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ মার্গ দৃষ্টিগোচর হয়। একই সঙ্গে এই চারিটি আর্যসত্যের সাক্ষাৎকার হয়। যেমন ক্ষণিক বিদ্যুতের চমকে একই সঙ্গে বিভিন্ন দৃশ্যের দর্শন হইয়া থাকে, ইহাও কতকটা সেইরূপ। যখন চিত্ত বলপূর্বক নির্বাণগামী স্রোতে পতিত হয় তখন কোনপ্রকার অপায়ের বা ভবিষ্য পতনের আশঙ্কা থাকে না। এইপ্রকারে স্রোত-আপন্নের প্রথম অবস্থা উৎপন্ন হয়। মার্গের পরিশীলন দ্বারা ক্লেশসমূহ উন্মূলিত হয়। যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে আছে, চিত্তনদী উভয়তঃ বাহিনী। এই বাক্যে এই সত্যই ধ্বনিত হইতেছে, যে ঐ নির্বাণগামী স্রোতে পতিত হইয়াছে তাহাকে ঐ স্রোত কল্যাণের দিকে লইয়া যায়, সংসারের দিকে নহে। পতঞ্জলিদেবের উপদিষ্ট শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই সকল ধর্ম যাহা উপায়ের অন্তর্গত তাহা প্রাচীন বৌদ্ধ পরিভাষাতে বোধিপক্ষীয় ধর্মনামে প্রসিদ্ধ। মার্গচিত্তের পর ফলচিত্তের উদয় হয়। ঐ সময়ে মার্গে বিঘ্ন উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু যখন লক্ষ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে সংশয় থাকে না এবং পুনর্বার অকুশল চিত্তের আবির্ভাবের আশঙ্কা থাকে না, তখনই যথার্থ নিশ্চিন্ত চিত্তের অবস্থা হইয়াছে বলা যাইতে পারে। পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে প্রতীত হয় যে প্রাচীন সাধন নির্বাণ-মার্গের আবিষ্কার ও অনুসরণকেই 'লক্ষ্য' বলিয়া স্বীকার করিত। এই নির্বাণ নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ ও অনর্থ হইতে মুক্তিরূপে পরিগণিত হইত। ইহা উপনিষদ্‌ ও সাংখ্য সিদ্ধান্তের অনুরূপ ছিল। তদনুসারে ইহা দেহে অবস্থান কালেও আংশিকভাবে অনুভব করা যাইত এবং দেহান্তে ইহার পূর্ণরূপে প্রাপ্তি ঘটিত।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে অধ্যাত্ম-জীবনের আদর্শ

(ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে)

(ক) সাধন জীবন বিষয়ে দুইটি প্রাচীনমত—আদর্শগত ভেদ—নির্বাণ ও বুদ্ধত্ব।

হিন্দু সংস্কৃতির ন্যায় বৌদ্ধ সংস্কৃতিতেও প্রাচীনকাল হইতেই আধ্যাত্মিক জীবনের ধারা সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুইটি আদর্শ পরিলক্ষিত হইত। দুইটিই ছিল জীবের আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি—একটি ছিল ব্যক্তিগত দুঃখ-নিবৃত্তির আদর্শ এবং অপরটি ছিল সামূহিক দুঃখ-নিবৃত্তির আদর্শ। উভয় আদর্শের অন্তরালে যোগসূত্রও ছিল অনেক। তদনুসারে অবান্তর ভেদও বহু ছিল। দুঃখের মূল কারণ অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের নিবর্তক জ্ঞান, এ বিষয়ে বিশেষ মতভেদ ছিল না। তবে এই অজ্ঞান ও জ্ঞানের স্বরূপ ও প্রকারভেদ সম্বন্ধে দৃষ্টিভেদ লক্ষিত হইত। যাঁহারা নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ-নিবৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতেন, তাঁহাদিগের অব্যবহিত উদ্দেশ্য ছিল ব্যষ্টি-নির্বাণ, কিন্তু অন্যধারার আদর্শ ছিল নিজে সকল প্রকার দুঃখ অঙ্গীকার করিয়াও অন্যের দুঃখ অপসারণ করিবার আপ্রাণ চেষ্টা। তাঁহারা যথাসম্ভব সামূহিক বা সমষ্টিগত দুঃখ-নিবৃত্তিকে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য মনে করিতেন। প্রথম আদর্শটি ছিল হীনযানী বৌদ্ধশ্রাবকের, কিন্তু দ্বিতীয়টি ছিল মহাযানী বোধিসত্ত্বের। অর্থাৎ হীনযানী চাহিতেন নিজের নির্বাণ, মহাযানী চাহিতেন সকলের নির্বাণ এবং তাহার অনুষঙ্গে বোধিসত্ত্ব-জীবনের মধ্য দিয়া বুদ্ধত্বলাভ। প্রথম পথে ঐকান্তিক বাসনানিবৃত্তি আবশ্যক হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পথে বাসনার শোধনপূর্বক শুদ্ধ বাসনার অনুসরণ আবশ্যক হয়, যাহার প্রভাবে দেহশুদ্ধি ও বিশ্বকল্যাণ সম্পাদন সম্ভবপর হয়।

প্রথম দৃষ্টিতে অজ্ঞান মাত্রই ক্লিষ্ট ও হেয়, কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টিতে অক্লিষ্ট অজ্ঞানও স্বীকার করা হয়, যাহা ক্লিষ্ট অজ্ঞানের ন্যায় হেয় নহে। অবশ্য চরমস্থিতিতে ইহা থাকে না সত্য, কিন্তু সাধারণ মধ্যাবস্থায় অর্থাৎ বোধিসত্ত্ব

জীবনে ইহার সার্থকতা আছে। এই অজ্ঞানকে সেবাধর্মের প্রেরণার উৎসরূপে গণনা করা হয়। করুণাতত্ত্বের সহিত ইহার গাঢ় সম্বন্ধ আছে, ইহা আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে হীনযান হইতে মহাযানের আদর্শের পার্থক্য থাকিলেও হীনযানেও যে মহাযানের সূক্ষ্ম বীজ একেবারে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা নহে।

শ্রাবকগণ নিজের ব্যক্তিগত দুঃখের বিনাশ যাহাতে হয় তাহারই জন্য ব্যাকুল থাকিত। কিন্তু বোধিসত্ত্বগণ সকল জীবের দুঃখনাশ আকাঙ্ক্ষা করিয়া বুদ্ধত্ব লাভকেই জীবনের আদর্শ মনে করিত। তাঁহাদের ইহাই আকাঙ্ক্ষা ছিল যেন সকলেই চরমাবস্থায় বুদ্ধত্বলাভ করিয়া জীবনের পূর্ণতা সাধন করিতে সমর্থ হয়। উভয়ের অন্তরালে প্রত্যেকবুদ্ধ নামে একপ্রকার সাধক ছিলেন—তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল দুঃখনাশ এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত বুদ্ধত্বের লাভ অর্থাৎ স্বয়ং বুদ্ধত্বলাভ করিয়া বিশ্ব দুঃখ-নিবৃত্তির সহায়তা করা।

প্রাচীন সময়ে দশটি সংযোজন বা পাশ ছিন্ন করিয়া অর্হৎ ভাব লাভ করাই আধ্যাত্মিক জীবনের কাম্য ছিল। ইহা একপ্রকার জীবন্মুক্তির আদর্শ। ইহাকেও একপ্রকার নির্বাণই বলা যায়। যদিও এ অবস্থায় স্কন্ধ বা দেহ অবস্থিত থাকে, তথাপি ইহা সোপাধিক নির্বাণ নামে অভিহিত হয়। স্কন্ধ-নিবৃত্তি হইলে অর্থাৎ দেহপাত হইলে যে নির্বাণ হয় তাহা নিরুপাধিক নির্বাণ। তাহা সাংখ্যের বিদেহ-কৈবল্যের অনুরূপ অবস্থা। পতঞ্জল যোগদর্শনে যেমন অবিদ্যাকে মূল ক্লেশরূপে অঙ্গীকার করা হয় প্রাচীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়েও সেইপ্রকার এই অবিদ্যারূপ ক্লেশের নিবৃত্তিকেই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থরূপে গণ্য করা হইত। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে মলিন বাসনারূপ ক্লেশের নিবৃত্তি হইলেও যে প্রতিক্ষেত্রেই সম্যক্ ক্লেশনিবৃত্তি হইয়াছে তাহা বলা চলে না। কারণ, মলিন বাসনার ন্যায় শুদ্ধ বাসনারও অস্তিত্ব আছে। ক্ষেত্রভেদে শুদ্ধবাসনাই জীবনের ধারার নিয়ামক হইয়া থাকে। যাহার শুদ্ধ বাসনা নাই তাহার পক্ষে ক্লেশনিবৃত্তি চরম লক্ষ্য। কিন্তু প্রাচীন আচার্যগণের দৃষ্টিতে পূর্ণত্ব বা বুদ্ধত্বের আদর্শ ইহা অপেক্ষা অনেক উন্নত। প্রথমে বোধিসত্ত্ব না হইয়া চরমে কেহ বুদ্ধত্বলাভ করিতে পারে না। পরার্থ বাসনাকে শুদ্ধ বাসনা বলা হয়। বোধিসত্ত্ব শুদ্ধ বা পরার্থ বাসনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ক্রমশঃ বুদ্ধত্বলাভে অধিকারী হয়। বোধিসত্ত্ব অবস্থাও একপ্রকার অজ্ঞানেরই অবস্থা। তবে উহা ক্লিষ্ট অজ্ঞান নহে

কিন্তু অক্লিষ্ট অজ্ঞান, ইহাই মাত্র ভেদ। বোধিসত্ত্বকে পরপর বিভিন্ন ভূমি ভেদ করিয়া বুদ্ধত্বের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। এইভাবে ক্রমশঃ শুদ্ধ বাসনার নিবৃত্তি হইলে বোধিসত্ত্বের অন্তিম অবস্থাতে বুদ্ধত্বের অভিব্যক্তি ঘটে। আগম সিদ্ধান্ত অনুসারে পরমেশ্বরের পরাশক্তিপাতের প্রভাবে যখন পশু আত্মার আণবমল বিগলিত হয় তখন ঐ আত্মা শুদ্ধ অধ্বাতে সঞ্চরণ করিতে অধিকারী হয়। এই অধ্বা মায়ার অতীত। এই বিশুদ্ধ রাজ্যে শুদ্ধ বাসনার প্রভাবে ভোগ ও লয় অবস্থার অনুভব হয়। তাহার পর যথাসময়ে আত্মা শিবভাব প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধগণের বিবরণও কিয়দংশে ইহারই অনুরূপ। আগম অনুসারে বিশুদ্ধ চিৎরূপ শক্তির উন্মেষ না হওয়া পর্যন্ত শিবত্বের আভাস হইলেও সম্যক্ অভিব্যক্তি হয় না। এমনকি বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-কৈবল্যলাভ হইলেও শিবত্বলাভ হয় না। বৌদ্ধগণের পরিকল্পনাও কতকটা সেইরূপ। তাঁহারা বলেন যে বোধিসত্ত্বের আধ্যাত্মিক প্রগতি দশ বা ততোধিক ভূমিতে বিভক্ত, ভূমি-প্রবিষ্ট প্রজ্ঞার বিকাশ হইতেই অক্লিষ্ট অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, তাহার পর অন্তিম দশাতে পূর্ণাভিষেক প্রাপ্ত হইলে বোধিসত্ত্ব বুদ্ধপদে অধিরূঢ় হন। বুদ্ধত্ব অদ্বয় স্থিতির বাচক। পুদ্গল-নৈরাত্ম্য সিদ্ধ হইলে বুঝিতে হইবে যে ক্লেশনিবৃত্তি সিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু দ্বৈতভাব এখনও নিবৃত্ত হয় নাই। তাহার জন্য ধর্মনৈরাত্ম্যের জ্ঞান আবশ্যক হয়। শুদ্ধ বাসনা নিবৃত্ত হইলে বস্তুতঃ ধর্মনৈরাত্ম্যও সিদ্ধ হয়। তখন নৈরাত্ম্যদৃষ্টিবশতঃ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সমরস হইয়া যায়। ইহাই পূর্ণ নৈরাত্ম্য।

বৌদ্ধিক ও আগমিক আদর্শের মধ্যে বাহ্যদৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ ভেদ লক্ষিত হয়। Old Testament ও New Testament-এ যে প্রকার ভেদ, বিধি ও রাগমার্গে যে ভেদ, ইহাও কতকটা সেইপ্রকার।

বুদ্ধত্বের আদর্শ প্রাচীন সময়েও ছিল, তবে সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা আপাততঃ অশক্য ছিল কিন্তু অর্হৎ পদে আরূঢ় হইয়া পরনির্বাণ লাভ করা অথবা ব্যক্তিগত দুঃখের উপশম করা সকলের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল। কিন্তু যখন নিজের আভ্যন্তরীণ স্থিতি সংবেগের তীব্রভাবশতঃ এইরূপ অবস্থায় পরিণত হয় যে অন্যের দুঃখের প্রতীতিও ঐ সময়ে নিজের প্রতীতির সমান সমান লক্ষিত হইতে থাকে এবং যখন নিজ সত্তাবোধ পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া বিশ্বব্যাপী সত্তাবোধ-রূপে পরিণত হয়—যখন সমগ্র বিশ্বে আপনভাব প্রস্ফুটিত হয়, তখন সকলের

দুঃখ-নিবৃত্তি নিজের দুঃখ-নিবৃত্তির ভাব ধারণ করে। ক্লিষ্ট বাসনার উপশমবশতঃ যে নির্বাণ লাভ হয় তাহা যথার্থ নহে। মহানির্বাণপ্রাপ্তির পূর্বে সাধককে বোধিসত্ত্ব অবস্থায় আরূঢ় হইয়া ক্রমশঃ ভূমি সকল অতিক্রম করিতে হয়। এই ক্রমবিকাশের মার্গে কাহারও কাহারও শতশত জন্ম কাটিয়া যায়।

সাংখ্য-যোগে যেমন বিবেকখ্যাতি হইতে বিবেকজ জ্ঞান ভিন্ন, বৌদ্ধমতেও তদ্রূপ হীনযানসম্মত শ্রুতচিন্তা ভাবনাময়ী প্রজ্ঞা হইতে মহাযানসম্মত ভূমিপ্রবিষ্ট প্রজ্ঞা ভিন্ন। বিবেকখ্যাতি কৈবল্যের হেতু। কিন্তু বিবেকজ জ্ঞান কৈবল্যের অবিরোধী ঈশ্বরত্ব-সাধক। সাধারণ মনুষ্য ঈশ্বর কোটি পর্যন্ত উত্থিত হইতে পারে না, কিন্তু বিবেকজ্ঞানলাভ করিয়া কৈবল্যের অধিকারী হইতে পারে। বিবেকজ জ্ঞান তারক জ্ঞানস্বরূপ—ইহা সর্ববিষয়ক সর্বভাবের প্রকাশক ও অনৌপদেশিক অক্রমজ্ঞান। প্রাতিভ জ্ঞান বা স্বয়ংসিদ্ধ মহাজ্ঞান ইহারই ক্ষীণ আভাসমাত্র। ইহা সর্বজ্ঞত্ব হইলেও কৈবল্যের সমানার্থক নহে। যোগভাষ্যে আছে যে সত্ত্ব ও পুরুষ পূর্ণরূপে শুদ্ধ হইলে কৈবল্যলাভ হয় কিন্তু বিবেকজ জ্ঞানের প্রাপ্তির সঙ্গে অথবা ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে উহার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। জৈনমতেও কেবলজ্ঞান প্রাপ্তির অধিকার সকলের আছে, কিন্তু তীর্থঙ্করত্ব লাভের যোগ্যতা সকলের নাই। তীর্থঙ্কর, গুরু ও দেশিক—এই পদে ব্যক্তি-বিশেষ আরূঢ় হইতে পারে, সকলে পারে না। তীর্থঙ্করত্ব ত্রয়োদশ গুণস্থানে প্রকট হয়, কিন্তু সিদ্ধাবস্থার প্রাপ্তি চতুর্দশ ভূমিতে হইয়া থাকে। দ্বৈত শৈবাগমেও শুদ্ধ অধ্বাতে প্রবিষ্ট হইলে শুদ্ধ অধিকার-বাসনা ও শুদ্ধ ভোগ-বাসনা ক্রমশঃ নিবৃত্ত হয়। এই দুইটিই শুদ্ধ অবস্থার সূচক। ইহার পর লয়াবস্থাতে শুদ্ধ ভাবও লীন হইয়া যায়। অতীত অবস্থায় শিবত্বের অভিব্যক্তি হয়। অধিকার-বাসনা ও ভোগ-বাসনা অশুদ্ধ না হইলেও তাহার নিবৃত্তি আবশ্যক। অধিকারাবস্থা শাস্তার পদ—শুদ্ধবিদ্যায় অধিষ্ঠাতা হইয়া দুঃখ পঙ্কে মগ্ন জগৎকে জ্ঞান দান করা ও জীবসমূহকে শুদ্ধ অধ্বাতে আকর্ষণ করা, ইহাই বিদ্যেশ্বরগণের কার্য। ইহাই বিশুদ্ধ পরোপকার। এই অবস্থাতে শুদ্ধ ভোগ সম্ভবপর কিন্তু তাহার জন্য বাসনা থাকা চাই। এই প্রণালীতে ঈশ্বর তত্ত্ব হইতে সদাশিব তত্ত্ব পর্যন্ত আরোহণ ঘটিয়া থাকে। যখন শুদ্ধ আনন্দের প্রতিও বৈরাগ্য জন্মে তখন অন্তর্লীন অবস্থাভূত শিবত্বের স্ফুরণ হয়। এই স্থিতিটি সোপাধিক। ইহার পর নিরুপাধিক নির্মল স্থিতির অভ্যুদয় ঘটে। নিরুপাধিক

শিবত্বে ব্যক্তিত্ব থাকে না কারণ শুদ্ধ বাসনা ক্ষয়ের পর ব্যক্তিত্ব থাকা সম্ভব নহে। তখনই মহামায়া হইতে পূর্ণ মুক্তিলাভ সম্পন্ন হয়। অদ্বৈত শৈবাগম মতেও ভগবদনুগ্রহ প্রভাবে প্রথমে শুদ্ধমার্গে প্রবেশ হয়, তাহার পর ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে পরম শিবত্ব পর্যন্ত স্থিতির বিকাশ হয়। দীক্ষার তাৎপর্য ইহাই যে ইহা দ্বারা পাশক্ষয় ও শিবত্ব যোজন উভয়ই সংঘটিত হয়।

প্রাচীনকালে বুদ্ধত্বের আদর্শ প্রতি জীবের ছিল না, অবশ্য কোন কোন উচ্চাধিকারীর ইহাই ছিল জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাহার জন্য তাহাকে পরপর বিভিন্ন দেহের মাধ্যমে জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইত। ইহার নাম ছিল পারমিতা সাধন। পুণ্যসম্ভার ও জ্ঞানসম্ভার এই দুইটি সম্ভার দ্বারা বুদ্ধত্ব নিষ্পন্ন হয়। প্রথমটি কর্মাত্মক ও দ্বিতীয়টি প্রজ্ঞাত্মক। বলা বাহুল্য, উভয়েরই উপযোগিতা আছে। অদ্বৈতভাবের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধত্বের আদর্শ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রথমদিকে গোত্রভেদ স্বীকার করা হইত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এমন চিন্তার ধারা আসিয়াছিল যাহাতে গোত্রভেদ অলীক, কারণ প্রত্যেক মনুষ্যেরই বুদ্ধত্বলাভের যোগ্যতা আছে।

এইজন্য গোত্রভেদ বিষয়ক মত সত্য হইলেও কোন কোন দৃষ্টিতে উপেক্ষিত হইতে লাগিল। অভিনব দৃষ্টি অনুসারে বুদ্ধবীজ প্রতি জীবে নিহিত রহিয়াছে কিন্তু একমাত্র মনুষ্য দেহেরই এই বৈশিষ্ট্য আছে যে উহাতেই ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বিকশিত হইতে পারে। বিকশিত হইলেই বুদ্ধত্বলাভ স্বাভাবিক ক্রম অনুসারে ঘটিয়া থাকে। যে সময়ে বুদ্ধত্বের আদর্শের প্রসার হইল সেই সময় হইতেই বোধিসত্ত্বের চর্যা আবশ্যক হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় নির্বাণের প্রচলিত আদর্শ মলিন হইয়া পড়িল। ইহার স্থানে মহানির্বাণ অথবা মহাপরিনির্বাণের আদর্শ ফুটিয়া উঠিল।

(খ) সাধনজীবনে করুণা ও জীবসেবা।

সাধক ও যোগীর জীবনে অন্য ধর্মের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে করুণার বিকাশও আবশ্যক। জগতের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক প্রস্থানে করুণার বিশেষ মহত্ত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। করুণাই সেবাধর্মের প্রাণস্বরূপ। প্রসিদ্ধি আছে "সেবাধর্মঃ পরমগহনঃ যোগিনামপ্যগম্যঃ"। যাহাদের হৃদয় করুণার দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং যাহাদের চিত্তে সেবাধর্মের উন্মেষ হয় না তাহারা অত্যন্ত সঙ্কুচিতপ্রাণ,

কারণ তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য যে কোন প্রকারেই হউক ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধন করা। যাহারা নিম্ন অধিকারী, তাহারা শুধু নিজের জন্য ঐহিক বা পারত্রিক অভ্যুদয় কামনা করে। ইহা জাগতিক ঐশ্বর্যই হউক অথবা পারলৌকিক স্বর্গাদি ভোগই হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। ইহা হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চস্তরের অধিকারীর লক্ষ্য নিজের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখনিবৃত্তি অথবা মুক্তি।

কোন কোন ক্ষেত্রে আনন্দের অভিব্যক্তিও লক্ষ্যের অন্তর্গতভাবে পরিগণিত হয় কিন্তু উহাও ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডীতেই আবদ্ধ থাকে। বিশ্বকল্যাণ বা পরার্থ সম্পাদন এই সকল লোকের ধ্যেয়রূপে পরিগণিত হয় না। কখনও কোন স্থানে কিঞ্চিৎ পরার্থপরতার আভাস দৃষ্ট হইলেও উহাও স্বার্থসিদ্ধির উপায়রূপেই হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তরূপে দয়া নামক সাত্ত্বিক বৃত্তির কথা বলা যাইতে পারে। যখন ইহা কাহারও জীবনে কার্যরূপে পরিণত হয় অথবা ভাবনারূপে গৃহীত হয় তখন ইহা কার্যকর্তা ও ভাবুকের চিত্তশুদ্ধির কারণরূপে গৃহীত হয়। এই চিত্তশুদ্ধি অবশ্য জ্ঞানপ্রাপ্তি ও মুক্তির সহায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই, তথাপি ইহাও স্বীয় কল্যাণেরই সাধনরূপে আত্মপ্রকাশ করে, দয়ার পাত্র ভিন্ন ব্যক্তি হইলেও দয়ার ফল দয়া-প্রকাশকের প্রাপ্যরূপে পরিণত হয়।

ভক্তি ও প্রেম সাধনার ক্ষেত্রে যেমন সাধনভক্তি ও সাধ্য বা প্রেমভক্তিতে পার্থক্য আছে, ঠিক সেইপ্রকার করুণার অনুশীলন ক্ষেত্রেও সাধনরূপী করুণা ও সাধ্য করুণাতে স্পষ্ট ভেদ লক্ষিত হয়।

যোগদর্শনে চিত্তের পরিকর্মরূপে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার নিয়মিত পরিশীলনের উপযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাচীন পালি সাহিত্যেও ব্রহ্ম-বিহার নামে এই সকল বৃত্তির নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যোগদর্শনে করুণার যে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইতে সর্বাংশে ভিন্ন করুণার রূপও সাধকবিশেষের জীবনে যে দেখিতে না পাওয়া যায়, এমন নহে। উহাকে অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ উহাকে জীবনের সাধ্যরূপে গ্রহণ করিয়া মহাযানী বৌদ্ধদের অধ্যাত্ম সাধনা প্রবর্তিত হইয়াছিল। ব্যক্তিগত মুক্তি এই করুণার প্রতিবন্ধক, তাই সকল সাধকের নিকট এই জাতীয় মুক্তি উপাদেয় নহে। উপনিষৎকালীন প্রাচীন সাধনাতে জীবন্মুক্তি দশাই করুণা প্রকাশের ক্ষেত্ররূপে স্বীকৃত হইয়াছে। জ্ঞানী ও যোগীর পরার্থ সম্পাদন এই মহান্‌ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। জীবন্মুক্ত জ্ঞানীর জীবনের উদ্দেশ্য ভবদুঃখের নিবৃত্তির জন্য উহার উপায়স্বরূপ যথা—

শক্তি সম্যক্‌জ্ঞানের বিতরণ। করুণাপ্রকাশের ইহাই ছিল মুখ্য প্রণালী। অন্য অন্য প্রণালী ইহার তুলনায় গৌণরূপে বিবেচিত হইত। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষই সংসারে দাহক্লিষ্ট জীববর্গের উদ্ধারের একমাত্র অধিকারী। বর্তমান জগতে করুণার যত রূপই প্রবর্তিত থাকুক ঐগুলি মুখ্য করুণার নিদর্শন নহে। অবশ্য উহাও সেবাধর্মেরই অন্তর্গত সন্দেহ নাই। যতদিন ভোগদ্বারা প্রারব্ধ কর্ম নষ্ট না হয় ততদিন দেহ অবস্থিত থাকে বলিয়া দেহাবস্থানকালে জীবন্মুক্ত পুরুষই প্রকৃত জীবসেবা করিবার মুখ্য অধিকারী। কিন্তু এই সেবাকাল অর্থাৎ দেহাবস্থান কাল পরিমিত, কারণ দেহের অবসান ঘটিলে সেবা করিবার অবসর আর থাকে না। এইজন্য জীবন্মুক্তিবিবেকে বিদ্যারণ্য স্বামী জ্ঞানতত্ত্ব সংরক্ষণকে জীবন্মুক্তির মুখ্য প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

জীবন্মুক্তিতে অজ্ঞানের আবরণ শক্তি থাকে না বলিয়া আত্মার স্বরূপ-জ্ঞান অনাবৃত হয়, কিন্তু বিক্ষেপ-শক্তি থাকে বলিয়া উপাধি বিদ্যমান থাকে। তাই এই সময়ে জীব ও জগতের সেবা হইতে পারে। জীবন্মুক্তই যথার্থ গুরু। একমাত্র এই গুরুই তারকজ্ঞান সঞ্চার করিয়া যথার্থরূপে জীবদুঃখ মোচন করিতে সমর্থ। তাই গুরুই সেবাব্রতী।

কিন্তু এই সেবার ক্ষেত্র দেশদৃষ্টিতে পরিমিত এবং কালদৃষ্টিতে সঙ্কুচিত। পরিমিত বলার তাৎপর্য এই যে একব্যক্তির কর্মক্ষেত্র বিশাল হইলেও সীমাবদ্ধ। সেবকের সেবা করার অবসর ততক্ষণ, যতক্ষণ তাহার দেহসম্বন্ধ বর্তমান থাকে। দেহত্যাগের পর অথবা কৈবল্যপ্রাপ্তির অনন্তর সেবার সম্ভাবনা থাকে না। প্রয়োজনও থাকে না কারণ ব্যষ্টিচিত্তের শুদ্ধিই যদি প্রয়োজন হয় তাহার জন্য সেবাব্রত সর্বথা অনাবশ্যক হয়। তখন আপনিই কৈবল্যপ্রাপ্তি ঘটে। জীবন্মুক্ত গুরু পরম্পরাক্রমে সেবাব্রতের ভার যোগ্য শিষ্যকে অর্পণ করিয়া পরমধামে গমন করেন, ইহাই স্বাভাবিক।

(গ) সেবানুকূল দেহসিদ্ধি—প্রজ্ঞা ও করুণার সম্মেলন।

যাহার চিত্তে পরদুঃখ নিবারণের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল সে এমনভাবে চেষ্টা করে যাহাতে তাহার স্কন্ধ-নিবৃত্তি বা দেহপাত না হয়। তাহার এই চেষ্টা নিজের ভোগ বিলাসের জন্য নহে, কিন্তু জীবসেবার অবসর বাড়াইবার জন্য। যাহার চিত্তে সঙ্কোচ নাই তাহাতে এইপ্রকার ইচ্ছার উদয় স্বাভাবিক। সকলের

চিত্তে এইপ্রকার ইচ্ছা উৎপন্ন না হইলেও কাহারও কাহারও যে হয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহাই তাহার মহত্ত্বের নিদর্শন। গোত্রভেদ-বাদিগণের ইহাই মূল যুক্তি। ভক্তিসাধন মার্গেও এইপ্রকার বিচার দৃষ্ট হয়। এইজন্য কাহারও কাহারও মতে আবশ্যক হইলেও ভক্তি স্থায়ী হয় না, কারণ অভেদ জ্ঞান বা মোক্ষলাভ করার পর উহার অবকাশ থাকে না। এই ভক্তি সাধন বা উপায়-ভক্তি, এইস্থলে উপেয় হইল জ্ঞান বা মুক্তি, কিন্তু যাহার চিত্তে সঙ্কোচ কম তাহাতে নিত্যভক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগে। এইটি ফলরূপা ভক্তি। যাহা মুক্তি হইতে অভিন্ন অথবা তাহারও উর্দ্ধস্থ। এইপ্রকার ভক্তি পঞ্চম পুরুষার্থরূপে গণ্য হয়। অনেক মুক্ত পুরুষ এই জাতীয় ভক্তির জন্য লালায়িত থাকেন। ইহা অত্যন্ত দুর্লভ।

কিন্তু নশ্বর, পরিণামী ও মলিন দেহে এইপ্রকার মহান আদর্শ লাভ অসম্ভব। এইজন্য মর্ত্যদেহকে স্থির ও নির্মল করার জন্য প্রযত্ন আবশ্যক। বৈষ্ণবসম্মত ভাবদেহ, প্রেমদেহ ও রসদেহ এইপ্রকার সিদ্ধদেহ। ইহা জরা-মৃত্যুর দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না। ইহাকে 'পার্ষদ তনু' বলে, যাহার দ্বারা নিত্যধামে নিত্য ভক্তির যাজন হয়।

এইরূপ বিচার জ্ঞানীর সম্বন্ধেও জানিতে হইবে। সাধারণতঃ জ্ঞান অজ্ঞানের আবরণ অংশ নাশ করে কিন্তু বিক্ষেপ অংশ নাশ করে না। তাই জ্ঞানের উন্মেষ হইলেও প্রারব্ধ নষ্ট হয় না। তবে জ্ঞান যদি অতি তীব্র হয় তাহা হইলে বিক্ষেপও নষ্ট হইতে পারে। তবে সেস্থলে জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেহপাতও অবশ্যম্ভাবী। পরন্তু এরূপ জ্ঞানও আছে যাহার প্রভাবে এই কর্মজন্য দেহ নষ্ট না হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ চিন্ময়তা লাভ করে। প্রথমে উহা বিশুদ্ধ সত্ত্বময় হয়, তখন জরা-মৃত্যু নিবৃত্ত হইয়া যায়। তাহার পর সাক্ষাৎ চিন্ময়ত্ব লাভ হয়। প্রথম দেহের নাম বৈন্দবদেহ, দ্বিতীয়ের নাম শাক্তদেহ। শাক্তদেহ চিৎশক্তিময়। তাহাতে বিন্দু বা মহামায়ার সংস্পর্শও থাকে না। বৈন্দবদেহই সিদ্ধদেহ। বৌদ্ধ, শৈব ও শাক্ত সিদ্ধাচার্যগণ এইপ্রকার সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিয়া থাকেন। এই দেহ প্রাকৃতিক নিয়মের বন্ধনে বদ্ধ নহে। তাঁহারা এই দেহে অবস্থিত হইয়া জীবসেবা করিয়া থাকেন। এই দেহে মৃত্যুভয় থাকে না, এইজন্য সুদীর্ঘকাল স্থিত হইয়া জগতের কল্যাণ করার চেষ্টা করা চলে। কিন্তু সুদীর্ঘকালের পর

এই দেহেরও অবসান ঘটে। কিন্তু তখনও দেহপাত হয় না। যোগী তখন ঐ দেহকে সঙ্কুচিত করিয়া পরমধামে প্রবেশ করেন। কেহ কেহ ইহাকে দিব্যতনু বলিয়া বর্ণনা করেন। নাথ সম্প্রদায়, রসেশ্বর যোগী সম্প্রদায় ও মহেশ্বর সম্প্রদায়ের আচার্যগণ ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। St. John এর Apocalypse-এও এই বিষয়ের চর্চা আছে। খ্রীষ্টীয় যোগিগণের resurrection দেহ ও ascension দেহ মধ্যে যে ভেদ আছে তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা উচিত।

বৌদ্ধ যোগিগণের আধ্যাত্মিক জীবনে করুণার স্থান কোথায় তাহা বিবেচ্য। শ্রাবক ও প্রত্যেক বুদ্ধযানে সর্বসত্ত্বের দুঃখ-দর্শনই করুণার মূল উৎস। ইহাকে সত্ত্বাবলম্বন করুণা বলে। মৃদু ও মধ্যকোটি মহাযান মতে অর্থাৎ সৌত্রান্তিক ও যোগাচার সম্প্রদায়ে জগতের নশ্বরত্ব বা ক্ষণিকত্বই করুণার মূল উৎস। ইহার নাম ধর্মাবলম্বন করুণা। উত্তম মহাযান অর্থাৎ মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের মতে করুণার কোন মূল নাই। উহার পৃথক্ সত্তা নাই। এই মতে শূন্যতা হইতে অভিন্ন যে করুণা তাহাই বোধির অঙ্গ। যেমন লোকোত্তর, করুণাও তেমনই লোকোত্তর। ইহাই অহেতুক করুণা। অনঙ্গবজ্র বলেন, করুণাবান্ কখনও কোন প্রাণীকে নিরাশ করেন না—"সত্ত্বানামস্তি নাস্তীতি ন চৈব সবিকল্পকম্।" স্বরূপটি নিষ্প্রপঞ্চ বলিয়া চিন্তামণির ন্যায় অখিল সত্ত্বের বা জীবের অর্থ-ক্রিয়াকারিত্ব। ইহারই নামান্তর কৃপা।

নিরালম্বপদে প্রজ্ঞা নিরালম্বা মহাকৃপা।
একীভূতা ধিয়া সার্দ্ধং গগনে গগনং যথা॥

মনোরথ নন্দি প্রমাণ-বার্ত্তিকের বৃত্তিতে বলিয়াছেন—

দুঃখাদ্ দুঃখহেতোশ্চ সমুদ্ধরণকামনা করুণা।

বার্ত্তিককার ধর্মকীর্ত্তি বলেন, করুণা ভগবান বুদ্ধের প্রামাণ্য সাধন। তিনি বলেন, ইহা অভ্যাস দ্বারা সম্পন্ন হয়।

সাধনং করুণাভ্যাসাৎ সা বুদ্ধের্দেহসংশ্রয়াৎ।
অসিদ্ধোঽভ্যাস ইতি চেৎ নাশ্রয়প্রতিষেধতঃ॥

'অভ্যাসাৎ সা' এর ব্যাখ্যাতে মনোরথ নন্দি বলেন—"গোত্রবিশেষাৎ কল্যাণমিত্রসংসর্গাৎ অমুশয়দর্শনাৎ কশ্চিন্ মহাসত্ত্বঃ কৃপায়াং উপজাতস্পৃহঃ সাদরনিরন্তরানেকজন্মপরম্পরাপ্রভাবাভ্যাসেন সাত্মীভূতকৃপয়া প্রের্যমানঃ সর্ব-

সত্ত্বানাং সমুদয়হান্যা দুঃখহানায় মার্গভাবনয়া নিরোধপ্রাপণায় চ দেশনাং কর্ত্তুকামঃ স্বয়মসাক্ষাৎকৃতস্য দেশনায়াং বিপ্রলম্ভসম্ভাবনাৎ চতুরার্যসত্যানি সাক্ষাৎ করোতীতি, ভবতি সাধনং কৃত্বা প্রামাণ্যস্য॥"(১—৩৬)

শ্রাবক ও প্রত্যেকবুদ্ধ হইতে বুদ্ধের ইহাই বৈশিষ্ট্য। ধর্মকীর্ত্তি লিখিয়াছেন—

পরার্থবৃত্তেঃ খড়্গাদের্বিশেষোয়ং মহামুনেঃ।
উপায়াভ্যাস এবায়ং তাদর্থ্যাৎ শাসনং মতম্॥

প্রত্যেকবুদ্ধ এবং শ্রাবক প্রভৃতির লক্ষণ বাসনাহানি। কিন্তু সম্যক্ সংবুদ্ধ পরার্থবৃত্তি বলিয়া সর্বোত্তম।

এই দয়া সত্ত্বদৃষ্টিমূলক নহে, ইহা বস্তুধর্ম। এইজন্য ইহাকে দোষাবহ বলা যায় না। বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—

দুঃখজ্ঞানেঽবিরুদ্ধস্য পূর্বসংস্কারবাহিনী।
বস্তুধর্মাদয়োৎপত্তির্ন সা সত্ত্বানুরোধিনী॥ (১—১৩৭)

দুঃখজ্ঞান হইলে পূর্বসংস্কার প্রভাবে দয়া স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়। ইহা সর্বত্র অপ্রতিহত। পূর্ব সংস্কারের তাৎপর্য বস্তুতঃ প্রাক্তন অভ্যাসের প্রবৃত্তি ভিন্ন অপর কিছু নহে। বস্তুধর্মের তাৎপর্য বস্তুর বা কৃপাবিষয়ীভূত দুঃখের ধর্ম। এখানে টীকাকার স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে যাঁহাদের আত্মদৃষ্টি সর্বথা উন্মূলিত হইয়াছে সেই সকল মহাপুরুষগণের দুঃখসম্মুখতা হইতেই দয়ার উৎপত্তি হয়। কারণ তাঁহারা দুঃখকে কৃপার বিষয়রূপে গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত। দুঃখমাত্রের মূল কারণ মোহ। মোহের মূল কারণ বৌদ্ধমতে সত্ত্বগ্রাহ বা আত্মগ্রাহ। ইহা উন্মূলিত হইলে কাহারও প্রতি দ্বেষ থাকে না। কারণ যাঁহার আত্মদর্শন নাই তাঁহার পক্ষে কাহারও দ্বারা অপকৃত হওয়ার ভ্রম জন্মে না। তাই সে কাহাকেও দ্বেষ করে না। এইপ্রকারে কৃপা দোষের মূলভূত আত্মগ্রাহের অভাব হইতে উৎপন্ন হয়। তাই ইহা দূষণীয় নহে। ধর্মকীর্ত্তি বলিয়াছেন—'দুঃখসন্তানসংস্পর্শমাত্রেনৈবং দয়োদয়ঃ' (১—১৭৮)

পূর্বকর্মের আবেশ ক্ষীণ হইলে এবং অন্যান্য কারণ সম্যক্‌রূপে নষ্ট হইলে অপ্রতিসন্ধিবশতঃ মুক্তি অবশ্যই থাকে। কিন্তু যিনি মহাকৃপাসম্পন্ন তাঁহার জন্মাক্ষেপক কর্ম প্রণিধান দ্বারা পুষ্ট, তাই তাঁহার সংস্কারের শক্তি ক্ষীণ হয় না। এইজন্য তিনি সম্যক্ সংবুদ্ধ।

এ যাবৎ-আকাশ চিরস্থায়ী। কিন্তু শ্রাবকের কর্ম এইরূপ দেহকে অভিব্যক্ত করে যাহার স্থিতিকাল নিয়ত। তাহার করুণা অতি মৃদু, সেই জন্য দেহ স্থাপনের জন্য অপেক্ষিত মহান্ প্রযত্ন তাহাতে থাকে না। তাই সে সর্বকালে অবস্থান করে না। কিন্তু ইহার বিপরীত হইলেন ঐ মহামুনি, যিনি অপরের উপকার সাধনের জন্যই অবস্থান করেন এবং যিনি অকারণ বাৎসল্যময়। তিনি বস্তুতঃ কৃপাময়। এইভাবে দেখিতে গেলে তিনি পরাধীন এবং এই বিশিষ্ট পরাধীনতার জন্য তিনি চিরস্থায়ী। ধর্মকীর্ত্তি বলিয়াছেন—

"তিষ্ঠন্ত্যেব পরাধীনা যেষাং তু মহতী কৃপা।" (১—২০১)

অদ্বয়বজ্র তত্ত্বরত্নাবলীতে বলিয়াছেন যে শ্রাবক ও প্রত্যেকবুদ্ধের কৃপা সত্ত্বাবলম্বনমূলক। তাঁহাদের করুণা ত্রিবিধ দুঃখের মধ্যে যাহাকে দুঃখদুঃখ বা পরিণামদুঃখ বলা হয় তাহাই অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হয়। শ্রাবকগণের দেশনা বা উপদেশপ্রদান বাচিক। কিন্তু প্রত্যেকবুদ্ধের উপদেশ কায়িক, কারণ সংবুদ্ধগণের অনুৎপত্তি ও শ্রাবকগণের পরিক্ষয়বশতঃ প্রত্যেকবুদ্ধগণের জ্ঞান অসংসর্গ হইতে উৎপন্ন হয়। অসংসর্গ বলিতে ইহাই বুঝায় যে নিজের মধ্যে এমন একটি বিশিষ্ট যোগ্যতা সম্পাদন আবশ্যক যাহার প্রভাবে সূর্যজ্যোতির ন্যায় স্বভাবকায়ের অথবা ধর্মকায়ের স্বতঃ প্রসরণশীল রশ্মিবর্গ স্বতঃই আহিত হয়। শ্রাবক ও সম্যক্ সংবুদ্ধ হইতে প্রত্যেকবুদ্ধের ইহাই ভেদ। বৌদ্ধ সাধনার প্রত্যেকটি অংশ প্রজ্ঞা ও করুণার দৃষ্টিতে বিচারযোগ্য। দেশনাও তাহারই অনুরূপ।

(ঘ) মহাযানে দুইটি নয়—পারমিতা ও মন্ত্র।

শ্রাবক ও প্রত্যেকবুদ্ধ ও সম্যক্ সংবুদ্ধ এই তিনপ্রকার সাধকবর্গের মধ্যে মহাযানই যোগপথ। যদিও উহাতে অবান্তর ভেদ আছে ইহা সত্য, তথাপি উহার প্রধান ধারা দুইটি—একটি পারমিতানয় অপরটি মন্ত্রনয়। সৌত্রান্তিকগণের সকলেই মৃদু পারমিতানয় স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু যোগাচার ও মাধ্যমিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ পারমিতানয় ও কেহ মন্ত্রনয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(ঙ) যোগাচারে সাকার ও নিরাকারবাদ।

যোগাচার মতাবলম্বীদিগের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞানকে সাকার স্বীকার করেন,

আবার কেহ কেহ জ্ঞানকে নিরাকার বলেন। এইজন্য যোগাচার মত দুই-প্রকার। সাকারবাদিগণের মতে পরমাণু ষড়ংশ নহে। এইমতে সবই চিত্তমাত্র। গ্রাহ্য ও গ্রাহকভাবটি কল্পিত। কামধাতু, রূপধাতু ও অরূপধাতু এই মতানুসারে চিত্তমাত্র বলিয়া গৃহীত হয়। চিত্ত নিরপেক্ষ ও বিচিত্র প্রকাশময়। যখন এই চিত্ত বিকল্পশূন্য হয় তখন তাহাই অদ্বৈত সাক্ষাৎকার নামে পরিচিত হয়। নিরাকারবাদমতে চিত্ত অনাকার সংবেদনমাত্র স্বরূপ। বাসনাযুক্ত চিত্ত অর্থাভাসরূপে প্রবৃত্ত হয়। আভাসমাত্রেই মায়া। তত্ত্বটি নিরাভাস। উহা শুদ্ধ ও অনন্ত আকাশের ন্যায় নির্মল। বুদ্ধকায় অথবা ধর্মকায় নিষ্প্রপঞ্চ ও নিরাভাস। উহা হইতে সম্ভোগকায় ও নির্মাণকায় নামক দুইটি রূপকায়ের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে।

(চ) মায়োপম সমাধি ও সর্বধর্মাপ্রতিষ্ঠান সমাধি।

মতান্তরে কাহারও লক্ষ্য হইল মায়োপম অদ্বয়বাদ। কোন কোন আচার্য ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে সর্বধর্মাপ্রতিষ্ঠানবাদই যুক্তিসিদ্ধ। বুদ্ধগণ মায়োপম সমাধি, মহাকরুণা ও অনাভোগ চর্যার দ্বারা বোধিসত্ত্ব সকলের দর্শন ও জ্ঞান সম্পাদন করেন। কিন্তু এই দর্শন ও জ্ঞান উভয়ই মায়াবৎ এবং ছায়াবৎ বলিয়া স্বীকার করা হয়। চিত্তের বাহিরে কোন জগৎ নাই। জীবনধারা বস্তুতঃ কোন নিমিত্তের অপেক্ষা না করিয়া ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চ ভূমি প্রাপ্ত হয়। সকলের শেষে সমগ্র ত্রিধাতু চিত্তমাত্ররূপে প্রতীত হইয়া থাকে। ইহারই নাম মায়োপম সমাধি। কিন্তু যাঁহারা সকল ধর্মকে প্রতিষ্ঠানহীন মনে করেন তাঁহাদের সিদ্ধান্তে বিশ্ব সৎ নহে, অসৎ নহে, উভয়াত্মক নহে ও অনুভয়াত্মকও নহে। এইজন্য বিশ্বকে চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত মনে করা হয়।

(ছ) সাধন জীবন দুইপ্রকার—হেতুরূপ ও ফলরূপ।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সাধন জীবনের অবস্থা দুইপ্রকার। একটি হেতুরূপ বা সাধনরূপ অপরটি ফলরূপ বা সাধ্যরূপ। জ্ঞান ও ভক্তি মার্গে যে প্রকার সাধনরূপ জ্ঞানভক্তি ও সাধ্যরূপ জ্ঞানভক্তি উভয়ের পরিচয় পাওয়া যায় সেইরূপ বৌদ্ধগণের চরমদৃষ্টিতেও সাধনরূপ করুণা ও সাধ্যরূপ করুণার ভেদ লক্ষিত হয়। সাধন অবস্থাতে ভগবান বুদ্ধের চিত্তোৎপাদ হইতে আরম্ভ করিয়া বোধিমণ্ড উপক্রম, মারবিধ্বংসন ও বজ্রোপম সমাধি পর্যন্ত মার্গস্বরূপ। এই

মার্গকে পারমিতানয় বলে। ফলাবস্থাতে একাদশ ভূমির অন্তর্ভাব জানিতে হইবে। আশয় এবং প্রয়োগের ভেদবশতঃ হেতু দুইপ্রকার। সর্বসত্ত্বের ত্রাণ ইহাই হইল আশয় এবং করুণানুৎপাদ জ্ঞানরূপ বোধির অবলম্বন, ইহার নাম প্রয়োগ। প্রয়োগ দুইপ্রকার—একটির সম্বন্ধ বিমুক্তিচর্যার সঙ্গে ও অপরটির সম্বন্ধ ভূমির সঙ্গে। প্রথমটি দানাদি বিমুক্তিতে প্রায়োগিক ও পারমিতা বিমুক্তিতে বৈপাকিক। দ্বিতীয়টিরও দুইটি অবান্তরভেদ আছে। একটিতে অভিসংস্কার আছে, দ্বিতীয়টিতে উহা নাই। প্রথমটিতে সাতটি ভূমি অঙ্গীকৃত হয়, কারণ ঐস্থলে আভোগ ও নিমিত্তরূপী কারণতত্ত্বের প্রভাববশত সমাধি প্রবৃত্ত হয়। সপ্তম ভূমিতে নিমিত্ত থাকে না কিন্তু আভোগ থাকে। অষ্টমে আভোগও থাকে না। তাই ইহা শুদ্ধভূমি। শুদ্ধভূমির প্রাপ্তি হইলে উদ্বোধকরূপী নিমিত্ত ও আভোগ উভয়েরই অভাব ঘটে। সেইজন্য এই ভূমিতে স্বভাবসিদ্ধ সমাধির উদয় হয়। ইহারই প্রভাবে জগতের যাবতীয় অর্থ অর্থাৎ বিশ্বকল্যাণ সম্পন্ন হয়। ঐ সময় পরার্থ সম্পাদন হয় এবং সর্বসংবিৎ লাভের জন্য জগদ্গুরুভাবের উদয় হইয়া সর্বানুশাসন হইতে পারে। এই অবস্থা দশমভূমি পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই উচ্চ সাধকাবস্থার আরম্ভ বুদ্ধের মারবিজয় হইতে ধরা যাইতে পারে এবং দশ পারমিতার পূর্ণতা ও সহজ বজ্রোপম সমাধিপ্রাপ্তি পর্যন্ত ইহা স্থায়ী হয়।

কোন বিশিষ্ট দৃষ্টি অনুসারে দেখিলে মনে হইতে পারে যে ইহা সাধক অবস্থা ভিন্ন অপর কিছু নহে। এই অবস্থায় যে চারিটি সম্পদের উদয় হয় তাহাদের সবগুলিই অভ্যাসাত্মক। যথা (১) অশেষ পুণ্য ও জ্ঞান সম্ভারের অভ্যাস (২) নৈরন্তর্যের অভ্যাস (৩) দীর্ঘকালের অভ্যাস (৪) সংকারের অভ্যাস। পতঞ্জলি যোগসূত্রে—"স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতঃ দৃঢ়ভূমিঃ" অন্তিম তিনটির উল্লেখ আছে।

(জ) সিদ্ধাবস্থা ও সম্পৎ চতুষ্টয়।

সিদ্ধাবস্থা দশমভূমির পর। এই অবস্থায় যোগীর চারিটি সম্পদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—(১) প্রহাণ (২) জ্ঞান (৩) রূপকায় ও (৪) প্রভাব। প্রত্যেকটির অবান্তরভেদ আছে। এখানে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। বস্তুতঃ যেটি রূপকায়ে 'সম্পৎচতুষ্টয়' নামে উল্লিখিত হয় তাহাই মুখ্য। উহার মধ্যে

আছে—মহাপুরুষের বত্রিশটি লক্ষণ, আশিটি অনুপব্যঞ্জন, বল ও বজ্রাঙ্গ বা স্থির দেহ। পতঞ্জলির যোগসূত্রে কায়সম্পদ নামে পঞ্চরূপ বিশিষ্ট পঞ্চভূত জয়ের যে ফলনির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই বৌদ্ধগ্রন্থে সিদ্ধপুরুষের রূপকায়ের স্বাভাবিক সম্পদ্ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এখানে যে 'প্রভাব' শব্দের উল্লেখ আছে, তাহার তাৎপর্য হইল বিশিষ্ট ঐশ্বর্য বা ঈশ্বরত্ব। কোন কোন বৌদ্ধাচার্যের মতে প্রভাবের মধ্যে বাহ্যবিষয়ের নির্মাণ, পরিণাম সম্পাদন, বশিত্বরূপী সম্পদ্ ও ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি অন্তর্ভূ'ত।

(ঝ) সত্ত্বার্থক্রিয়া।

কোন কোন পরবর্তী আচার্য পূর্বোক্ত হেতু ও ফলাবস্থা হইতে ভিন্ন 'সত্ত্বার্থ' ক্রিয়া' নামক একটি পৃথক্ অবস্থা স্বীকার করেন। ইহা হইতে একটি গভীর তত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইহা এই—আধ্যাত্মিক জীবনে মনুষ্যের মুখ্য লক্ষ্য কেবল ফলপ্রাপ্তি বা সিদ্ধাবস্থালাভ নহে, কিন্তু ঐ প্রাপ্তি যাহাতে সর্বসাধারণের নিকট সুলভ হইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা। ইহাই সর্বোত্তম লক্ষ্য। ইহারই নাম জীবসেবা। বৌদ্ধ দার্শনিক ইহাকেই সত্ত্বার্থক্রিয়া নামে নির্দেশ করিয়াছেন। এই মতে বোধিচিত্তোৎপাদ হইতে বোধিমণ্ডনিবেশন পর্যন্ত যে সকল অবস্থা আছে সেসকল সাধন বা হেতুর অন্তর্গত। সম্যক্ সংবোধির উৎপত্তি হইতে সর্বক্লেশের প্রহাণ পর্যন্ত ফলাবস্থা। তাহার পর প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন হইতে শাসনের অন্তর্ধান পর্যন্ত তৃতীয় অবস্থা। ইহা হইতে বুঝা যায় যে জীব অথবা জগতের সত্ত্বার্থপ্রক্রিয়ারূপ সেবা সমগ্র জীবনের লক্ষ্য। ইহা সৃষ্টির অবসান পর্যন্ত স্থায়ী। যদি সকলের মুক্তি হইয়া যায় তাহা হইলে শাসন, শিষ্য ও শাস্তা কেহ থাকিবে না। যতদিন সর্বমুক্তি না হয় ততদিন জীবসেবা অবশ্য থাকিবে। এই মতানুসারে হেতু অবস্থা আশয়, প্রয়োগ ও বশিতা ভেদে তিনপ্রকার। সত্ত্বানির্মোক্ষপ্রণিধান, ইহা আশয়, প্রয়োগ দুইপ্রকার। সপ্ত পারমিতানয় ও দশ পারমিতানয়। প্রথমটিতে আছে দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা ও উপায়। ইহারা ভূমিপ্রাপ্ত চতুর্বিধ সম্পদ্ সম্পন্ন। এই সকল সম্পদের নাম—আশ্রয়, প্রয়োগ, প্রতিগ্রাহক ও দেহসম্পৎ।

সাধনাবস্থাতে সর্বপ্রকার 'আদি কর্ম' করিতে হয়। কিন্তু সত্ত্বার্থক্রিয়ারূপ ফলাবস্থাতে অনাভোগেই প্রবৃত্তি হয় অর্থাৎ এই অবস্থাতে আপনা আপনিই

কর্ম নিষ্পন্ন হয়, অভিমান করিয়া কর্ম সম্পাদন করিতে হয় না। দশ পারমিতাবাদী পূর্বোক্ত সাত পারমিতা হইতে অতিরিক্ত প্রণিধান, বল ও জ্ঞান এই তিনটি পারমিতা স্বীকার করেন।

আদর্শ ও নয়

(ক) মুমুক্ষুর তিন আদর্শ—শ্রাবক, প্রত্যেকবুদ্ধ ও সম্যক্ সংবুদ্ধ।

বৌদ্ধগণের ধার্মিক জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইল। উহা সংক্ষেপে প্রকারান্তরে আরও স্পষ্টভাবে বলা হইতেছে। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে মুমুক্ষুদিগের মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি আদর্শ প্রচলিত ছিল—শ্রাবক, প্রত্যেকবুদ্ধ ও সম্যক্ সংবুদ্ধ। প্রথম হইতে দ্বিতীয় ও দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় আদর্শ শ্রেষ্ঠ। শ্রাবকের আদর্শ ক্ষুদ্র হইলেও পৃথগ্‌জন হইতে উৎকৃষ্ট ছিল। যদিও শ্রাবক ও পৃথগ্‌জন উভয়েই ব্যক্তিগত দুঃখ-নিবৃত্তিকেই সমভাবে আদর করিত, ইহা সত্য, তথাপি পৃথগ্‌জনের উপায়জ্ঞান ছিল না, কিন্তু শ্রাবকের তাহা ছিল। দুঃখ-নিবৃত্তির মার্গের সহিত শ্রাবকের পরিচয় ছিল। এই মার্গের নাম বোধি অথবা জ্ঞান। শ্রাবকের স্বতঃ প্রাপ্তি ছিল না। প্রাপ্তির জন্য ইহাকে বুদ্ধাদি শাস্তা অথবা গুরুবর্গের উপদেশ (দেশনা) গ্রহণ করিতে হইত। এই জ্ঞান ঔপদেশিক জ্ঞান নামে পরিচিত। পৃথগ্‌জন ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনবর্গের সাধনাতে ব্যাপৃত থাকিত, কিন্তু শ্রাবক ছিল মুমুক্ষু। শ্রাবকদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও দুঃখনিরোধ পুদ্গলনৈরাত্ম্য জ্ঞান হইতে সিদ্ধ হইত এবং কাহারও কাহারও প্রতীত্যসমুৎপাদের জ্ঞান হইতে হইত। ধর্মনৈরাত্ম্য জ্ঞান কোন শ্রাবকেরই হইত না। এইজন্য শ্রাবক কখনও শ্রেষ্ঠ নির্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারিত না। তথাপি ইহা অবশ্য সত্য যে শ্রাবকগণ অধঃপতনের আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইত, কারণ ইহাদের ক্লেশ বা অশুদ্ধ বাসনারূপ আবরণ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইত। এইজন্য ত্রিধাতুর মধ্যে ইহাদের জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা থাকিত না—ইহারা জন্ম-মৃত্যু প্রবাহরূপ প্রেত্যভাব হইতে মুক্তিলাভ করিত।

প্রত্যেকবুদ্ধের আদর্শ ছিল শ্রাবক হইতে উন্নত। যদিও ইঁহাদের সাধন-

জীবনের প্রেরণা বৈষয়িক স্বার্থ হইতে আসিত ইহা সত্য, তথাপি ইঁহাদের আধার ছিল অধিক শুদ্ধ। আধার শুদ্ধ ছিল বলিয়া স্বদুঃখনিবৃত্তির উপায় বা জ্ঞান, ইঁহাদিগকে অন্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবার আবশ্যকতা ছিল না। ইঁহারা পূর্বশ্রুতাদি অভিসংস্কারের দ্বারা স্বয়ংই বোধি লাভ করিতে পারিত। বোধিপ্রাপ্তির ফল বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি। যোগশাস্ত্রে যাহাকে অনৌপদেশিক বা প্রাতিভ জ্ঞান বলে, প্রত্যেকবুদ্ধগণের জ্ঞান প্রায় উহারই অনুরূপ। কোন কোন অংশে ইহা বিবেকোথ বা প্রাতিভ জ্ঞানেরই একটি রূপ বলা যাইতে পারে। ইহা লৌকিক শাব্দজ্ঞান নহে। প্রত্যেকবুদ্ধ নিজের বুদ্ধত্বের জন্য প্রার্থী হন, বুদ্ধত্বলাভও করেন, কিন্তু সকলের বুদ্ধত্বের জন্য প্রার্থনা করেন না।

শ্রাবক ও প্রত্যেকবুদ্ধের জ্ঞানেও ভেদ আছে। শ্রাবকের জ্ঞান পুদ্গল-নৈরাত্ম্যের অববোধ-রূপ। ইহা পুদ্গলবাদীর অগোচর। প্রত্যেকবুদ্ধের জ্ঞান মৃদু ইন্দ্রিয়, তাই উহা শ্রাবকেরও অগোচর। শ্রাবকগণের ক্লেশাবরণ থাকে না, তাই তাঁহাদের জ্ঞান সূক্ষ্ম। প্রত্যেকবুদ্ধের জ্ঞেয়াবরণের একদেশ অর্থাৎ গ্রাহ্যাবরণও থাকে না। এইজন্য উহা আরও অধিক সূক্ষ্ম। শ্রাবকের জ্ঞান পরোপদেশহেতুক, এইজন্য উহা ষোড়শাকার দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাই গম্ভীর। কিন্তু প্রত্যেকবুদ্ধের জ্ঞান স্বয়ং বোধরূপ ও তন্ময়তারূপ হইতে উদ্ভূত, তাই উহা আরও গম্ভীর। আরও একটি কথা আছে। প্রত্যেকবুদ্ধ গ্রাহ্য বিকল্প হইতে মুক্ত। তাই শব্দোচ্চারণ না করিয়াও তিনি ধর্মোপদেশ দান করেন। প্রত্যেকবুদ্ধ নিজের অধিগত জ্ঞানাদির প্রভাবে অন্য সকলকে কুশলাদিতে প্রবৃত্ত করেন বলিয়া তাঁহার সাধনাকে অধিক গম্ভীর বলা হয়। উহা উচ্চাররহিত বলিয়া অন্যের দ্বারা প্রতিহত হইতে পারে না।

তৃতীয় আদর্শ হইল সম্যক্ সংবুদ্ধের। ইহাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ইহারও প্রকারভেদ আছে। সম্যক্ সংবুদ্ধকেই বুদ্ধ ভগবান বলা হয়। ইনি অনুত্তর সম্যক্ সংবোধিপ্রাপ্ত। ইঁহার লক্ষ্য অত্যন্ত উদার। কোটি কোটি জন্মের তপস্যা ও অশেষ বিশ্বের কল্যাণ-ভাবনাই ইহার মূলাধার। ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণ নিবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধত্বলাভ হয় না। প্রত্যেকবুদ্ধেরও দ্বৈতবোধ সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না। একমাত্র সম্যক্ সংবুদ্ধই অদ্বয়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ও দ্বৈতভাব হইতে মুক্ত। ইহা সত্য যে জ্ঞেয়াবরণ নিবৃত্ত না হইলে অদ্বৈতভাবের উদয় হইতে পারে না। পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন—'জ্ঞানস্য আনন্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্পম্।'

জ্ঞান অনন্ত হইলে জ্ঞেয় অল্প হয়। বুদ্ধাবস্থা অনন্ত জ্ঞানের অবস্থা। এইজন্য আচার্যগণ এই জ্ঞানকে বোধি না বলিয়া মহাবোধি বলিয়াছেন। এই অনন্ত জ্ঞানের সঙ্গে অনন্ত করুণাও মিশ্রিত থাকে। সত্ত্বার্থক্রিয়া বা পরার্থ সম্পাদনের ভাবই বুদ্ধগণের বীজ—ইহাই বুদ্ধত্বলাভের প্রধান কারণ। নির্বাণ অথবা স্বদুঃখ-নিবৃত্তিতে লীন না হইয়া নিরন্তর জীবসেবাতে নিরত থাকা, ইহাই বোধিসত্ত্ব জীবনের আদর্শ। এই আদর্শ গ্রহণ করিয়া বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্বলাভ করিতে সমর্থ হন।

মহাশ্রাবক সোপাধিক ও নিরুপাধিক বোধি লাভ করিতে পারে, কিন্তু ইঁহার প্রজ্ঞাতে তীব্র করুণার সমাবেশ থাকে না। এইজন্য শ্রাবক সংসারকে ভয় করে, কিন্তু যে যথার্থ কারুণিক সে দুঃখভোগে ভীত হয় না, কারণ সে বুঝিতে পারে যে ইঁহার দুঃখভোগের ফলে অন্যের দুঃখের উপশম ঘটে। এই সকল মহাশ্রাবক নিজ নিজ আয়ুষ্কাল ক্ষীণ হইবার পর নির্বাণ লাভ না করিলেও প্রদীপনির্বাণবৎ ত্রৈধাতুক জন্মচক্র হইতে মুক্ত হইয়া যায় ও মরণের পরে পরিশুদ্ধ বুদ্ধক্ষেত্রে অর্থাৎ অনাস্রব ধাতুতে সমাহিত হইয়া কমলপুটে জন্মগ্রহণ করে। ইঁহারা মাতৃগর্ভে পুনঃ প্রবেশ করে না। অমিতাভ প্রভৃতি সংবুদ্ধ সূর্য এই কমলযোনিতে সমাধিস্থ সত্ত্বগণকে নিজ কিরণ দ্বারা অক্লিষ্টতমের নাশের জন্য প্রবোধিত করেন। তখন ইঁহারা গতিশীল হন এবং ক্রমশঃ বোধিসম্ভার (পুণ্য ও জ্ঞান) সঞ্চয় করিতে করিতে জগদ্‌গুরুর পদ প্রাপ্ত হন। ইহা আগমের সিদ্ধান্ত।

সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, লঙ্কাবতার সূত্র, ধর্মমেঘ সূত্র, নাগার্জুনের উপদেশ প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় যে শ্রাবকযান অবলম্বন করিয়া কেহ মুখ্য মোক্ষলাভ করিতে পারে না, ইহাই তখনকার সাধারণ ধারণা ছিল। এইজন্য অনেকেই তখন মহাযানের দিকে আকৃষ্ট হইত, দেখা যায়। শ্রাবকগণ অবশ্য বিশ্বাস করিত যে ইঁহাদের সম্প্রদায়ে বোধি লাভ করিলে নির্বাণ প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহা নির্বাণ নহে, কিন্তু ত্রিলোক হইতে নির্গম মাত্র। কেহ কেহ বলেন যে একযানের উপদেশ নিয়ত গোত্রপুরুষের জন্য।

যে সত্য সত্যই মহাযানী সে প্রথমে প্রমুদিতা ভূমি প্রাপ্ত করিয়া ক্রমশঃ অনুত্তর বোধি লাভ করিয়া থাকে।

কেবল শুদ্ধবোধি হইতেই মহাবোধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহার সঙ্গে

ভগবত্তার যোগ হওয়া আবশ্যক। যতদিন পারমিতা সম্ভার পূর্ণ না হয় ততদিন ভগবত্তার উদয় হইতে পারে না। বোধিসত্ত্ব চরম জন্মে পারমিতা পূর্ণ করিয়া ভগবত্তা লাভ করেন; কিন্তু বুদ্ধত্বলাভ করেন না। কেহ কেহ ভগবত্তার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধত্বও প্রাপ্ত হন। ইনিই হন ভগবান বুদ্ধ। বোধি ও ভগবত্তার ধারা দুইটি পৃথক্‌। বোধির ধারাতে আছে বুদ্ধত্ব, কিন্তু উহা সংবুদ্ধত্ব নহে। কারণ, অন্যের প্রতি করুণা না থাকায় ঐ বোধি মহাবোধি নহে। সমগ্র বিশ্বকে আপন ভাবিয়া করুণাবিগলিতভাবে তাহার সেবা না করিতে পারিলে মহাবোধির উদয় হয় না। সেবাকর্মের নাম চর্যা, বোধিভাবের নাম প্রজ্ঞা। একই আধারে এই দুইটি যুগপৎ অবস্থিত হইলে বুদ্ধত্ব ও ভগবত্তা অভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। ইহাই মানব জীবনের চরম আদর্শ, ইহাই বুদ্ধের ভগবত্তা, ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির রহস্য। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহাকেই ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্তা বলা হইয়াছে—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদঃ তত্ত্বং যৎ জ্ঞানমদ্বয়ম্‌।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"

অর্থাৎ এক অদ্বয় জ্ঞানাত্মক তত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান বলা হয়। যোগ কর্মাত্মক—"যোগঃ কর্মসু কৌশলম্‌।" জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি বা ভাব তিনের মহাসমন্বয় ঘটিয়া উঠে। ব্রহ্ম নির্গুণ, নিঃশক্তি ও নিরাকার। পরমাত্মা সগুণ, সশক্তি ও জ্ঞানাকার। ভগবান সগুণ, সশক্তি ও সাকার। ইহাই হইল তিনটির লক্ষণগত ভেদ। কিন্তু তিনটিই এক তত্ত্ব। ভাগবতে যে অদ্বয়জ্ঞানের উল্লেখ আছে উহার বিবরণ বজ্রযান সম্প্রদায়ের অদ্বয়বজ্রসিদ্ধি নামক গ্রন্থে আছে :

"যস্য স্বভাবেনোৎপত্তির্বিনাশো নৈব দৃশ্যতে।
তজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং নাম সর্বসঙ্কল্পবর্জিতম্‌ ॥"
(চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের সংস্কৃতটীকাতে উদ্ধৃত।)

ভাগবতে ভক্তির যে স্থান বৌদ্ধাগমে করুণার ঠিক সেই স্থান। প্রজ্ঞাপারমিতা ও করুণার সামরস্য বস্তুতঃ প্রজ্ঞার প্রভাবে সাস্রব ধাতু সকলকে অতিক্রম করা ও করুণার প্রভাবে নির্বাণে প্রবেশ না করা ও জগৎ কল্যাণের জন্য অনাস্রব ধাতুতে অবস্থান করা।

'প্রজ্ঞয়া ন ভবে স্থানং কৃপয়া ন শমে স্থিতিঃ।'

অর্থাৎ প্রজ্ঞাবশতঃ সংসারে স্থিতি হয় না এবং কৃপাবশতঃ নির্বাণেও স্থিতি

হয় না। সত্ত্বার্থকরণরূপ পারতন্ত্র্যের প্রভাবে বোধিসত্ত্বগণ ভব ও শম বা নির্বাণ কোথাও অবস্থান করেন না।

(খ) পারমিতানয় ও মন্ত্রনয়।

পূর্বে পারমিতানয় ও মন্ত্রনয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বয়ং বুদ্ধই উভয় নয়ের প্রবর্তক। তথাপি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে মন্ত্রশাস্ত্রের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। অদ্বয়বজ্র লিখিয়াছেন :—

> "একার্থত্বেঽপ্যসম্মোহাৎ বহুপায়াদদুষ্করাৎ।
> তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়াবিকারাচ্চ মন্ত্রশাস্ত্রং বিশিষ্যতে॥"

মন্ত্রনয় অত্যন্ত গম্ভীর ও বিশিষ্ট। উচ্চাধিকার না থাকিলে ইহাতে প্রবেশ করা যায় না। মন্ত্রবিজ্ঞান অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে প্রচলিত ছিল। ইহা অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন বলিয়া দুরুপযোগের ভয়ে আচার্যগণ মন্ত্রমূলক সাধনা জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেন না। ইহার অনুষ্ঠান গুপ্তভাবেই করিতেন। প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তনের কথা সকলেই জানেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধর্মচক্রের প্রসিদ্ধি তত বেশী না থাকিলেও উহা অপ্রামাণিক মনে হয় না। যেপ্রকারে আগমের গম্ভীর তত্ত্বের উপদেশ কৈলাসাদি শিখর বা মেরুশৃঙ্গাদি উচ্চ প্রদেশ হইতে শঙ্কর আদি গুরুমূর্তি শিষ্যরূপা পার্বতী প্রভৃতিকে প্রদান করিয়া থাকেন, ঠিক সেইপ্রকারে রাজগৃহের নিকটস্থ গৃধ্রকূট নামক পর্বত হইতে বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসু ভক্তগণের নিকট পারমিতা মার্গের প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে সময়ে গৃধ্রকূটে বুদ্ধদেব সমাধি গ্রহণ করেন সেই সময় তাঁহার দেহ হইতে দশদিকে তেজ নিঃসৃত হয় এবং সর্বপ্রদেশ আলোকিত হইয়া উঠে। তিনি মুখ খুলিয়াই দেখিতে পাইলেন যে ঐস্থানে অগণিত সুবর্ণময় সহস্রদল কমল প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার দেহের প্রভাবে লোকের নানা দুঃখের উপশম হইয়াছে। এই উপদেশের বিবরণ মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা শাস্ত্রে নিবদ্ধ আছে। প্রসিদ্ধি আছে যে নাগার্জুন এই গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ বিভিন্ন সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছে। কোন কোন সংস্করণের কোন কোন অংশের ভাষান্তরও হইয়াছে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই সকল দেশেই ইহার প্রচার হইয়াছিল। মহাযান সাহিত্যে শূন্যতা, করুণা, পরার্থসেবা প্রভৃতি বিষয়ের ও যোগাদির সবিশেষ বর্ণনা উপলব্ধ হয়। এই প্রজ্ঞাপারমিতা বস্তুতঃ

জগন্মাতা মহাশক্তিরূপা মহামায়া। মহাযান ধর্মের বিকাশে শাক্তাগমের পূর্ব প্রভাব লক্ষিত হয়। এই মহাশক্তিরূপা প্রজ্ঞা বোধিসত্ত্বগণের জননী তো বটেই, বুদ্ধগণেরও জননী। যেমন শিব ও শক্তিতে চন্দ্র ও চন্দ্রিকাবৎ অভেদ সম্বন্ধ আছে, সেই প্রকার বুদ্ধ ও প্রজ্ঞাপারমিতা সম্বন্ধেও জানিতে হইবে। বিশ্বদুঃখের নির্মোচন কর্মে বোধিসত্ত্বগণ এই জননীর প্রেরণা ও সামর্থ্যবশতঃই অগ্রসর হইতে পারেন। এই পারমিতা ও মন্ত্রনয় সর্বত্রই স্বীকৃত। মহাশক্তির অনুগ্রহ ব্যতীত লোকার্থ-সম্পাদন কর্ম অসম্ভব।

পারমিতানয়ের লক্ষ্য বুদ্ধত্বলাভ, মন্ত্রনয়ের লক্ষ্যও ঠিক তাহাই। পারমিতানয়ে অবান্তর ভেদও আছে। উহার আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। তবে ইহা বলা যায় যে ধ্যান, ধ্যানের ফল, দৃষ্টি, করুণার স্বরূপ এবং ত্রিকায় বিষয়ক বিচারে দুই ধারাতে কোন কোন স্থলে মতভেদ আছে। মায়োপম অদ্বয়বাদের লক্ষ্য একটি বিশেষ প্রকারের কিন্তু সর্বধর্মাপ্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য উহা হইতে ভিন্ন। উভয় স্থলেই পারমিতাসকলের পূর্তি আবশ্যক হয়, উভয় নয়ের সাধনার ক্ষেত্রে যোগাচার বা যোগচর্যার প্রাধান্য রহিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক নয়েই যোগশব্দের তাৎপর্য পৃথক্। দুইটিই বোধিসত্ত্ব যান, ইহাও সত্য। পারমিতানয়ে করুণা, মৈত্রী প্রভৃতি চর্যা প্রধান। মাধ্যমিক ও যোগাচার উভয় সম্প্রদায়ে পারমিতানয়ের সমাদর ছিল। নাগার্জুন প্রবর্তিত মাধ্যমিক মত কালদৃষ্টিতে কিছু প্রাচীন। ইহার উদ্ভবস্থল ঠিক ঐ দেশ যেখানে মন্ত্রনয়ের উদ্ভব হইয়াছিল। শ্রীধান্যকটক নামক এইস্থান অমরাবতীর নিকটবর্তী। তান্ত্রিক সাধনার ইতিহাসে শ্রীশৈল বা শ্রীপর্বতের নাম সুপ্রসিদ্ধ। এইটি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম মল্লিকার্জুনের ক্ষেত্র। বৌদ্ধ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই যে ভগবান বুদ্ধ ধান্যকটকেই মন্ত্রনয়ের প্রচার করিয়াছিলেন—ইহাই তৃতীয় ধর্মচক্রপ্রবর্তন। নাগার্জুনের কিছুদিন পরে আচার্য অসঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ প্রবর্তক। অসঙ্গ বসুবন্ধুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। এ সময়ে মহাযোগিদের মধ্যে ইঁহার গণনা হইত। ইঁহার মহাযান সূত্রালঙ্কার গ্রন্থে তান্ত্রিক প্রভাব স্পষ্ট প্রতীত হয়। প্রসিদ্ধি আছে যে মৈত্রেয়নাথের উপদেশ অনুসারে ইঁহার ধার্মিক জীবন আমূল পরিবর্তিত হইয়াছিল। আধুনিক অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে মৈত্রেয়নাথ এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। বস্তুতঃ মহাযান সূত্রালঙ্কারের মূল কারিকাগুলি ইঁহারই রচিত।

আমার বিশ্বাস, মহাযান তন্ত্রের প্রভাব অসঙ্গের পূর্বকাল হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামক গ্রন্থ অনেকেরই পরিচিত, তাছাড়া ঐসময়ে অষ্টাদশ পটলাত্মক 'গুহ্য সমাজ' নামক গ্রন্থের প্রসিদ্ধি খুবই বেশী ছিল। পরবর্তী বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার বিকাশে গুহ্য সমাজের প্রভাব অতুলনীয়। ইহার উপর নাগার্জুন, কৃষ্ণাচার্য, লীলাবজ্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, কুমারকলশ, জ্ঞানকীর্তি, আনন্দগর্ভ, চন্দ্রকীর্তি, মন্ত্রকলশ, জ্ঞানগর্ভ, দীপঙ্কর ভদ্র প্রভৃতি বহুসংখ্যক সিদ্ধ ও বিদ্বান্ বৌদ্ধ পণ্ডিত এই গ্রন্থোক্ত তত্ত্ব সম্বন্ধে বিবিধ মহত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অসঙ্গের ছোটভাই বসুবন্ধু প্রথমে বৈভাষিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন। পরে অসঙ্গের প্রভাবে পরিপক্ক যোগাচারীরূপে পরিণত হন। অসঙ্গ গুহ্য সমাজের রচয়িতা ছিলেন কিনা বলা যায় না, কিন্তু উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন শৈব ও শাক্ত আগম আলোচনা ভালভাবে করিলে মনে হয় যে অসঙ্গ, নাগার্জুন প্রভৃতি উক্ত আগমের প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন না। কামাখ্যা, জালন্ধর, পূর্ণগিরি, উড্ডীয়ান, শ্রীপর্বত, ব্যাঘ্রপুর প্রভৃতি স্থান তান্ত্রিক বিদ্যার সাধনকেন্দ্র ছিল। মাতৃকা সাধনের উপযোগী কেন্দ্র ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ প্রদেশসমূহে ছড়াইয়াছিল। মন্ত্রসাধন প্রাচীন বাক্‌যোগেরই একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়া মাত্র।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে বৌদ্ধমতে পারমিতানয়ের প্রবর্তকও ভগবান বুদ্ধই ছিলেন। ক্রমশঃ মন্ত্রমার্গে বহু অবান্তর ভেদ আসিয়া পড়ে। তদনুসারে বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান প্রভৃতির আবির্ভাব হয়।

ইহাদের মধ্যে কিছু ভেদ আছে সত্য, কিন্তু অনেকাংশে সাদৃশ্যও আছে। বস্তুতঃ যাবতীয় মন্ত্রমার্গে দুইপ্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। মনে হয় একই সাধনধারা বিভক্ত হইয়া ভাবের প্রধানতা ও গৌণতাবশতঃ ভিন্ন হইয়া পড়ে। পারমিতা-নয়ের সমস্ত সাহিত্যই বিশুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত, কিন্তু মন্ত্রনয়ের মূল কিছু সংস্কৃত, কিছু প্রাকৃত ও কিছু অপভ্রংশ। শাবরাদি ম্লেচ্ছভাষাতেও মন্ত্র-রহস্য ব্যাখ্যাত হইত। এই কথা লঘুতন্ত্ররাজটীকা বিমলপ্রভাতে উল্লিখিত হইয়াছে। মন্ত্রনয়ের তিনটি ধারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট ছিল—বস্তুতঃ ইহাই বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনা। যদি মহাশক্তির আরাধনাকেই তান্ত্রিক সাধনার বৈশিষ্ট্য মনে করা হয় তাহা হইলে পারমিতানয়ও তান্ত্রিকশ্রেণীতে পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই।

বজ্রযানের সাধনাতে মন্ত্রের প্রাধান্য আছে। এইজন্য কোন কোন স্থানে

বজ্রযানকে মন্ত্রযানও বলা হয়। সহজযানে মন্ত্রের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় নাই। কিন্তু বজ্রযান ও কালচক্রযানের যোগসাধনাতে মন্ত্রের উপযোগিতা স্বীকৃত হইয়াছে। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী দীপঙ্কর বুদ্ধ এই মার্গের আদি উপদেষ্টা ছিলেন। বজ্রমার্গ কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। শুনা যায় যে সাংখ্য 'কালার্কভক্ষিত' হইয়াছিল এবং গীতোক্ত যোগ দীর্ঘকাল লুপ্ত থাকার পর ("যোগো নষ্টঃ পরন্তপ") শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পুনঃ প্রবর্তিত হইয়াছিল। ঠিক সেইপ্রকার বজ্রযানের প্রবাহও বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। যদিও কোন কোন স্থানে হয়ত ইহার আভাস বিদ্যমান ছিল, তথাপি ইহা সত্য যে জনচিত্তের উপর ইহার প্রভাব ছিল না। উত্তরকালে বজ্রযান বজ্রযোগ নাম ধারণ করিয়া প্রকট হইয়াছিল। রাজা সুচন্দ্র ইহার প্রবর্তক ছিলেন।

তান্ত্রিক সাধনা ও মন্ত্রনয়

(ক) বজ্রযোগ।

পারমিতানয়ের বিশ্লেষণ সৌত্রান্তিকনয় অনুসারে করা হয়। কিন্তু মন্ত্রনয়ের ব্যাখ্যা একমাত্র যোগাচার ও মাধ্যমিক দৃষ্টিতেই হইতে পারে। সৌত্রান্তিক মতে বাহ্যার্থ অনুমেয়, প্রত্যক্ষ নহে। মাধ্যমিক সাধক বিজ্ঞানও স্বীকার করে না। দৃষ্টির প্রসার ও উৎকর্ষসাধন বিশেষরূপে না হইলে মন্ত্রসাধনায় অধিকার লাভ হয় না।

মন্ত্রযানের লক্ষ্য বজ্রযোগসিদ্ধি। সাধকের আধার যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্র-সাধনা সম্ভব নহে। পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইতে হইলে এই মার্গই শ্রেষ্ঠ। এই মহামার্গের চারিটি স্তর আছে। এক একটি স্তরে পূর্ণযোগের এক একটি রূপ আবরণ হইতে উন্মুক্ত হয়। চারিটি স্তরের সাধনা সম্পূর্ণ হইলে যোগ পূর্ণতা লাভ করে। প্রত্যেক স্তরের যোগলাভের পূর্বে বিমোক্ষলাভ আবশ্যক।

কল্পনাদি ও আবর্জনাদি হইতে মুক্তিলাভকে বিমোক্ষ বলে। এই প্রকার মুক্তিলাভের উপায় ধ্যান। অতএব ধ্যান—বিমোক্ষ—যোগ, ইহাই স্বাভাবিক ক্রম। স্তরের সংখ্যা চারিটি বলিয়া বিমোক্ষও চারিপ্রকার—শূন্যতা, অনিমিত্ত, অপ্রণিহিত ও অনভিসংস্কার। প্রত্যেক যোগের বিমোক্ষের প্রভাবে এক-

একটি শক্তির বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ এক একটি বজ্রযোগে এক একটি শক্তি পূর্ণ হয়। শক্তির পূর্ণবিকাশের ফলে বজ্রভাবের উদয় ঘটে। স্থূলদৃষ্টিতে নিজ সত্তাকে চারিভাগে বিভক্ত করা চলে—কায়, বাক্, চিত্ত ও জ্ঞান। প্রথম, বজ্রযোগে কায়-বজ্রভাবের উদয় হয়। এইপ্রকার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। যাহাকে কায়বজ্র বলা হয় তাহা স্থূল জগতের পূর্ণতা। বাকি তিনটিও এইপ্রকারই বুঝিয়া লইতে হইবে।

প্রথম বজ্রযোগের নাম বিশুদ্ধযোগ। ইহার জন্য প্রথমে শূন্যতা নামক বিমোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। শূন্যতা বলিতে স্বভাব-শূন্যতাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শূন্যতা সিদ্ধ হইলে অতীত ও অনাগত থাকে না। শূন্যতা-দর্শনকে যোগিগণ গম্ভীর ও উদার বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। অতীত ও অনাগত নাই বলিয়া উহা গম্ভীর এবং না থাকিলেও উহার দর্শন হয় বলিয়া উহা উদার। শূন্যতার গ্রহণ যে জ্ঞানে ঘটিয়া থাকে তাহারই পারিভাষিক নাম শূন্যতা-বিমোক্ষ। ইহার ফলে তুরীয় অবস্থার ক্ষয় হয় ও অক্ষয় মহাসুখের উদয় হয়। করুণার লক্ষণ জ্ঞানবজ্র বা সহজকায়। ইহা বস্তুতঃ প্রজ্ঞা ও উপায়ের সাম্যাবস্থা। ইহাই বিশুদ্ধ যোগ।

দ্বিতীয় যোগের নাম ধর্মযোগ। ইহার জন্য আবশ্যক অনিমিত্ত বিমোক্ষ। বুদ্ধ বোধি প্রভৃতি বিকল্পময় চিত্তকে নিমিত্ত বলে। যে জ্ঞানে এইপ্রকার বিকল্প থাকে না তাহার নাম অনিমিত্ত বিকল্প। ইহা প্রাপ্ত হইলে সুষুপ্তি দশা ক্ষয় হয়। তখন মৈত্রীরূপ চিত্তের উদয় হয়, যাহা নিত্য-অনিত্যাদি দ্বন্দ্ব হইতে সদা বিমুক্ত। এইপ্রকার চিত্ত বজ্রধর্মকায় নামে প্রসিদ্ধ। ইহা দুই কায়ের স্ফুরণ। তখন বুঝা যায়, এই জগৎ-কল্যাণ-সাধন নির্বিকল্পক চিত্ত হইতে ভিন্ন নহে। এই যোগ প্রজ্ঞা ও উপায়ের সামরস্য মাত্র।

তৃতীয় যোগের নাম মন্ত্রযোগ। ইহার জন্য অপ্রণিহিত নামক বিমোক্ষ আবশ্যক। নিমিত্তের অভাবে তর্কের অভাব হয়। বিতর্ক চিত্তের অভাবে প্রণিধানের উদয় হয় না। তাই ইহাকে অপ্রণিহিত বলে। অপ্রণিহিত শব্দের তাৎপর্য—"আমি সংবুদ্ধ" এই জাতীয় ভাবের উদয়। এই বিমোক্ষলাভের ফলে স্বপ্ন ক্ষয় হয় ও ভিতরে অনাহত ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে থাকে। ইহাই যথার্থ মন্ত্র, অথবা 'সর্বভূতরুত'। ইহার নামান্তর মুদিতা। ইহার দ্বারা সর্বসত্ত্বের মোদন বা আনন্দ সঞ্চার হয়। মনের ত্রাণ হয় বলিয়া এইস্থলে মন্ত্রপদের

সার্থকতা বুঝিতে হইবে। ইহার নাম বাক্‌বজ্র বা সম্ভোগকায়। প্রজ্ঞা ও উপায়ের সামরস্যই মন্ত্রযোগ। ইহা সূর্যস্বরূপ।

চতুর্থ যোগের নাম সংস্থান যোগ। ইহার জন্য অনভিসংস্কার নামক বিমোক্ষ আবশ্যক। শ্বেত, রক্তাদি বর্ণ, প্রাণায়াম ও বিজ্ঞান এইগুলির পারিভাষিক নাম অভিসংস্কার। এই বিমোক্ষের প্রভাবে যে বিশুদ্ধি লাভ হয় তাহার ফলে জাগ্রত অবস্থার ক্ষয় হয় ও অনন্ত নির্মাণকায়ের স্ফুরণ ঘটে। তখন উপেক্ষারূপ কায়বজ্রের প্রাপ্তি ঘটে। রৌদ্র, শান্তা প্রভৃতি রূপের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। নির্মাণকায় বা প্রজ্ঞা ও উপায়ের সামরস্যই সংস্থানযোগ। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ ইহাকে 'কমলনয়' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে চারিটি যোগের দ্বারা চারিটি অবস্থা অতিক্রম করা আবশ্যক। বজ্রযোগের ফল পূর্ণ নির্মলতা লাভ করা। তুরীয় প্রভৃতি চারিটি অবস্থাতেই কোন না কোন প্রকার মল থাকিয়াই যায়। যতক্ষণ ঐ সকল মল শুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ পূর্ণত্ব লাভ হইতে পারে না। তুরীয়ের মল হইল রাগ বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়দ্বয়, সুষুপ্তির মল তম, স্বপ্নের মল শ্বাস-প্রশ্বাস অর্থাৎ প্রাণাদি পঞ্চক এবং সৎ-অসৎ বিকল্প আর জাগ্রতের মল হইল সংজ্ঞা বা দেহবোধ।

তান্ত্রিক যোগিগণ বলেন যে বৈদিক যোগ দ্বারা মলসকলের নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু তান্ত্রিকক্রিয়ার প্রভাবে মল থাকিতে পারে না। এই মতে সকল বস্তুই শূন্য বা স্বভাবহীন। অতীত নাই, অনাগতও নাই। ইহা জানিয়া ধ্যান করিলে মনোভাব শূন্যাত্মক হয়। ইহা অত্যন্ত গম্ভীর বিষয় এবং দেশ-কালাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। এই আধারের উপর যে জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত তাহাকেই শূন্যতা-বিমোক্ষ বলে। ইহার প্রভাবে মোহনাশক নির্বিকার আনন্দের অভিব্যক্তি হয়। বিশ্বকরুণাযুক্ত জ্ঞান শুদ্ধ হইয়া থাকে। ইহারই নাম সহজকায় ও বিশুদ্ধ যোগ।

উপরে যে চারিটি বজ্রযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল উহা গুহ্য সমাজ, বিমলপ্রভাদি গ্রন্থের উপদেশও তাৎপর্যমূলক। চৈতন্যকে আবরণ হইতে মুক্ত করাই যোগের উদ্দেশ্য। এক একটি বজ্রযোগের অনুষ্ঠানের প্রভাবে চৈতন্য হইতে এক একটি আবরণ অপসারিত হয়, ইহার ফলে সমগ্র বিশ্বদর্শনের এক এক অঙ্গ খুলিয়া যায়। ইহার নাম অভিসংবোধি। চারিটি যোগের দ্বারা

চারি প্রকার অভিসংবোধির উদয় হয়। তখন পূর্ণতা লাভের অন্তরায় দূর হইয়া যায়।

সাধারণতঃ এই সংবোধির আলোচনা উৎপত্তি ও উৎপন্ন এই দুইটি ক্রমে করা হয়। বৌদ্ধগণ বলেন যে বৈদিক ধারার সাধনাতেও এই দুইটি ক্রমের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকার ভিন্ন। সম্যক্ প্রকারে বিশ্বদর্শন করিতে হইলে সৃষ্টিক্রম ও সংহারক্রম অথবা আরোহক্রম ও অবরোহক্রম উভয়েরই আবশ্যকতা আছে। শ্রীচক্র লেখনের প্রণালীতে কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে অথবা পরিধি হইতে কেন্দ্রের দিকে গতি হইতে পারে। কিন্তু উভয়ে তত্ত্বদৃষ্টিতে ও কার্যদৃষ্টিতে ভেদ লক্ষিত হয়। সেইপ্রকার উৎপত্তিক্রম ও উৎপন্নক্রমেও ভেদ আছে।

উৎপত্তিক্রমে চারিটি সংবোধিক্রম বুঝিবার উপায় এই : সর্বপ্রথম একক্ষণ অভিসংবোধি। ইহা স্বাভাবিক বা সহজকায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। যে ক্ষণে জন্ম-উন্মুখ আলয় বিজ্ঞান, মাতৃগর্ভে মাতা ও পিতার সমরসীভূত বিন্দুদ্বয়ের সঙ্গে একত্ব লাভ করে, উহা একটি মহাক্ষণ। ঐ ক্ষণে যে সুখসংবৃত্তির উদয় হয় তাহার নাম একক্ষণসংবোধি। ঐ সময় গর্ভস্থ কায়া রোহিত মৎস্যের ন্যায় একাকার থাকে। উহাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভাগ থাকে না।

ইহার পর পঞ্চাকার সংবোধির উদয় হয়। প্রথম কায়া সহজকায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, কিন্তু এই কায়া ধর্মকায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। মাতৃগর্ভে যখন রূপাদি বাসনাত্মক পঞ্চ সংবৃত্তির উদয় হয় তখন ঐ আকার কূর্মবৎ পঞ্চ স্ফোটকবিশিষ্ট লক্ষিত হয়। এইটি পঞ্চাকার মহাসংবোধির অবস্থা।

ইহার পর উক্ত পঞ্চ জ্ঞান হইতে প্রত্যেকটি জ্ঞান পঞ্চধাতু, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ আয়তনের বাসনাভেদবশতঃ বিংশতিপ্রকার রূপ ধারণ করে। কায়টিও কুড়ি অঙ্গুলি পরিমিত হয়। ইহাই বিংশত্যাকার সংবোধি। ইহার সম্বন্ধ সম্ভোগকায়ার সঙ্গে। এই পর্যন্ত বিকাশ মাতৃগর্ভে ঘটিয়া থাকে।

ইহার পর গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্তি হয় অর্থাৎ প্রসব হয়। তখন মায়াজালের ন্যায় অনন্তভাবের সংবেদন হয়। জ্ঞানে আর বিংশতিপ্রকার ভেদ থাকে না, অনন্ত ভেদের স্ফুরণ হইয়া থাকে। ইহার নাম মায়াজাল অভিসংবোধি, ইহা নির্মাণকায় সহ সংশ্লিষ্ট।

মায়াজালের জ্ঞান উদিত হইলে বুঝিতে হইবে যে উৎপত্তিক্রম সমাপ্ত

হইয়াছে। পরমশুদ্ধ সত্তা হইতে মায়ারাজ্যে অবতরণের ইহাই ইতিহাস। মাতৃ-গর্ভেই রচনা হইয়া থাকে। কামকলা তত্ত্বের ইহাই রহস্য। শুক্লবিন্দু ও রক্তবিন্দু নামক দুইটি কারণবিন্দু কার্যবিন্দুরূপে পরিণত হয়। পরবর্তী সৃষ্টি বস্তুতঃ এই কার্যবিন্দুরই ক্রমবিকাশমাত্র। ইহা হইতে বুঝা যায় যে সৃষ্টির প্রারম্ভে আনন্দমাত্রই থাকে। ইহার নাম কেবল সুখসংবৃত্তি। উপনিষদেও আছে—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।"

ইহা বস্তুত, মহাক্ষণের স্থিতি। সৃষ্টিতে মায়াজালের অনন্ত নাগপাশ বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। আনন্দ ভাঙ্গিয়া যায় ও নানাপ্রকার দুঃখের আবির্ভাব হয়। প্রত্যাবর্তনকালে মায়াকে ছিন্ন করিয়া এক মহাক্ষণে ফিরিতে হয়, অর্থাৎ নির্মাণকায় হইতে সহজকায় পর্যন্ত আরোহণ করিতে হয়। প্রত্যাবর্তনের ধারাতে এককক্ষণসংবৃত্তিকে অন্তিম বিকাশরূপে স্বীকার করা হয়। বস্তুতঃ এইক্ষণেই বিশ্বাতীত মহাশক্তি অবতীর্ণ হন এবং প্রত্যাবর্তন করেন। যোগী গর্ভাধান ক্ষণটিকেই উৎপত্তিক্ষণ মনে করেন। কিন্তু অযোগীর দৃষ্টিতে গর্ভ হইতে নিষ্ক্রমণ ক্ষণ বা নাড়ীচ্ছেদক্ষণই উৎপত্তিক্ষণ। ঐক্ষণে মায়া অথবা বৈষ্ণবী মায়ার স্পর্শ ঘটে।

ইহার পর শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। দেহরচনার মূলে আছে ক্ষর বিন্দু বা আলয় বিজ্ঞান। ইহা অশুদ্ধ বিজ্ঞান। ইহারই জন্ম হয়। দুইটি কার্যবিন্দু একত্র হইয়া দেহ রচনা করে।

উৎপন্নক্রম বস্তুতঃ আরোহক্রম। এক দৃষ্টিতে ইহাকে সংহারক্রমও বলা যাইতে পারে। অন্তদৃষ্টিতে ইহাকে সৃষ্টিক্রমও বলা চলে। যে প্রকার মায়া হইতে ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করা একটি ধারা, সেইপ্রকার ব্রহ্মাবস্থাতেও একটি বিকাশের ব্যাপার রহিয়াছে, যাহার প্রভাবে পরমাত্মা ও ভগবান পর্যন্ত ভাবের ব্যঞ্জনা ঘটে। বৌদ্ধ চিন্তার রহস্য কতকটা এই দৃষ্টিতে দেখিলেই উন্মীলিত হইতে পারে। মায়ার প্রভাবে প্রতিদিন একুশ হাজার ছয়শো শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিতেছে। প্রত্যাবর্তনের অবস্থাতেও সেইপ্রকার ঠিক এককক্ষণ অভিসংবোধি ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থাতে প্রাণ বায়ু শান্ত হয়। তখন চিত্ত মহাপ্রাণে স্থির হইয়া যায় ও স্থূল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া থাকে না। তখন দিব্য ইন্দ্রিয়ের উদয় হয়। স্থূল দেহাভিমান থাকে না, দিব্য দেহের আবির্ভাব হয়।

এই সময় একই ক্ষণে বিশ্বদর্শন সংঘটিত হয় : "দদর্শ নিখিলং লোকং আদর্শ ইব নির্মলে।" এই জ্ঞানের নাম বজ্রযোগ—ইহা স্বভাবকায়ের অবস্থা।

ক্ষরবিন্দু হইতে দেহ-রচনাত্মক সৃষ্টি হয়, অক্ষর বা অচ্যুত বিন্দু হইতে বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানাত্মক সৃষ্টি হয়। এই এককক্ষণাভিসংবুদ্ধ স্থিতিই বজ্রসত্ত্বের স্থিতি। এই অবস্থায় শ্বাসচক্রের ক্রিয়া থাকে না। এই মহাক্ষণকেই বুদ্ধের জন্মক্ষণ বলা হইয়া থাকে। ইহারই নাম দ্বিতীয় জন্ম।—"জন্মস্থানং জিনেন্দ্রাণামেকস্মিন্ সময়েঽক্ষরে।" এইটি স্বভাবকায়ের অবস্থা।

ইহার পর চিত্ত বজ্রযোগ হয়। প্রথমে যিনি বজ্রসত্ত্ব ছিলেন, তিনি যখন মহাসত্ত্বরূপে প্রকট হন, তখন পরম অক্ষর সুখের অনুভব হয়। ইহার নাম পঞ্চাকার অভিসংবোধি। আদর্শজ্ঞান, সমতাজ্ঞান, প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান, কৃত্যানুষ্ঠান জ্ঞান ও পূর্ণ বিশুদ্ধ ধর্মধাতুর জ্ঞান, ইহাই মোক্ষ জ্ঞান। রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ ও দ্রব্যাদি পঞ্চ ধাতু উভয়ই প্রজ্ঞা ও উপায়াত্মক। এই পঞ্চমণ্ডল নিরোধস্বভাব—এটা হইল ধর্ম ও কালের অবস্থা। এ সময়ে শ্বাসচক্র পুনরায় ক্রিয়াশীল হয়।

যখন সম্ভোগকায়ের অভিব্যক্তি হয় তখন উহাকে বাক্‌বজ্ররূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। ইহা মহাসত্ত্ব, যাহার পরিণাম বোধিসত্ত্ব। এই দ্বাদশাকার সত্ত্বার্থ বোধিসত্ত্বগণের অনুগ্রাহক। এই সর্বসত্ত্বরূপ দ্বারা ধর্মদেশনা করা হয়। এটা বিংশত্যাকার অভিসংস্কারের দশা। ইহাতে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ বিষয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় ও নিবারণ লক্ষণ বারোটি সংক্রান্তি আছে।

সকলের শেষে কায়বজ্রযোগের নিরূপণ হইয়া থাকে। ইহাই নির্মাণকায়। অনন্ত মায়াজাল হইতে কায়ের স্ফুরণ হয়। এখানকার সমাধির নাম মায়াজাল অভিসংবোধি। এই অবস্থায় একই সময়ে অনন্ত ও নানাপ্রকার মায়ার নির্মাণলক্ষণ ষোড়শ আনন্দময় বিন্দুর নিরোধ হয়।

(খ) আনন্দরহস্য।

এই উপলক্ষ্যে প্রসঙ্গতঃ বৌদ্ধ তান্ত্রিক দৃষ্টি অনুসারে আনন্দরহস্য সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক। স্থূলদৃষ্টিতে আনন্দ চারিপ্রকার—আনন্দ, পরমানন্দ, বিরমানন্দ ও সহজানন্দ। যে সময়ে মন কামনার দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়, তখনই আনন্দ উদয়ের সময়। বস্তুতঃ ইহা ভাবেরই বিকাশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। শক্তির অভিব্যক্তি হইতে ইহার আবির্ভাব ঘটে। ইহার পর যখন অভিব্যক্ত শক্তির

সঙ্গে মিলন পূর্ণ হয় তখন বোধিচিত্তও পূর্ণতা লাভ করে। এই পূর্ণতার স্থান ললাট। এই আনন্দের নাম পরমানন্দ। বৌদ্ধ তান্ত্রিক পরিভাষাতে শরীরের সারাংশ বিন্দু বোধিচিত্ত নামে অভিহিত হয়। উত্তমাঙ্গ হইতে বোধিবিন্দুর ক্ষরণ হয়। ইহারই নামান্তর অমৃত-ক্ষরণ। এই অবস্থার নাম জ্বালা। ইহাই বিরমানন্দের স্বরূপ। ইহার পর বাক্ ও চিত্তবিন্দুর অবসানে যখন বিন্দু-চতুষ্টয়ের নিষ্ক্রমণ হয়, তখন সহজানন্দের আবির্ভাব হয়।

যোগিগণ বলেন যে প্রতি পক্ষে প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী পর্যন্ত পাঁচটি তিথিরূপ চন্দ্রকলা আকাশাদি পঞ্চভূতের স্বরূপ। ইহাদের নাম ক্রমশঃ নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা ও পূর্ণা। ইহাদের প্রতীক স্বরাদি বর্ণ। এই পাঁচটিতে আনন্দ পূর্ণতা লাভ করে। ষষ্ঠী হইতে দশমী পর্যন্ত তিথিও পূর্ববৎ আকাশাদি পঞ্চভূতের স্বরূপ। ইহাতে পরামানন্দ পূর্ণ থাকে। একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্তও আকাশাদি পঞ্চভূতস্বরূপ। ইহাতে বিরমানন্দ পূর্ণ থাকে। এই তিন আনন্দের যেটি সাম্যাবস্থা তাহাই ষোড়শী কলা, ইহার নাম সহজানন্দ। ইহাতে সকল ধাতুর সমাহার হইয়া থাকে। প্রত্যেক আনন্দের মধ্যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় ভেদে কায়, বাক্, চিত্ত ও জ্ঞানের যোগে চারিপ্রকার যোগ আরম্ভ হয়—যথা, কায়ানন্দ, বাগানন্দ ইত্যাদি। তদনুসারে প্রতি আনন্দে সংশ্লিষ্ট যোগও চারিপ্রকার। এইভাবে চারিটি বজ্রযোগ ষোড়শীযোগে পরিণত হয়। ইহাদের আলাদা আলাদা নাম আছে। তন্মধ্যে প্রথমটির নাম কাম ও অন্তিমটির নাম নাদ।

(গ) শক্তি উপাসনা—ত্রিকোণ ও প্রজ্ঞাতত্ত্ব।

তান্ত্রিক উপাসনা বস্তুতঃ শক্তিরই উপাসনা। বৌদ্ধগণের দৃষ্টিতে প্রজ্ঞাই শক্তির স্বরূপ। ইহার প্রতীক ত্রিকোণ, যাহাতে ছয়টি ধাতু বিদ্যমান আছে। এইজন্য ইহার ছয়টি গুণ প্রসিদ্ধ—যথা, সমগ্র ঐশ্বর্য, রূপ, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও অর্থবত্তা।* বৈষ্ণবগণ চতুর্ব্যূহের প্রসঙ্গে ভগবান্ অথবা বাসুদেবের ষাড়্গুণ্য বিগ্রহ স্বীকার করেন এবং সঙ্কর্ষণাদি তিন ব্যূহের প্রত্যেকটির গুণদ্বয়াত্মক বিগ্রহ মানেন। বৌদ্ধাগম এবং বৌদ্ধেতর শৈব শাক্তাগমেও কতকটা এই প্রণালী

* সুপ্রসিদ্ধ "ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য" [?] "ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা" শ্লোকে যে ছয়টি গুণের উল্লেখ পাওয়া যায় তন্মধ্যে রূপ স্থানে ধর্ম এবং অর্থবত্তা স্থানে বৈরাগ্য পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তির প্রতীক ত্রিকোণের তিন কোণে আছে তিন বিন্দু এবং কেন্দ্রে আছে মধ্যবিন্দু। মধ্যবিন্দুতেই তিন বিন্দুর সমাহার হয়। প্রতি কোণের বিন্দুতে দুইটি গুণের সত্তা মানা হয়। তাই সমষ্টিতে হয় ষড়্‌গুণ। শাক্তগণের চতুষ্পীঠ কল্পনার মূলও ইহাই। বৌদ্ধগণ বলেন যে এই ত্রিকোণ ক্লেশ, মার প্রভৃতির ভঞ্জন করিয়া থাকে; তাই ইহার নাম ভগ। হেবজ্রতন্ত্রে প্রজ্ঞাকে ভগ বলা হইয়াছে। ইহার নাম বজ্রধর ধাতু মহামণ্ডল। ইহা মহাসুখের আবাসস্থান। ইহা 'এ'কার বা ধর্মধাতু পদের বাচ্য। ইহা অজর, স্বচ্ছ, আকাশের ন্যায় নির্মল, অনবকাশ ও প্রকাশময়। ইহারই নামান্তর বজ্রালয় বা বজ্রাসন। ইহা অখণ্ড, অপরিমিত ও অনন্ত প্রকাশময়। ইহাকে আসন করিয়া যিনি আসীন হন তাঁহাকেই বাস্তবিক পক্ষে ভগবান বলা হইয়া থাকে। তাঁহাকেই মহাশক্তির অধিষ্ঠাতা বলিয়া গণনা করা হয়।

বৌদ্ধেতর আগমশাস্ত্রেও 'এ'কার শক্তির প্রতীক। ইহা ত্রিকোণ। অনুত্তর পরস্পন্দের দ্যোতক 'অ' এবং উচ্ছলিত আনন্দের দ্যোতক 'আ'। এই 'অ' অথবা 'আ' ইচ্ছারূপ 'ই'র সঙ্গে নিয়োজিত হইলে ত্রিকোণের রচনা সম্পন্ন হয়। ইহাই 'এ'কার—ইহা বিসর্গানন্দময় সুন্দররূপে বর্ণিত হয়। মনে রাখিতে হইবে যে মহারাজ অশোকের ব্রাহ্মী লিপিতে 'এ'কার ত্রিকোণাকার।

ত্রিকোণং একাদশকং বহ্নিগেহঞ্চ যোনিকম্।
শৃঙ্গাটং চৈব একারনামভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্॥

ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই তিনটি ত্রিকোণের রূপে পরিণত হয়। বিসর্গরূপ পরাশক্তি আনন্দোদয়ের মাধ্যমে ইচ্ছা ও জ্ঞানের অবস্থা ভেদ করিয়া ক্রিয়া-শক্তিরূপ ধারণ করে। ত্রিকোণের উল্লাস ইহারই দ্যোতক। এখানে শক্তি নিত্যোদিতা বলিয়া ইহা পরমানন্দময়। এই যোগিনীজন্মাধার ত্রিকোণ হইতে কুটিলরূপা কুণ্ডলিনী শক্তি প্রকট হয়।

ত্রিকোণং ভগমিত্যুক্তং বিয়ৎস্থম্ গুপ্তমণ্ডলম্।
ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াকোণং তন্মধ্যে চিঞ্চিনী ক্রমম্॥

বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত ইহারই অনুরূপ।

'এ'কারাকৃতি যৎ দিব্যং মধ্যং বংকারভূষিতম্।
আলয়ঃ সর্বসৌখ্যানাং বোধরত্নকরণ্ডকম্॥

বাহিরে দিব্য একার, ত্রিকোণের মধ্যে বংকার, ইহার মধ্যবিন্দুতে সর্বসুখের আলয় বুদ্ধরত্ন নিহিত রহিয়াছে। এই প্রজ্ঞাই রত্নত্রয়ের অন্তর্গত ধর্ম। এইজন্য 'এ'কারকে ধর্মধাতু বলা হয়। বুদ্ধরত্ন এই ত্রিকোণের মধ্যে অথবা ষট্‌কোণের মধ্যবিন্দুতে প্রচ্ছন্ন আছে।

(ঘ) মুদ্রাতত্ত্ব।

তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের ভাষায় যাহা মুদ্রা তাহা শক্তিরই অভিব্যক্ত বা বাহ্য রূপ। কর্মমুদ্রা, ধর্মমুদ্রা, মহামুদ্রা ও সময়মুদ্রা ভেদে মুদ্রা চারিপ্রকার। গুরুকরণের পর সাধনের জন্য শিষ্যকে প্রজ্ঞা গ্রহণ করিতে হয়। প্রজ্ঞাই মুদ্রা বা নায়িকা। ইহা একপ্রকার বিবাহের ব্যাপার। মুদ্রাগ্রহণের পর অভিষেক ও তদনন্তর যোগ-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান আবশ্যক হয়। বাহিরের ও ভিতরের বিক্ষেপ দূর করিবার জন্য মন্ত্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহার পর বোধিচিত্তের উৎপাদন আবশ্যক হয়। যাহার জন্য প্রজ্ঞা ও উপায়ের যোগ বা পরস্পর সম্বন্ধ অপেক্ষিত। বোধিচিত্ত উৎপন্ন হওয়ার পর উহাকে নির্মাণচক্রে বা নাভিপ্রদেশে ধারণা করা আবশ্যক। এই ধারণার ফলে বিন্দু স্থিরতা লাভ করে এবং সৎ-অসদাত্মক দ্বন্দ্বের বন্ধন কাটিতে থাকে। ইহারই আনুষঙ্গিক ভাবে মন ও প্রাণের চঞ্চলতাও নিবৃত্ত হইতে থাকে। বিন্দু যতক্ষণ চঞ্চল থাকে ততক্ষণ তাহাকে সংবৃতি বোধিচিত্ত বলিয়া বৌদ্ধ যোগিগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন। বিন্দু স্থির হইলে উহার ঊর্দ্ধগতি সম্ভব হয়। যখন এই ঊর্দ্ধগতির ফলে বিন্দু উষ্ণীষ-কমলে বা সহস্রদল কমলে বা মহ বিন্দুস্থানে যাইতে পারে, তখন নিত্য আনন্দের আবির্ভাব হয়। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে মুক্তি বলে। বিন্দুর স্থিরতাই ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠানের ফল। বিন্দু স্থির হইলে যোগক্রিয়ার দ্বারা উহাকে ক্ষুব্ধ বা স্পন্দিত করা চলে। বৈদিক সাধনায় ব্রহ্মচর্য সিদ্ধির পর বিবাহোত্তর গৃহস্থ আশ্রমে—"সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ" এই শাস্ত্রীয় বাক্যের ইহাই অভিপ্রায়। ইহার পর বিন্দুর ক্রমিক ঊর্দ্ধগতি ঘটে যাহার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। যখন এই ঊর্দ্ধগতিরও নিবৃত্তি হয় তখনই মহাসুখের অভিব্যক্তি হয়।

কর্মমুদ্রা প্রারম্ভিক। কর্ম বলিতে কায়, বাক্ ও চিত্তের চিন্তাদিরূপ ক্রিয়া বুঝিতে হইবে। এই মুদ্রার অধিকারে ক্ষণভেদবশতঃ চারিপ্রকার আনন্দের

অভিব্যক্তি ঘটে। ইহাদের ক্রমবিষয়ে অদ্বয়বজ্রের মত এই যে তৃতীয়টির নাম সহজানন্দ ও চতুর্থটির নাম বিরমানন্দ। এই ক্রমের তাৎপর্য এই যে পরম ও বিরমের সন্ধিস্থলে লক্ষ্যদর্শন ঘটে। চারিটি ক্ষণের নাম বিচিত্র, বিপাক, বিলক্ষণ ও বিমর্দ। ধর্মমুদ্রা ধর্মধাতুর স্বরূপ। ইহা নিষ্প্রপঞ্চ, নির্বিকল্প, অনাদি ও করুণা স্বভাববিশিষ্ট। ইহা প্রবাহরূপে নিত্য। এইজন্যই ইহা সহজ স্বভাব। ধর্মমুদ্রার স্থিতিতে অজ্ঞান অথবা ভ্রান্তি পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়। সাধারণ যোগ সাহিত্যে বাম নাড়ী ও দক্ষিণ নাড়ী আবর্তময় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আগমিক বৌদ্ধসাহিত্যে পার্শ্ববর্তী নাড়ী দুইটিকে প্রজ্ঞা ও উপায়রূপী লালনা ও রসনা নামে বর্ণনা করা হইয়াছে। বৌদ্ধতন্ত্রের পরিভাষাতে মধ্য নাড়ীর নাম অবধূতী। ধর্মমুদ্রা ইহারই স্বরূপ। তথতার অবতরণ বিষয়ে ইহাই মুখ্য দ্বারস্বরূপ। তাই ইহাকে 'মার্গ' বলে। 'মধ্যমা প্রতিপদা' ইহারই নামান্তর। আদরপূর্বক নিরন্তর ইহার অভ্যাস করিতে পারিলে নিরোধের সাক্ষাৎকার হয়। হান-উপাদান বর্জিত যে স্বরূপ দর্শন তাহাই সত্যদর্শন। এই মধ্যমার্গে জ্ঞানগত গ্রাহ্য ও গ্রাহকরূপ বিকল্প কাটিয়া যায়। তৃতীয় মুদ্রার নাম মহামুদ্রা। ইহা নিঃস্বভাব এবং যাবতীয় আবরণ হইতে নির্মুক্ত। ইহা মধ্যাহ্ন গগনের ন্যায় নির্মল ও অত্যন্ত স্বচ্ছ। ইহাই সকল সম্পদের আধার। ইহাকে একপ্রকার নির্বাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে। ইহাতে অকল্পিত সঙ্কল্পের উদয় হয়।

ইহাই অপ্রতিষ্ঠিত মানসের স্থিতি ও পূর্ণ নিরালম্ব অবস্থা। কোন কোন যোগী ইহাকে 'অস্মৃত্য মানসীকার' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার ফল সময়মুদ্রা, যাহা মুদ্রাপ্রকরণে চতুর্থ মুদ্রারূপে পরিগণিত হয়। সময়ের স্বরূপ অচিন্ত্য। এই অবস্থায় জগৎ কল্যাণের জন্য স্বচ্ছ এবং বিশিষ্ট স্বভাবকায় ও নির্মাণকায়বিশিষ্ট বজ্রধররূপের স্ফুরণ হয়। এই বিশ্বকল্যাণকারী রূপটিকে 'হেরুক' নামে অভিহিত করেন। আচার্যগণ এই মুদ্রা গ্রহণ করিয়া চক্রাকারে পাঁচপ্রকার জ্ঞানের পরিকল্পনাপূর্বক আদর্শজ্ঞান, সমতাজ্ঞান প্রভৃতি প্রকাশ করিতেন।

(ঙ) বোধিচিত্তের উৎপত্তি ও বিকাশ।

পারমিতানয় ও মন্ত্রনয়ের সাধনার পূর্বে বোধিচিত্তের উৎপত্তি হওয়া আবশ্যক। সহানুভূতির প্রবৃত্তি, সদ্গুরুর (অথবা প্রাচীন বৌদ্ধ পরিভাষাতে

সন্মিত্র বা কল্যাণমিত্রের) প্রভাব, স্বাভাবিক করুণা অথবা দুঃখ হইতে তীব্র পরাবৃত্তি নিবন্ধন বোধিচিত্তের উৎপত্তি হইতে পারে। মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের বিভাগ সাধারণতঃ দুই অথবা তিন কালে করা যাইতে পারে। প্রথম কাল হইল সাধকের। যে পথে আরূঢ় হইয়াছে ও যে ক্রমিক সিদ্ধির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে তাহার নাম সাধক। বোধিচিত্তের উৎপত্তি আধ্যাত্মিক পরাবৃত্তির সমান সমান ইহা মনে রাখা আবশ্যক। দ্বিতীয় কাল হইল সিদ্ধের। এই কালে সাধক সম্যক্ সংবোধি ও ক্লেশনিরোধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তৃতীয় কাল হইল সিদ্ধগুরুর। এই কালে পূর্বোক্ত সিদ্ধপুরুষ সম্পূর্ণ প্রাণীজগতে সেবা বিষয়ে উদ্যম করিয়া থাকে। এই তিনটি কালকে ক্রমশঃ হেতুকাল, ফলকাল ও সত্ত্বার্থক্রিয়ার কালরূপে বর্ণনা করা হয়।

পরমজ্ঞান লাভ করিবার পূর্বে সাধককে নিজের সাধনজীবনের দুইটি বা তিনটি স্থিতি পার করিতে হয়। প্রথম স্থিতি, যখন সাধকের চিত্ত বিশ্বের দুঃখের ভাবনাতে পূর্ণ হয় এবং যখন এই দুঃখ হইতে মুক্তি দেওয়ার জন্য তাহাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় স্থিতিটি বাস্তব প্রয়োগ সম্বন্ধে। ইহাতে পারমিতা সাধনের অনুরূপ স্থান আছে। অধিমুক্ত চিত্তের অবস্থাতে কেবল সাতটি পারমিতা এবং তদনন্তর অধিমুক্ত চরিত্রের অবস্থাতে সম্পূর্ণ দশটি পারমিতার সাধনাতে অগ্রসর হইতে হয়। প্রমাণ-বার্ত্তিকের টীকাতে মনোরথ নন্দি যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় যে এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে বোধির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ সাধক অবস্থা বোধির ক্রমবিকাশের অবস্থা। ইহাতে বোধি ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়া অন্তে সিদ্ধাবস্থাতে সম্যক্ সংবোধি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(চ) ষড়ঙ্গ যোগ।

এবার বৌদ্ধ যোগিগণের সমাদৃত ষড়ঙ্গ যোগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে। হঠযোগ অথবা রাজযোগের সাহিত্যে যে অষ্টাঙ্গ অথবা ষড়ঙ্গ যোগের বিবরণ পাওয়া যায় তাহা হইতে বৌদ্ধগণের ষড়ঙ্গ যোগ পৃথক্। গুহ্য সমাজ, মঞ্জুশ্রীমূলকল্প, কালচক্রোত্তর তন্ত্র, মর্মকলিকা তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তী বৌদ্ধ সাহিত্যে নারোপাকৃত সেকোদ্দেশ টীকাতে ইহার আলোচনা দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ ইহা বৌদ্ধ যোগ নামে পরিচিত, কিন্তু

মনে হয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষে এবং সম্ভবতঃ নাথ সম্প্রদায়েও ইহার প্রচলন ছিল। ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যকার ভাস্করাচার্যের গীতাভাষ্যে (৪.২৮) ষড়ঙ্গ যোগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ষড়ঙ্গ যোগের যে ছয়টি অঙ্গ যে নামে অঙ্গীকৃত হইয়াছে ঐ ছয়টি অঙ্গই প্রায় ঐপ্রকার নামেই ভাস্করের গ্রন্থেও উপলব্ধ হয়। ছয়টি যোগাঙ্গের নাম ক্রমশঃ এইপ্রকার—প্রত্যাহার, ধ্যান, প্রাণায়াম, ধারণা, অনুস্মৃতি ও সমাধি। ভাস্করভাষ্যে 'অনুস্মৃতি' স্থানে 'তর্ক' বলা হইয়াছে।

যোগীর চরম লক্ষ্য নিরাবরণ প্রকাশের উপলব্ধি। বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার্যগণ বলেন যে ইহারই নাম সম্যক্ সংবোধি, মহাবোধি অথবা বুদ্ধত্ব। ইহাই উত্তম সিদ্ধি। সমাজোত্তর তন্ত্র মতে ষড়ঙ্গ যোগই ইহার প্রাপ্তির সাধন। ইহার চারিটি উপায় আছে। তাহার মধ্যে প্রথম উপায় সেবাবিধান, দ্বিতীয়টি উপসাধন, তৃতীয়টি সাধন ও চতুর্থটি মহাসাধন নামে পরিচিত। মহোষ্ণীষ চক্রের সাধনাকে সেবাসাধন বলা হয়। ইহা অশেষ ত্রৈধাতুক বুদ্ধবিম্বের স্বরূপ। অমৃত কুণ্ডলিনীরূপে ইহাকে ভাবনা করা উপসাধন নামে পরিচিত। দেবতাবৃন্দের ভাবনাকে সাধন বলে। তাহার পর মহাসাধনের স্থান। ইহাই চরম ও পরম। আবরণের লেশ·মাত্র থাকিতে মহাবোধির উদয় হইতে পারে না। কিন্তু পূর্ণরূপে সর্বপ্রধান আবরণ হইতে মুক্ত হইতে হইলে প্রভামণ্ডলের আবির্ভাব আবশ্যক এবং উহাতে পূর্ণতার পথিকরূপী যোগীর প্রবেশলাভও আবশ্যক। কিন্তু অতি উচ্চকোটির যোগীর পক্ষেও প্রভামণ্ডলে প্রবেশ অতি দুরূহ ব্যাপার, কারণ যতক্ষণ দীর্ঘকালের সাধনার প্রভাবে বজ্রসত্ত্ব অবস্থার বিকাশ না হয়, ততদিন ইহা কল্পনার অতীত, কিন্তু বজ্রসত্ত্ব অবস্থা পাইতে হইলে সর্বাগ্রে পাঁচটি অভিজ্ঞান লাভ করিয়া বোধিসত্ত্ব অবস্থায় আরূঢ় হওয়া আবশ্যক। কিন্তু মন্ত্রসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত ইহাও দুরাশা মাত্র। আচার্যগণ বলেন মন্ত্রসিদ্ধির উপায় প্রত্যাহার। ইহাই ষড়ঙ্গ যোগের প্রথম যোগাঙ্গ।

প্রত্যাহার তত্ত্বটি বিশেষরূপে বুঝা আবশ্যক। দশটি ইন্দ্রিয় নিজ নিজ বিষয়ের দিকে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ বৃত্তিলাভ করে। ইহার নাম আহরণ। এই সকল ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখ হইয়া যখন আপন স্বরূপমাত্রের অনুবর্তন করে তখন ইহার নাম হয় প্রত্যাহরণ বা প্রত্যাহার। প্রত্যাহরণ কালে বিষয় গ্রহণ হয় না বলিয়া ইন্দ্রিয় সকল বিষয়-ভাবাপন্ন হয় না। পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহার অভ্যাস

করিতে পারিলে শুদ্ধ আকাশের ধূম, মরীচি, খদ্যোত, দীপকলিকা, চন্দ্র, সূর্য অথবা বিন্দুর দর্শন হয়। এইগুলিকে নিমিত্ত বলে। এইপ্রকার দশটি নিমিত্ত আছে। চিত্ত অবধূতি মার্গে প্রবিষ্ট না হইলে ধূমাদি নিমিত্তের প্রতিভাস হয় না। এই সকল নিমিত্তের দর্শন স্থায়ী হইয়া গেলে মন্ত্র সাধকের অধীন হয় এবং বাক্‌সিদ্ধির উদয় হয়। যখন আকাশে ত্রৈধাতুক বিশ্বদর্শনকে প্রত্যাহারের অঙ্গ স্থির করিয়া উহাকে আয়ত্ত করা হয়, তখন যোগী সকল মন্ত্রেরই অধিষ্ঠাতা হইতে পারে। বিশ্বদর্শন সিদ্ধ হইলে বুঝিতে হইবে প্রত্যাহারের কার্য সিদ্ধ হইয়াছে। তখন দ্বিতীয় যোগাঙ্গ ধ্যানের কার্য আরম্ভ হয়। ধ্যানে পরিপক্কতা লাভ হইলে পাঁচটি অভিজ্ঞা আয়ত্ত হয়। বৌদ্ধগণ বলেন স্থির ও চর যাবতীয় ভাবই পঞ্চ কামরূপ। পঞ্চবুদ্ধের ভাবনা দ্বারা এইগুলিকে বুদ্ধরূপে ভাবনা করা আবশ্যক। বৌদ্ধতন্ত্রমতে ইহাই ধ্যানের স্বরূপ। ধ্যানের প্রভাবে বাহ্যভাব কাটিয়া যায়, চিত্ত দৃঢ় হয় ও বিশ্বের সঙ্গে চিত্তের তাদাত্ম্য হইলে অনিমেষ বা দিব্যচক্ষুর উদয় হয়। দিব্য শ্রোত্র প্রভৃতির উদয়ও ইহারই অনুরূপ। ইহার পর অর্থাৎ অভিজ্ঞান-পঞ্চকের আবির্ভাবের পর যোগের তৃতীয় অঙ্গ প্রাণায়ামের আবশ্যক। এই সময় মনুষ্যের বাম ও দক্ষিণ নাড়ীতে প্রবহনশীল দুইটি শ্বাস-প্রবাহকে নিরুদ্ধ ও একীভূত করিয়া পিণ্ডাকারে পরিণত করিতে হয়। পরে এই পিণ্ডকে মধ্যমার্গে সঞ্চারিত করিবার পর ইহাকে ঊর্দ্ধদিকে ক্রমশঃ উত্থাপন করিয়া নাসাগ্রে ধারণ করিতে হয়। ধারণা বলিতে ইহাকে কল্পনা বলিতে হইবে। ইহা মহারত্নস্বরূপ। মনুষ্যের স্বরূপ পঞ্চজ্ঞানময় ও পঞ্চভূতস্বভাব। তাই ইহা পঞ্চবর্ণ। এইজন্য নিরুদ্ধশ্বাসকে পঞ্চবর্ণ মহারত্ন বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইহাকে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, ললাট ও উষ্ণীষ-কমলের কর্ণিকাতে স্থির করা আবশ্যক হয়। নাসাগ্র ও উষ্ণীষ-কমলের বিন্দু সমসূত্র ' বজ্রযানী যোগী এই প্রাণায়ামকেই বজ্রজাপ বলিয়া অভিহিত করেন। ইহার তাৎপর্য এই যে দুইটি বিরুদ্ধ শ্বাসধারা সম্মিলিত হইয়া মধ্যনাড়ী পথে উত্থিত হইয়া নাসাগ্রস্থলে স্থিতিলাভ করে। সাধারণ মনুষ্যের প্রাণবায়ু অশুদ্ধ প্রকৃতির বাহন। তাই উহা সংসারের কারণ। যে সকল যোগী পঞ্চক্রম রহস্যবিৎ একমাত্র তাহারাই এই শ্বাসের রহস্য বুঝিতে পারে।

প্রাণায়াম সিদ্ধির ফলে বোধিসত্ত্বভাবের উদয় হয়, তখন বোধিসত্ত্বগণ তাহাকে নিরীক্ষণ করে। প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে যোগের চতুর্থ অঙ্গ ধারণা

অভ্যাসে অধিকার জন্মে। যোগদৃষ্টিতে নিজের ইষ্টমন্ত্রই প্রাণ। ইহাকে হৃদয়ে কর্ণিকার মধ্যে ধ্যান করিতে হয়, তাহার পর প্রাণকে ঊর্দ্ধে উত্থাপন করিয়া ললাটে বিন্দুর স্থানে নিরুদ্ধ করিতে হয়। প্রাণই মন্ত্র, কারণ ইহা মনকে ত্রাণ করে। এই প্রাণ বা ইষ্টমন্ত্রের শান্তভাব ধারণ-পূর্বক বিন্দুস্থানে নিরোধ ধারণা নামে পরিচিত। ধারণার ফল বজ্রসত্ত্বে সমাবেশ। এই পর্যন্ত যতটা যোগাভ্যাস সম্পন্ন হইয়াছে তাহার প্রভাবে মহারত্নস্বরূপ প্রাণবায়ু স্থিরতা লাভ করিয়াছে। এই স্থিরবায়ু নাভিচক্র হইতে চাণ্ডালী নাম্নী কুণ্ডলিনী শক্তিকে উত্থাপন করে, তখন ঐ শক্তি বজ্রমার্গ হইতে মধ্যধারা অবলম্বন করিয়া উষ্ণীষ-কমল কর্ণিকাতে উপনীত হয় ও কায়াদি স্বভাব চারিটি বিন্দুকে গুরুনির্দিষ্ট স্থানে লইয়া যায়। ধারণাতে সিদ্ধি লাভ হইলে চাণ্ডালী-শক্তি উজ্জ্বলতা লাভ করে এবং বোধি-সত্ত্ব বজ্রসত্ত্ব অবস্থাতে উপনীত হয়, তখন গ্রাহক চিত্ত বা বজ্রসত্ত্ব শূন্যতাবিম্বরূপ গ্রাহ্যে সমাবিষ্ট হইয়া যায়। বিন্দুতে ধারণার ফলে প্রাণ গতিশূন্য হয় বলিয়া একাগ্র হয়। তখন পঞ্চম যোগাঙ্গের অবির্ভাবের অবসর ঘটে। ধারণা পর্যন্ত অভ্যাসের ফল সংবৃতি সত্ত্বের ভাবনার নিশ্চলতা। এই সত্ত্বের দ্বারাই ত্রিধাতুর প্রতিভাসন হয়, যোগের পঞ্চম অঙ্গ—অনুস্মৃতি। ইহার উদ্দেশ্য সংবৃতি সত্ত্বাকার একদেশ বৃত্তি আকার সমগ্র আকাশব্যাপীরূপে দর্শন। তখন ত্রিকালস্থ সমগ্র ভুবনের দর্শন লাভ ঘটে। ইহাই বস্তুতঃ অনুস্মৃতির স্বরূপ। অনুস্মৃতির ফলে বিমল প্রভামণ্ডলের আবির্ভাব হয় ও তাহাতে যোগীর প্রবেশ ঘটে। ঐ অবস্থায় চিত্ত সম্যক্ প্রকারে বিকল্পশূন্য হয় এবং যোগীর লোমকূপ হইতে পঞ্চরশ্মির নির্গম হয়। ইহাকে মহারশ্মি বলে। তখন গ্রাহ্য ও গ্রাহক চিত্ত এক হইয়া অক্ষর সুখের আবির্ভাব হয়। তখন নিখিল আবরণের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। ইহাই যোগের ষষ্ঠ অঙ্গ বা সমাধি। বুদ্ধত্ব ইহারই নামান্তর। অকস্মাৎ এক মহাক্ষণের মহাজ্ঞানের নিষ্পত্তি হইয়া সমাধি আবির্ভূত হয়। প্রজ্ঞা ও উপায়ের সমাপত্তির দ্বারা প্রথমে সকল ভাবের সমাহার হয়। তখন পিণ্ডযোগে ভাবনাবিশেষের ফলে অকস্মাৎ মহাজ্ঞানের উদয় হয় ও নিষ্পন্নাদিক্রমে ব্যোমকমলের উদ্গম হইলে পূর্ববর্ণিত অক্ষর সুখের আবির্ভাব, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের সাম্য এবং চলাচল যাবতীয় প্রতিভাসের উপসংহার হয়। তখন পিণ্ডযোগবশতঃ পরম অনাস্রব মহাসুখাত্মক প্রভাস্বর হইতে বিম্বের মধ্যে ভাবনা করিতে হয়। লৌহাদি সকল রস ভক্ষণ করিয়া

যেমন একমাত্র সিদ্ধরস বিদ্যমান থাকে, এই পরম অনাস্রব মহাসুখময় প্রভাস্বরও তদ্রূপ সবকিছু গ্রাস করিয়া স্বয়ং অখণ্ডরূপে বিরাজ করিতে থাকে। এই প্রভাস্বরের মধ্যে সংবৃতি সত্বেরও বিশ্বভাবনা করিতে হয়। ইহা সাক্ষাৎকারাত্মক। ইহার ফলে পরম মহাজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। তখন সংবৃতি সত্ব ও পরমার্থ সত্বের দ্বিধা ভাব কাটিয়া যায় এবং অদ্বয়রূপে উহাদের প্রকাশ হয়। যুগনদ্ধ বিজ্ঞানের ইহাই রহস্য। ইহাই বুদ্ধ বা আত্মার পরমস্বরূপ। সমাধিবশিতা বশতঃ নিরাবরণ ভাবের উদয় হয়। ইহাই অচল স্থিতি।

(ছ) অভিষেক তত্ত্ব।

যোগ-সাধন প্রসঙ্গে অভিষেক সম্বন্ধে কিছু না বলিলে এই বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে মনে হয়। তাই এখানে দুই একটি কথা বলা যাইতেছে। তান্ত্রিক সাধনার গুপ্ত উপদেশ ইহাই যে যেমন দীক্ষা ভিন্ন সত্যজ্ঞানের উদয় হয় না তেমনই অভিষেক ব্যতীত ঐ জ্ঞান অন্যত্র সঞ্চার করা যায় না। এইজন্য যাহার যথার্থ পূর্ণ অভিষেক না হইয়াছে তাহার পক্ষে গুরুপদে আসীন হইবার যোগ্যতা নাই। ধর্মচক্রপ্রবর্তনই গুরুকৃত্য। সংবুদ্ধগণও অভিষেক দ্বারাই ইহা করিয়া থাকেন।

বজ্রযান মতে অভিষেক সাত প্রকার। যথা, উদকাভিষেক, মুকুটাভিষেক, পট্টাভিষেক, বজ্রকণ্ঠাভিষেক, নামাভিষেক, অনুজ্ঞাভিষেক ও প্রজ্ঞাভিষেক—ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি অভিষেক দেহশুদ্ধির জন্য আবশ্যক হয়, তৃতীয় ও চতুর্থটি বাক্‌শুদ্ধির জন্য এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠটি চিত্তশুদ্ধির জন্য আবশ্যক। সপ্তমটির উদ্দেশ্য জ্ঞানশুদ্ধি। অভিষেকের বাহ্যাঙ্গের বহু বিবরণ বজ্রযানের বিভিন্ন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে উহার চর্চা অনাবশ্যক। দেহ পঞ্চধাতুময়, উষ্ণীষ হইতে কটিসন্ধি পর্যন্ত পঞ্চম জন্মস্থানে যথাবিধি সমন্ত্রক অভিষেক দ্বারা পঞ্চধাতুর শুদ্ধি সম্পন্ন হইলে কায়াশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। ইহারই নাম উদকাভিষেক। মুকুটাভিষেক দ্বারা পঞ্চস্কন্ধের বা পঞ্চতথাগতের শুদ্ধি হয়। এইপ্রকারে ধাতুস্কন্ধ নির্মল হওয়ার ফলে দেহশুদ্ধি সম্যক্ প্রকারে সম্পন্ন হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ অভিষেক দ্বারা দশটি পারমিতার পূর্ণতা হয়। ইহার দ্বারা চন্দ্র সূর্য শুদ্ধ হয়। পঞ্চম অভিষেক দ্বারা রূপাদি বিষয় ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় শোধন হয়। ইহার প্রভাবে প্রকৃত বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ হয় বলিয়া মহামুদ্রা

সাধনে সাহায্য পাওয়া যায়। ষষ্ঠ অভিষেক দ্বারা রাগদ্বেষের শোধন হয় ও মৈত্রী প্রভৃতি ব্রহ্মবিহারের পূর্তি ঘটে। ষষ্ঠ অভিষেকের পরবর্তী অবস্থা বজ্রশব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়। সপ্তম অভিষেক ধর্মচক্রপ্রবর্তনের জন্য অথবা বুদ্ধত্বলাভের জন্য। অসংখ্য প্রাণীগণের আশয় অনুসরণ করিয়া পরম গুহ্য বজ্রযানের রহস্য উপদেশ করিবার জন্য সংবৃতি সত্ত্ব ও পরমার্থ সত্ত্বের বিভাগ করা হয়। এইপ্রকার বুদ্ধত্ব নিষ্পাদনের জন্য সপ্তম অভিষেক উপযোগী। এই সাত প্রকার অভিষেক দ্বারা শিষ্যের কায়াদি চারিটি বজ্র শুদ্ধ হইলে হাতে ধারণ করিবার জন্য বজ্রঘণ্টার উপযোগ আবশ্যক হয়।

সংবৃতি ও পরমার্থ ভেদে অভিষেক দুইপ্রকার। লোকসংবৃতি ও যোগী-সংবৃতি ভেদে সংবৃতি দুইপ্রকার। প্রথমটি অধরসংবৃতি ও দ্বিতীয়টি উত্তরসংবৃতি। এই যে উদকাদি সাতটি অভিষেকের কথা বলা হইল এইগুলি সবই লৌকিক সিদ্ধির সোপান। এইগুলি পূর্বসেক নামে তান্ত্রিক শাস্ত্রে পরিচিত, উত্তরসেক নহে। যোগীসংবৃতিরূপ অভিষেক তিনপ্রকার—প্রথমটি কুম্ভাভিষেক বা কলসাভিষেক, দ্বিতীয়টি গুহ্যাভিষেক ও তৃতীয়টি প্রজ্ঞাভিষেক। এই উত্তরসেক লোকোত্তর সিদ্ধির নিদান। এইগুলি সংবৃতি হইলেও পরমার্থের অনুকূল। পরমার্থসেকই অনুত্তরসেক নামে প্রসিদ্ধ। পূর্বসেকের জন্য মুদ্রা আবশ্যক নহে, কিন্তু উত্তরসেক মুদ্রা ভিন্ন হয় না। অনুত্তরসেক সম্বন্ধে কিছু বলিবার নাই। অনুত্তরসেক অত্যন্ত দুর্লভ।

পূর্ববর্ণিত উত্তরসেক ক্ষর, অক্ষর ও সস্পন্দ ভেদে তিনপ্রকার। অনুত্তর অথবা পারমার্থিকসেক নিস্পন্দ। কুম্ভসেকে চতুর্দশ উষ্ণীষ-কমল হইতে বিন্দু অবতীর্ণ হইয়া ললাটস্থ সহস্রদলের কর্ণিকাতে আগমন করে। ইহার প্রভাবে কায়, বাক্, চিত্ত ও জ্ঞানে আনন্দলাভ হয়। গুহ্যসেকে বিন্দু কণ্ঠস্থ দ্বাত্রিংশদল কমল হইতে হৃদয়স্থিত অষ্টদল কমলের কর্ণিকাতে আগমন করে। ইহার ফলে চারিটি কায়ে পরমানন্দ লাভ হয়। ইহা আনন্দ হইতে অধিকতর তীব্র। প্রজ্ঞাসেকে বিন্দুনাভিস্থ চতুঃষষ্টিদল কমল হইতে দ্বাত্রিংশদল গুহ্যকমলে অবতীর্ণ হয়। এমন কি বজ্রমণির রন্ধ্রে প্রবেশ করে। ইহার ফলে বিরমানন্দ লাভ হয়। ইহা পরমানন্দ হইতেও উৎকৃষ্ট তৃতীয়ানন্দ।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে উত্তরসেক ব্যতীত উষ্ণীষ-কমলে স্থিরীকৃত বিন্দু নীচে নামিয়া আসিতে পারে না। প্রথমসেকে বিন্দু কতকদূর

নামিয়া আসে। দ্বিতীয়সেকে আরও কতকটা নামে। তৃতীয়সেকে বিন্দু নামিতে নামিতে বজ্রমণির অগ্রভাগ পর্যন্ত পৌছে, কিন্তু তথাপি স্খলিত হয় না। তারপর অনুত্তরসেকে বিন্দু স্খলিত হইবার আশঙ্কাই থাকে না। যদিও প্রজ্ঞাসেকেও বিন্দুর পতন ঘটে না তথাপি ঐ সময় বিন্দু স্পন্দহীন থাকে না। কিন্তু অনুত্তরসেকে বিন্দু সর্বথা নিস্পন্দ হইয়া যায়। তখন উহার ঊর্দ্ধ্বগতি ও অধোগতি উভয়ই সমাপ্ত হইয়া যায়। তখন আবর্তন পূর্ণ হয়। ইহাই সহজানন্দের অবস্থা।

উষ্ণীষ-কমলে বিন্দুকে স্থির করা যেমন আবশ্যক তেমনি স্থির বিন্দুকে নামাইয়া আনাও আবশ্যক। আরোহ এবং অবরোহ উভয়ই আবশ্যক। ইহার পর আর কোনটিরও আবশ্যক থাকে না। ধর্মচক্রপ্রবর্তন ব্যাপারে গুরুকৃত সম্পাদন করিতে হয়, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু পিতা যেমন সন্তানের প্রাকৃত দেহের জনক তেমনি সদ্গুরুও শিষ্যের অপ্রাকৃত দেহের জনক। এইজন্য আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে গুরু পিতৃতুল্য। এই জ্ঞানদান ব্যাপারকে লোকে একপ্রকার গর্ভাধান বলিয়াই মনে করিত। শুদ্ধ বিন্দুর অবতরণ ব্যতীত শুদ্ধদেহের রচনা অথবা দ্বিতীয় জন্ম লাভ হইতে পারে না। জ্ঞানীগণ এই শুদ্ধদেহকেই জ্ঞানদেহ, বৈন্দবদেহ বলিয়া বর্ণনা করিতেন।

সদ্গুরুর কৃপার মহিমা অপার। স্বাধিষ্ঠানরূপ তৃতীয় শূন্যে বজ্রগুরুর অধিষ্ঠান হইলে চতুর্থ শূন্য আপনিই আসিয়া উহার সহিত মিলিত হয়। এ সময় যুগনদ্ধ মূর্তির দর্শন ঘটিয়া থাকে। উহার প্রভাবে বিচিত্রাদি ক্ষণের দ্বারা চতুর্থানন্দকে সম্বোধিত করিয়া স্থিতিলাভ করা আবশ্যক। ইহার পর মধ্যমার্গ নিরুদ্ধ হইয়া গেলে নানাপ্রকার প্রকৃতিদোষ ও সমাধিমলের ধ্বংস ঘটে। ইহার ফলে অনুত্তর বোধির উদয় হয় যাহাকে পূর্বে ষড়ঙ্গযোগের বর্ণনাপ্রসঙ্গে নিরাবরণ প্রকাশের অভিব্যক্তি বলা হইয়াছে। তখন জ্ঞান হইতে গ্রাহ্য ও গ্রাহক এই দুইটি বিকল্প কাটিয়া গেলে ইহাই নির্বিকল্প জ্ঞান নামে আত্মপ্রকাশ করে। ইহার দ্বারা সর্বধর্মের অনুপলম্ভ ঘটিয়া থাকে। যে বিন্দু হইতে জন্মলাভ হয় বিষয়-বিকল্পহীন সেই বিন্দুতে যাইয়া তাহাকে জানিতে হয়। ইহার পর নিজ বিন্দু শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সেই শক্তির সাহায্যে যাবতীয় বাধা দূর করিতে হয় তখন সাকার ও নিরাকারের শাশ্বত বিরোধ চিরদিনের জন্য নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইহাই তথতা।

উপসংহার

(ক) বাগ্‌যোগ।

এই পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা হইতে মনে হইতে পারে যে বৌদ্ধযোগ বাগ্‌যোগেরই একটি প্রকারভেদ মাত্র। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে জাগাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় শব্দ। বীজ, বর্ণ, মাতৃকা প্রভৃতি ইহারই রূপান্তর। কুণ্ডলিনী শক্তি প্রতি আধারে সুপ্ত রহিয়াছে। ইহাকে প্রবুদ্ধ করিতে পারিলে ঐ জাগ্রত শক্তি সাধকের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইয়া বৈচিত্র্য লাভ করে। এইজন্য সাধকের ভিন্নভাবশতঃ মন্ত্রও ভিন্ন হইয়া থাকে। যে প্রকারে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ, পুষ্প ও ফলস্বরূপে পরিণত হয়, সেই প্রকার শব্দ-বীজ মূর্ত হইয়া দেব-দেবীর আকার পরিগ্রহ করিয়া থাকে। মীমাংসা মতে দেবতা মন্ত্রাত্মিকা কিন্তু বেদান্তমতে দেবতা বিগ্রহরূপা। বস্তুতঃ এই দুই মতই সত্য। বাচক ও বাচ্য অথবা নাম ও রূপ অভিন্ন বলিয়া মন্ত্র ও দিব্য বিগ্রহ তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অভিন্ন। নিরুক্তের দৈবতকাণ্ডে দেবতার সাকারতা ও নিরাকারতা বিষয়ে কিঞ্চিৎ সঙ্কেত করা হইয়াছে।

সর্বত্রই সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে সাধকের মন্ত্রবিচার তাহার প্রকৃতিবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। রোগের নির্ণয় করিতে না পারিলে ঔষধ নির্ণয় করা যায় না। পঞ্চস্কন্ধের মূল বাস্তবিক পক্ষে পঞ্চভূত তাহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্য মূলে পাঁচপ্রকার ভেদই লক্ষিত হয়। তান্ত্রিক দৃষ্টিতে ইহার পারিভাষিক মন্ত্র কুল। হেবজ্রতন্ত্রে কুলের বিবরণ আছে। দেবতা প্রকট হইলে তাহাকে আবাহন করিতে হয়। অব্যক্ত অগ্নি হইতে যেমন প্রদীপ জ্বালান যায় না তেমনই অপ্রকট দেবতাকেও আবাহন করা যায় না। যে করণ বা সাধন দ্বারা দেবতাকে আবাহন করিতে হয় তাহাকে মুদ্রা বলে। এক একপ্রকার আকর্ষণের জন্য এক একপ্রকার মুদ্রার আবশ্যকতা আছে। দেবতা প্রকট হইয়া এবং পরে আকৃষ্ট হইয়া নিজ নিজ গুণানুসারে নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করেন। ইহার নাম মণ্ডল। মণ্ডলের কেন্দ্রে অধিষ্ঠাতৃ দেবতা থাকেন। চারিদিকে বৃত্তাকারে অসংখ্য দেবী-দেবতা বাস করেন।

বৌদ্ধ ধর্মে জ্ঞান, যোগ ও চর্যাদিতে আগমের প্রভাব কখন কতটা ও কিরূপে পতিত হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। মনে হয় বীজরূপে ইহা প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং কোন কোন বিশিষ্ট অধিকারী প্রাচীনকাল হইতেই এবিষয়ে অনুশীলন করিতেন। কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে তন্ত্র সাধনা অত্যন্ত গুপ্ত সাধনা এবং ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধারারূপে চলিয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষ ও ইহার বাহিরে মিশর, এশিয়া মাইনর, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি ভূখণ্ডে অতি প্রাচীনসময়ে ইহা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। বৈদিক সাহিত্য ও উপনিষদাদিতে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বজ্রযান সম্বন্ধে বৌদ্ধ-সমাজে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহার উল্লেখ প্রথমে করা হইয়াছে। ঐতিহাসিক বিদ্বান তারানাথ বিশ্বাস করিতেন যে প্রথম প্রকাশনের পর দীর্ঘকাল পুরুষপরম্পরা ক্রমে তন্ত্রসাধন প্রচলিত ছিল। ইহার সিদ্ধমণ্ডলী ও বজ্রাচার্যগণ ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন। চুরাশী সিদ্ধের নাম, তাঁহাদের মত ও তাঁহাদের অন্যান্য পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া যায়। নামের তালিকাতেও মতভেদ আছে। রসসিদ্ধ, মাহেশ্বরসিদ্ধ, নাথসিদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর সিদ্ধগণের পরিচয় পাওয়া যায়। সিদ্ধগণের সংখ্যা শুধু যে চুরাশী ছিল তাহা নহে, তদপেক্ষা অধিক ছিল। কোন কোন সিদ্ধের পদাবলী প্রাচীন ভাষাতে গ্রথিত দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বজ্রযান ও কালচক্রযান মানিতেন, কেহ কেহ সহজযান মানিতেন। প্রায় সকলেই অদ্বৈতবাদী ছিলেন।

(খ) আগমের প্রভাব—তন্ত্রের অবতরণ।

তিব্বতে ও চীনে প্রসিদ্ধি আছে যে আচার্য অসঙ্গ তুষিত স্বর্গ হইতে তন্ত্র অবতারণ করিয়াছিলেন। তিনি মৈত্রেয়নাথ হইতে তন্ত্রবিদ্যার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই মৈত্রের ভাবী বুদ্ধ মৈত্রেয় অথবা মৈত্রেয়নাথ নামক কোন সিদ্ধপুরুষ তাহা বলা যায় না। কেহ কেহ মৈত্রেয়কে ঐতিহাসিক পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিনি যে সিদ্ধ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে নাগার্জুনের কথাও কেহ কেহ বলেন। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে তাঁহার বাসস্থান শ্রীপর্বত অথবা ধান্যকটক তান্ত্রিক সাধনার প্রধান কেন্দ্র ছিল। আগমীয় গুরুমণ্ডলীর মধ্যেও মৈত্রেয়ের অন্তর্গত মানবৌঘের উপর দিব্য ও সিদ্ধৌঘের পরিচয় পাওয়া যায়। হইতে পারে যে মৈত্রেয়নাথ ঐপ্রকার সিদ্ধগণের মধ্যে ছিলেন অথবা উচ্চকোটির অন্য কোন মহাপুরুষ ছিলেন।

ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে বৌদ্ধসাহিত্যে গুহ্য সমাজে সর্বপ্রথম শক্তি উপাসনার মূল লক্ষিত হয়। অতএব অসঙ্গ হইতে পূর্বে শক্তিসাধনা [illegible] সুদৃঢ় হইয়াছিল। মাতৃরূপে কুমারী শক্তির উপাসনা এই স[illegible] চারিদিকে প্রচলিত ছিল।

এইসকল বহিরঙ্গ আলোচনায় কোন বি[illegible] ফল নাই। বস্তুতঃ তন্ত্রের অবতরণ একটি গম্ভীর ও রহস্যময় ব্যাপা[illegible]। শৈবাগমের অবতরণ সম্বন্ধে তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে আচার্যগণ যাহা কিছু বলি[illegible]াছেন তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে এই রহস্য সর্বত্র উদ্ঘাটিত করার যোগ্য নহে। 'তন্ত্রালোকে'র টীকাতে জয়রথ বলিয়াছেন যে পরাবাক্ পরম পরামর্শময় বোধরূপা, ইহার মধ্যে সবকিছু পূর্ণ। ইহাতে অনন্ত শাস্ত্র অথবা জ্ঞান-বিজ্ঞান পরবোধরূপে বিদ্যমান আছে। পশ্যন্তী অবস্থায় পরাবাকের বহির্মুখী অবস্থা। এই অবস্থাতে পূর্বোক্ত পরবোধাত্মক শাস্ত্র অহংপরামর্শরূপে অন্তরে উদিত হয়। ইহাতে বিমর্শের অভাববশতঃ বাচ্য-বাচক ভাব থাকে না। ইহা আন্তর পরামর্শস্বরূপ। ইহা স্বরূপতঃ অসাধারণ বলিয়া জানিতে হইবে। এইজন্য এই অবস্থাতে প্রত্যবমর্শক প্রমাতার দ্বারা পরামৃশ্যমান বাচ্যার্থ অহন্তা-আচ্ছাদিতরূপে স্ফুরিত হয়। ইহাই বস্তুনিরপেক্ষ ব্যক্তিগতবোধের উদ্ভবের প্রণালী। তাই ভর্তৃহরি বাক্য-পদীয়ে বলিয়াছেন—'ঋষীণামপি যজ্‌জ্ঞানম্ তদপ্যাগমহেতুকম্'। আর্ষজ্ঞান বা প্রাতিভজ্ঞানের মূলেও আগম বিদ্যমান থাকে। যাহাকে হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ মনে করা হয় তাহাও বস্তুতঃ স্বতঃস্ফূর্ত নহে, কারণ তাহার মূলেও আগম রহিয়াছে। মধ্যমাভূমিতে আন্তর পরামর্শ অন্তরেই বিভক্ত হইয়া যায়। তখন ইহা বেদ্য-বেদক প্রপঞ্চরূপে অবস্থান করে না। কিন্তু বাচ্য-বাচক স্বভাব লইয়া উল্লসিত হয়। এই মধ্যমাভূমিতেই পরমেশ্বর চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই নিজের পঞ্চমুখ ভাব অভিব্যক্ত করেন এবং সদাশিব ও ঈশ্বরদশা অবলম্বন করিয়া গুরুশিষ্যভাবে প্রকট হন। এই পঞ্চমুখের সম্মেলন হইতে পঞ্চস্রোতময় নিখিল শাস্ত্রের অবতরণ ঘটিয়া থাকে। অস্ফুট বলিয়া এইসকল জ্ঞানাত্মক শাস্ত্র ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু বৈখরী ভূমিতে এইগুলি ইন্দ্রিয়গোচর হয় এবং পরিস্ফুটতা লাভ করে।

নাগার্জুন, অসঙ্গ অথবা অন্য কোন আচার্যের নিকট যে কোন শাস্ত্রের অবতরণের ইহাই একমাত্র প্রণালী। ঋষিগণের মন্ত্র-সাক্ষাৎকারের প্রণালীও

এইরূপই ছিল। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে ধারক পুরুষের ব্যক্তিগত চিত্তের সংস্কার ঐ অবতীর্ণ জ্ঞানশক্তির সঙ্গে যেন সংশ্লিষ্ট না হয়। সংশ্লিষ্ট হইলে শ্রুতি স্মৃতিরূপে পরিণত হইয়া যায় এবং যাহা প্রত্যক্ষ ছিল তাহা পরোক্ষরূপ ধারণ করে। এইরূপ অবস্থায় অবতীর্ণ জ্ঞানের প্রামাণ্য কম হইয়া যায়। মানুষের দুর্ভাগ্যবশতঃ কখনও কখনও অনিচ্ছা সত্ত্বেও এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

এই বিষয়ে আরও দুই একটি কথা বলা উচিত মনে হইতেছে। সাধকগণ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের ফলে কোন কোন ভূমিতে ব্যক্তিগতভাবে দিব্য বাণী প্রাপ্ত হন, তাহাও আলোচনার বিষয়। এইসকল বাণীর মধ্যে সবগুলির গুরুত্ব সমান নহে। সবগুলির উদ্গমস্থানও এক নহে। স্পেনদেশের সুপ্রসিদ্ধ খ্রীষ্টীয় সাধিকা সেণ্ট টেরেসা নামক মহিলা নিজের জীবনব্যাপী অনুভূতির আধারে যে সকল সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন তদনুসারে অলৌকিক শ্রবণ তিনভাগে বিভক্ত হইতে পারে :

(১) প্রথমটি স্থূল শ্রবণ—স্থূল হইলেও সাধারণ শ্রবণ হইতে ইহা ভিন্ন, কারণ ইহা ধ্যানাবস্থাতে হইয়া থাকে। লৌকিক শ্রবণ হইতে ধ্যানকালীন ক্ষুব্ধ ইন্দ্রিয়জন্য বাহ্য শ্রবণ ভিন্ন, কারণ ইহা বাহ্য শব্দের শ্রবণ নহে। ইহা প্রাতিভাসিক মাত্র। মনে হয় এই শব্দ কণ্ঠোচ্চারিত ও স্পষ্ট, তথাপি ইহা অবাস্তব ও বিকল্পজন্য।

(২) দ্বিতীয়—শ্রবণ-ইন্দ্রিয় সম্বন্ধহীন কল্পনামাত্র প্রসূত শব্দের শ্রবণ। ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া হইতে কল্পনা শক্তিতে যেপ্রকার সংস্কার পতিত হয়, এইস্থলে ক্রিয়া না থাকিলেও ঠিক সেইপ্রকার হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহা ভ্রমবিকার। ধাতু-বৈষম্যজনিত দৈহিক বিকার হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। প্রথমে স্মৃতিশক্তিতে বিকার হয়, তাহার পর পূর্বসংস্কারে বিকার জন্মে।

(৩) তৃতীয় শ্রবণটি প্রামাণিক। সেণ্ট টেরেসা ইহাকে Intellectual Locution নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা প্রামাণিক। বলা বাহুল্য ইহা চিন্ময় শব্দের ব্যাপার। ইহাতে বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়ের বা কল্পনা শক্তির কোন প্রভাব পড়ে না। ইহা সত্যের সাক্ষাৎ প্রকাশ এবং সংশয়ের নিবর্তক। ইহা ভগবৎশক্তির প্রভাববশতঃ হৃদয়ে উদিত হয় এবং ইহাতে সংশয়-বিকারাদি কিছুই থাকে না।

(গ) বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাহিত্য।

এখন বৌদ্ধতন্ত্র ও যোগ বিষয়ক সাহিত্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে বহু গ্রন্থ তিব্বতে ও চীনে বিদ্যমান আছে এবং কিছু কিছু এদেশেও আছে। এখনও সকল গ্রন্থের প্রকাশ হয় নাই এবং নিকট ভবিষ্যতে যে হইবে তাহারও সম্ভাবনা দেখা যায় না, তবে কিছু কিছু বিশিষ্ট গ্রন্থের প্রকাশন হইয়াছে ও হইতেছে। ভারতীয় পুস্তক সংগ্রহের মধ্যে অপ্রকাশিত হস্তলিখিত গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। গুহ্য সমাজ এবং উহার টীকা ভাষ্য প্রভৃতির নাম বিশেষজ্ঞগণ জানেন। মঞ্জুশ্রীমূলতন্ত্র ও হেবজ্রতন্ত্রের নামও প্রসিদ্ধ। আরও কয়েকটি তন্ত্রগ্রন্থের নাম নীচে দেওয়া হইল—

(১) কালচক্র তন্ত্র ও উহার টীকা বিমলপ্রভা
(২) শ্রীসম্পুট (যোগিনী তন্ত্র)
(৩) সমাজোত্তর তন্ত্র
(৪) মূলতন্ত্র
(৫) নামসঙ্গীতি
(৬) পঞ্চক্রম
(৭) সেকোদ্দেশ—তিলোপাকৃত
(৮) সেকোদ্দেশ টীকা—নারোপাকৃত
(৯) গুহ্যসিদ্ধি—পদ্মবজ্র অথবা সরোরুহবজ্রকৃত

প্রসিদ্ধি আছে যে আচার্য হেবজ্র এই সাধনের প্রবর্তক ছিলেন। সরোরুহ-বজ্রের শিষ্য ছিলেন আনন্দবজ্র, যিনি প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া খ্যাতি প্রাপ্তি হইয়াছেন। হেবজ্র সাধন বিষয়েও ইনি গ্রন্থ লিখিয়া-ছিলেন। ইন্দ্রভূতি অনঙ্গবজ্রের শিষ্য ছিলেন। ইনি শ্রীসম্পুটের টীকা লিখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত জ্ঞানসিদ্ধি, সহজসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার নামে প্রসিদ্ধ আছে। শুনা যায় উড্ডীয়ন সিদ্ধ অবধূত ছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী ও শিষ্যা লক্ষ্মীংকরা ইঁহার সাহিত্য প্রচার করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অদ্বয়বজ্র, তত্ত্বরত্নাবলী প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ডাকার্ণব নামে একখানা বিশিষ্ট গ্রন্থ আছে। ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

(ঘ) তন্ত্রমার্গে অযোগ্যব্যক্তির প্রবেশের কুফল।

একসময়ে ভারতবর্ষের এই গুপ্তবিদ্যা চীন, তিব্বত, জাপান প্রভৃতি বহুদেশে

সমাদরের সহিত গৃহীত হইত। নানাস্থানে ক্রমশঃ ইহার প্রচার হইয়াছিল। একদিকে যেমন গম্ভীর দার্শনিক তত্ত্ব ও ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা বুদ্ধির বিকাশক্ষেত্র মার্জিত হইত এবং উত্তরোত্তর দিগ্‌গজ বিদ্বান পুরুষের আবির্ভাব-বশতঃ দর্শন শাস্ত্রের পুষ্টি হইত, অন্যদিকে তেমনই যোগমার্গের বোধিক্ষেত্রে মহান্ সিদ্ধপুরুষগণের আবির্ভাব হইত। ইঁহারা প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত শক্তিপুঞ্জ বশীভূত করিয়া লোকোত্তর সিদ্ধিসম্পত্তির দ্বারা নিজেকে অলঙ্কৃত করিতেন। যদি কোনদিন ইঁহাদের প্রামাণিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় তাহা হইলে অবশ্যই বর্তমান যুগের বিদ্বানমণ্ডলী সিদ্ধগণের গৌরবপূর্ণ জীবনের আভাস প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

তান্ত্রিক যোগমার্গে অযোগ্য লোকের প্রবেশ অবারিত হওয়ার ফলে স্বভাবতঃই নাগার্জুন ও অসঙ্গের মহান আদর্শ সকলে সমভাবে রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাই অন্যান্য ধার্মিক প্রস্থানের ন্যায় বৌদ্ধ প্রস্থানেও নীতিলঙ্ঘন ও আচারগত শিথিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের অবসাদের কারণবর্গের মধ্যে ইহা একটি মুখ্য কারণ সন্দেহ নাই। কারণ, নীতিধর্মের উপরেই জগতের সামাজিক প্রতিষ্ঠার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়া মূলাদর্শের মহত্ত্ব বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

হিন্দু

মাতৃকা-রহস্য

১

মাতৃকাবিজ্ঞান তান্ত্রিক মহাবিজ্ঞানের অন্তর্গত। তন্ত্রশাস্ত্রের রহস্যমার্গে প্রবিষ্ট হইয়া অগ্রসর হইতে হইলে মাতৃকাবিজ্ঞান প্রতিপদেই আবশ্যক হয়। মাতৃকা বলিতে বর্ণমালা বুঝাইয়া থাকে। আমরা ভারতবর্ষে পঞ্চাশ অথবা চতুঃষষ্টি বর্ণের সমষ্টিরূপে যে বর্ণমালার পরিচয় প্রাপ্ত হই, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই এখানে কিছু কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। কিন্তু মাতৃকাবিজ্ঞান পৃথিবীর যে কোনো ভাষার বর্ণমালার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। ভারতবর্ষে প্রাচীন-কালে ইহার গূঢ় আলোচনা হইয়াছিল। যাহাকে পরিশীলন বা কাল্‌চার বলে, ভারতবর্ষে যতটা হইয়াছিল, অন্যান্য দেশে ততটা হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। তবে ফিনিশিয়ান্, ম্যাগিদের মাতৃকাজ্ঞান খুব বিশুদ্ধ ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মাতৃকা বর্ণকে বলা হয়। মাতৃকার পরিশীলন করিতে করিতে বর্ণ হইতে পদ, পদ হইতে বাক্য—এইপ্রকার বিজ্ঞান প্রাচীনকালে প্রকাশিত হইয়াছিল। স্ফোটবিজ্ঞান, নাদবিজ্ঞান প্রভৃতিও মাতৃকাজ্ঞানেরই অন্তর্গত। সৃষ্টি-রহস্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে মাতৃকা-রহস্য উপেক্ষা করা চলে না, কারণ পৃথিবীর প্রাচীন সংস্কৃতির সকলেই বিশেষরূপে অবগত আছেন যে এই বর্ণাত্মক শব্দ হইতেই অথবা ইহার মূল প্রতীক যাহা, তাহা হইতেই বিশ্বসৃষ্টির আবির্ভাব হইয়াছে। শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান—তিনটি পরস্পর সংশ্লিষ্ট, কিন্তু যে দৃষ্টি লইয়া এখন আলোচনা করিতেছি তদনুসারে শব্দের মহিমাই অধিক।

আমাদের ব্যবহারভূমিতে আমরা শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের সাংকর্য বা সংকীর্ণ রূপ প্রাপ্ত হই, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু আমরা এস্থলে বর্ণমালার যে রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার সহিত এই লৌকিক জ্ঞানের বিশেষ কোনো সম্বন্ধ নাই। জ্ঞানের সবিকল্পক-নির্বিকল্পক ভেদের মূলেও মাতৃকা-রহস্য স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা ক্রমশঃ বুঝিতে পারা যাইবে। বাক্ হইতে

অর্থের আবির্ভাব, প্রায় সকল সভ্য দেশেই জানা ছিল কিন্তু বর্তমান সময়ে অভিনব সভ্যতার উদ্‌গম ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন রহস্য আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, তাই অনেকেই এখন উহা ভুলিয়া গিয়াছে। গ্রীক্ দর্শনে ইহার অনেক নিদর্শন আছে, কিন্তু এখানে উহা আলোচনার বিষয় নহে।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশেও অনেকে শব্দের এই মহিমা জানিতেন। ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে' নির্দেশ আছে যে লৌকিক পুরুষ ও আদ্য ঋষি—এই উভয়ের উচ্চারিত শব্দ একপ্রকার নহে, কারণ এক স্থলে সত্যের নির্ণয়ের জন্য অর্থ ও শব্দের পরস্পর সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়। কোনো স্থানবিশেষে কোনো বস্তু থাকিলে তদনুরূপ বাক্য প্রয়োগ যদি হয়, তাহা হইলে উহা সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। যেমন একটি পাত্রে দুগ্ধ সংরক্ষিত আছে, সেখানে 'এই পাত্রে দুগ্ধ আছে' এইপ্রকার বাক্য সত্য, কারণ ইহা পদার্থের অনুরূপ। কিন্তু আদি ঋষিগণ, যাঁহাদের বাক্‌শক্তি সৃষ্টি করিতে সমর্থ, ঠিক এই স্তরের নহেন। ঐ পাত্রে দুগ্ধের পরিবর্তে তিনি যদি অন্য কোনো পদার্থ বলিয়া বসেন, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে ঐ পাত্রে দুগ্ধ নাই, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আছে। 'ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি' কথার ইহাই তাৎপর্য। এই সকল ঋষি শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করিতে পারিতেন, এই জন্য তাঁহারা যে-শব্দের উচ্চারণ করিতেন তাহা অমোঘ, তাহার অনুরূপ অর্থ সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হইত। Bible-এ Book of Genesis-এ আছে: Let there be light and there was light—এখানেও বাক্যের অনুরূপ অর্থের আবির্ভাব নির্দেশ করা হইয়াছে। New Testament-এ Book of St. John-এও ইহাই আছে—The Word was with God and the Word was God. আমাদের দেশের বৈদিকগণ ব্যাহৃতি-তত্ত্বেও এই রহস্যই দেখিতে পান।

আমার নিজের বিশ্বাস, অতি প্রাচীনকাল হইতেই ব্রহ্মস্বরূপকে একদিকে যেমন পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে বিলক্ষণ ধারণা করিয়া ব্রহ্মশব্দ নপুংসক লিঙ্গে ব্যবহার করা হইত, ইহা তো প্রসিদ্ধই আছে, তেমনি তদ্ব্যতীত উপনিষদ্ ও বৈদিক সংহিতায় কোনো কোনো স্থানে পুরুষরূপে তো আছেই, প্রকৃতিরূপেও পাওয়া যায়। যেমন 'সা দেবতা' ইত্যাদি। সুতরাং মাতৃরূপে বা পরা-শক্তিরূপে বিশ্বের মূল মহাশক্তিকে কল্পনা করা পরবর্তী যুগে কিছু নূতন আবিষ্কার

নহে। ভাস্কর রায় এবং অন্যান্য কোনো কোনো প্রাচীন আচার্য এ বিষয়ে অন্বেষণও করিয়াছেন। এখানে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক। বহুকাল, যুগযুগান্তর পর্যন্ত রহস্য-সাধনা লোপ পাইয়া গিয়াছিল, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেইজন্য পরবর্তী কালে যখন ঐ সকল গুপ্তবিদ্যার পুনরুদ্ধার হয়—শুধু আমাদের দেশে নয়, অন্যান্য দেশেও তদ্রূপ—অনেক বিষয় সাধারণ বুদ্ধির অগম্য-রূপে প্রকট হয় এবং এইগুলি গুপ্তবিদ্যারূপেই প্রাচীনকালে প্রকট ছিল। এশিয়া মাইনর, প্রাচীন গ্রীস, ঈজিপ্ট, ম্যাগিদের দেশ, সুমেরিয়ানদের প্রান্তভূমি—সর্বত্রই গুপ্তবিদ্যার প্রচার ছিল। তাহার পর ক্রমশঃ দীর্ঘকাল পরে এইসকল বিদ্যার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হয়। তখন যাহা একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল তাহা বাদে কিছু কিছু সংরক্ষণের চেষ্টা হইয়াছিল এবং এই সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় ভিন্ন ভিন্ন আচার্যগণের মধ্যে কোনো কোনো অংশে মতভেদও দেখা যাইত। বেদ বলিতে বা তন্ত্র বা আগম বলিতে আমরা এখন যাহা বুঝি তাহা যে অতি প্রাচীনকালের সিদ্ধান্ত তাহা যেন কেহ মনে না করেন। আমরা যে বেদের সহিত পরিচিত তাহাও অতি প্রাচীনকাল হইতেই লুপ্তপ্রায় অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে সামবেদের সহস্রশাখার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। একমাত্র সামবেদেরই কৌথুমী-শাখার কিয়দংশ বিদ্বজ্জনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, রাণায়নীয় শাখাও লুপ্তপ্রায়, অন্যান্য শাখা কোথায় গেল? যাহা হউক্ এইসকল গ্রন্থও ঐ গুহ্য পরমবিদ্যার স্থানাপন্ন হইতে পারে না। প্রতি বেদেই শাখাভেদে এইপ্রকার অসংখ্য বিভাগ ছিল, যাঁহারা বেদের ইতিহাস অবগত আছেন, তাঁহারা এ কথা জানেন। তন্ত্রের ব্যাপার আরও রহস্যময়, এখানে সেকথা উঠাইবার প্রয়োজন নাই।

মোট কথা, আগম নিগম যতই পৃথক্‌ভাবে সামাজিক দৃষ্টিতে উপলব্ধ হউক না কেন, মূলে ইহা শব্দপ্রমাণ। প্রাচীনকালে ঋষিগণ এই শব্দকে অপরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেন এবং প্রত্যক্ষ করার পর লৌকিক ব্যবহারের জন্য উহার অনুকল্পের ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহা সাধারণতঃ 'বিন্ম' নামে পরিচিত। সুতরাং আমাদের প্রচলিত ও পরিচিত বেদাদিশাস্ত্র বিন্মেরই অন্তর্গত। 'বাক্যপদীয়ে'র টীকাতে একস্থলে এই বিন্মের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া আর একটি বিষয় এইস্থানে চিন্তনীয় মনে হয়। যে সকল ঋষি এইসকল শব্দরূপ জ্ঞান অপরোক্ষভাবে প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহাদের

মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ ছিল, কারণ এই জ্ঞানরাশি সাক্ষাৎকারাত্মক—ইহা দৃষ্টিগোচরও হইত এবং শ্রুতিগোচরও হইত। তদনুসারে ঐসকল ঋষিকে দৃষ্টর্ষি এবং শ্রুতর্ষি নামে অভিহিত করা হইত। এই যে জ্ঞানের আবির্ভাব ও সঞ্চার, ইহা একটি রহস্যময় বিষয়। মাতৃকা-রহস্য আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমরা সাধারণতঃ পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী ভেদে চারিপ্রকার বাক্ সম্বন্ধে ধারণা রাখি। বৈদিক যুগেও বাকের চতুর্ধা বিভাগের কথা পাওয়া যায় কিন্তু উহার রহস্যের ভিতরে প্রবিষ্ট না হইয়া আগমের ধারার মধ্য দিয়া ইহার যে রহস্য জগতে প্রকট হইয়াছে, তাহারই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। ইহাতে পরা, পশ্যন্তী আদি সম্বন্ধে সকল কথা বলা হইল, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। পরাবাক্ শব্দব্রহ্মস্বরূপ, সাক্ষাৎ মহাশক্তির পরম রূপ। পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যশক্তিই পূর্ণাহন্তারূপে পরাবাক্ আখ্যায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমরা যে দৃষ্টি লইয়া আলোচনা করিতেছি, তাহা পরাবাক্ সম্বন্ধে নহে কিন্তু ত্রয়ী বাক্ সম্বন্ধে অর্থাৎ পশ্যন্ত্যাদি বাক্। পশ্যন্তীতে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় নিত্য অভিব্যক্তরূপে স্বয়ং প্রকাশভাবে বিদ্যমান থাকে। একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে গুরু এবং শিষ্য, এই উভয়ের দিক্ হইতে এই ত্রয়ী বাকের চর্চা এইস্থলে করা হইতেছে অর্থাৎ জগতে জ্ঞানের আবির্ভাব কোথা হইতে হয় এবং উহার সঞ্চার কি ভাবে হয় এবং কোথায় আসিয়া উহার পর্যবসান হয়—এই তিনটি ভূমিকে লক্ষ্য করিয়া অবরোহক্রমে ও আরোহক্রমে এই তত্ত্বটি আলোচনা করা আবশ্যক।

২

বৈদিক জ্ঞান বা বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা অথবা আগমের ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান একটি একটি করিয়া বুঝিবার আবশ্যকতা নাই। যেমন, চতুঃষষ্টি আগম বলিলেই যে সব বলা হইল, ইহা কেহ যেন মনে না করেন, কারণ অসংখ্যপ্রকার চতুঃষষ্টি ভেদ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভৈরবাগমের অন্তর্গত চতুঃষষ্টি আগমের কথা বলা যাইতে পারে। শঙ্করের 'সৌন্দর্যলহরী'তে উল্লিখিত চতুঃষষ্টি তন্ত্র চতুঃষষ্টি আগমরূপে পরিচিত। আবার তোড়লতন্ত্রে অভিনব চতুঃষষ্টি তন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া আরও উল্লেখ আছে। এইপ্রকার অষ্টাদশ,

আবার দশ আগম ইত্যাদিরও নানাপ্রকার ভেদ আছে। ইহা কোনো বড় বিষয় নহে, আগমতত্ত্বই আলোচনার বিষয়। পূর্বে যেমন ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রের বা আগমের সৃষ্টি হইয়াছে, এখনও তাহা প্রতিদিন হইতেছে, কিন্তু কে তাহার খবর রাখে?

প্রথম একটি বিষয় অনুধাবনের যোগ্য মনে হয়। সেটি হইল জ্ঞান ও তাহার বিষয়। বিষয় ভেদে জ্ঞানের অনন্তপ্রকার ভেদ সম্ভবপর। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাহার সামান্যই লোকে দেখিতে পায়। এই যে পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে বিবেকজ জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, ইহাকে ঔপদেশিক জ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহা সর্ববিষয়ক, সর্বার্থবিষয়ক দিব্যজ্ঞান। প্রাতিভ জ্ঞান ইহারই কণা মাত্র। যদিও পাতঞ্জল দৃষ্টি অনুসারে এই জ্ঞান গুরু হইতে সমাগত নহে বলিয়া অনৌপদেশিকরূপে বর্ণিত হয়, তথাপি এমন কোনো জ্ঞান হইতেই পারে না যাহা গুরুমুখ হইতে আগত নয়। এ বিষয়ে বাক্যপদীয়কার বহু কথা বলিয়াছেন। এই যে গুরুমুখী জ্ঞান, এ গুরু কোনো লৌকিক পুরুষ নহেন, সিদ্ধৌঘ নহে, মানবৌঘ তো নহেই, বস্তুতঃ দিব্যৌঘও নহে—যদিও বলিতে গেলে দিব্যৌঘ বলিয়াই বর্ণিত হইবার যোগ্য। ইহা সাক্ষাৎ বিশ্বগুরু হইতে প্রাপ্ত। সুতরাং ইন্‌টুইশান্ বা অনৌপদেশিক ঠিক সত্যের পরিচায়ক নহে। পূর্বেই বলিয়াছি এই যে গুরু-শিষ্য ক্রমে জ্ঞানের প্রবাহ ইহারই নাম সম্প্রদায়—ট্র্যাডিশানাল্ লাইন্। ইহা কোটি কোটি কল্পান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহা কোনো ঐতিহাসিক মানদণ্ডের ধারণার যোগ্য নহে। ইহার মূল তত্ত্বটি কি তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি।

কল্পের আদিতে বা মহাকল্পের আদিতেও বলা চলে, জগৎসৃষ্টির সমসময়ে এইসকল মহাজ্ঞানের আবির্ভাব সূচিত হয়। এইজন্যই ঈশ্বরকে পরমগুরু বলা হয়—'স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেন অনবচ্ছেদাৎ'। তন্ত্রও তাহাই বলেন। ইহা কল্পের আদির কথা। কল্পের আদিতে তৎ তৎ বিষয়ানুরূপ ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান, যাহা স্বরূপতঃ পশ্যন্তী ভূমিতে অভিন্ন থাকে, পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়ে এবং তাহার পর ঐ এক একটি জ্ঞান কল্পনার মাধ্যমে মনোরাজ্যে প্রকাশিত হয়। পশ্যন্তীভূমি মনোরাজ্যের অতীত এবং প্রকাশের ভূমি মনোরাজ্যের প্রারম্ভে অর্থাৎ পশ্যন্তী ও মধ্যমার সন্ধিতে। এইসব ভূমিতে তৎ তৎ গুরুর মুখে কল্পনার মাধ্যমে তৎ তৎ শিষ্যের উদ্দেশ্যে ঐ সকল জ্ঞান প্রবর্তিত হয়। এইপ্রকারে

ধারা রহিতে থাকে। একদিকে জ্ঞান ও তাহার বিষয়, অপরদিকে ঐ জ্ঞানের প্রকাশক গুরু ও তাহার শিষ্য।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ আলোচনার পূর্বে একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক যে প্রাচীনকালে বিভিন্ন প্রস্থান অবলম্বন করিয়া শাক্তমত প্রচারিত হইয়াছিল। এই সকল প্রস্থানের মধ্যে কুলমত বা কৌলিকমত অন্যতম প্রধান। কৌলিক-মতের মূল সিদ্ধান্তের আদিরূপ কি তাহা জানিবার উপায় নাই। অতি প্রাচীনসময়ে ঋষি দুর্বাসার সহিত এই মতের সম্বন্ধ ছিল শুনিতে পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত—দুর্বাসার না হইলেও তাঁহার অনুমোদিত—পরম্পরাগত কৌলসূত্রে বিদ্যমান আছে। ইহা ভারতবর্ষের কোনো বিশিষ্ট স্থানে হস্তলিখিত গ্রন্থরূপে বহু লোকের অজ্ঞাতভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল এই গ্রন্থের সন্ধান আমি পাইয়াছিলাম কিন্তু তাহার পর ইহা প্রকাশিত হইতে আমি দেখি নাই। এই গ্রন্থেও এমন অনেক গুহ্য তত্ত্বের আলোচনা আছে, যাহা সাধারণতঃ লোকের পরিচিত নহে। শ্রীকৃষ্ণকে দুর্বাসা আগমশিক্ষা দিয়াছিলেন—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ইহা কতটা পৌরাণিক ঠিক ঠিক জানিতে না পারিলেও ইহার মূলেও ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে মনে হয়। পরবর্তী যুগে কামরূপ মঠ হইতে মীননাথ এই মতের প্রচার করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধিও আছে। আপাততঃ মীননাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ একই ব্যক্তি মনে করা যাইতে পারে। মৎস্যেন্দ্রনাথ নাথ-সম্প্রদায়ের আদি গুরু। মৎস্যেন্দ্র-প্রবর্তিত মত ও গোরক্ষ-প্রবর্তিত মতের মধ্যে অবান্তর ভেদ-অভেদ যাহাই থাকুক্, মৎস্যেন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি-উপাসনার দিকে ছিল, গোরক্ষের শিবের দিকে ছিল। এতদ্ব্যতীত শক্তি-প্রস্থানের আরও অনেক ধারা ছিল। মহার্থ সম্প্রদায় (মহানয় সম্প্রদায় ?) আপন উপাসনা পদ্ধতিতে শক্তি-রহস্য সম্বন্ধে অনেক অভিনব তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। বিরূপাক্ষ তাঁহার প্রসিদ্ধ পঞ্চাশিকা গ্রন্থে অদ্বৈত শৈব মতের কথাই বলিয়াছেন কিন্তু সেখানেও শিব-শক্তি অভিন্ন। এইসকল শাক্ত মতের দৃষ্টি সম্বন্ধে এখানে আলোচনা সম্ভবপর নহে। জৈনগণও তাঁহাদের তান্ত্রিক প্রস্থানে শাক্ত মতের প্রতি আনুগত্যের পরিচয় দিয়াছেন। এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক আলোচনা উত্তরযুগে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে পাওয়া যায়। ইহাদের কালচক্রযান, সহজযান প্রভৃতি শাক্ত দৃষ্টিরই অনুকূল গ্রন্থ। তিব্বতে বহুকাল হইতে এই শাক্ত অদ্বৈত তন্ত্রমত প্রচলিত ছিল এবং

ঐতিহাসিকগণ অবগত আছেন এই জাতীয় প্রাচীন শক্তি আগমসিদ্ধ মার্গের সহিত বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের কতকটা সম্বন্ধ ছিল। সাধনার ধারার আলোচনার জন্য ঐতিহাসিক বিষয়ের উত্থাপন সব সময়ে আবশ্যক নহে এবং উপকারকও নহে। কিছুদিন পূর্বে 'পুরাণ সংহিতা' নামে পুরাণার্থ বিষয়ে একখানি প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহাতে অতি প্রাচীন পৌরাণিক ধারার অনুমোদিত বহু পৌরাণিক মূল সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ে তাত্ত্বিক ও সাধনগত দৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ পারমার্থিক লীলা, ব্যবহারিক লীলা ও প্রাতিভাসিক লীলার সূক্ষ্ম বিবরণ ঐ গ্রন্থে আছে। ঐ গ্রন্থে কিছু কিছু প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাচীন গ্রন্থও উদ্ধৃত হইয়াছে। এইসব গ্রন্থ এক সঙ্গে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় প্রাচীনসময়ে কিভাবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধনার মধ্যেও তত্ত্বের ঊর্দ্ধে এবং লীলারহস্যের মধ্যে তান্ত্রিক মূল রহস্য প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের প্রয়োজন এই যে বৈষ্ণব সাধন-সাহিত্যের প্রগতিতেও তান্ত্রিক দৃষ্টি বিশেষ গভীরভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। অতি প্রাচীন বেদান্তাচার্য শ্রীমৎ শঙ্কর ভগবৎপাদের পরমগুরু গৌড়পাদও 'শ্রীবিদ্যারত্নসূত্র' নামে অতি উৎকৃষ্ট এক তান্ত্রিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণযামল মহাতন্ত্র নামক গ্রন্থে সাধনা এবং যোগের দিক্ দিয়া এই তান্ত্রিক দৃষ্টির সহিত বৈষ্ণব দৃষ্টি কিভাবে মিলিয়া গিয়াছিল তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। শুক ও সারীর কথা বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাঁহাদের সাহিত্যে বহুস্থানে নিবদ্ধ করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে। এই শুক-সারীকে শুধু দুটি পাখী মনে করিয়াই রূপকভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচীনকালে শুকবিদ্যা ও সারিকাবিদ্যা নামে দুইটি সাধনার ধারা প্রচলিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত কদম্ববৃক্ষ বা কদম্বমূলের কি সম্বন্ধ তাহা অনেকেই বোঝেন না। যাঁহারা শ্রীবিদ্যার অনুশীলন করেন তাঁহারাও জানেন শাক্তমতে কদম্বের স্থান কোথায়। তন্ত্রে আছে—'কদাচিদাদ্যা ললিতা পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা' ইত্যাদি। ললিতা শ্রীবিদ্যারই নামান্তর। পক্ষান্তরে এই ললিতা শ্রীভগবানের লীলাসহচরী। শুধু সহচরী নহেন, তিনি সকল সখিবর্গের নায়িকা। যাঁহারা যোগসাধনার রহস্য জানেন তাঁহারা ইহার মর্ম বুঝিতে পারিবেন। পূর্বোক্ত 'পুরাণসংহিতা' গ্রন্থে সুমঙ্গলা শক্তিরূপে এই মহাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপর কোনো কোনো অংশে তন্ত্রের প্রভাব কিভাবে পড়িয়াছিল। প্রাচীন গৌড়ীয় শাস্ত্র এবং তৎসময়বর্তী বল্লভীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রহস্যশাস্ত্র আলোচনা করিলে এ বিষয়ে অনেক গূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে মনে হয়।

যোগিগণ জানেন যে নিত্যলীলা কিভাবে সম্ভবপর এবং কোথায়। পরম-পুরুষ এবং পরমা প্রকৃতির মিলন ব্যতীত নিত্য তো দূরের কথা, লীলারও সম্ভাবনা হয় না। সাধারণতঃ যোগিগণ ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি সমাধির জন্য ষট্‌চক্রভেদের অনুষ্ঠান করেন। ভূতশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি সম্পন্ন হইলে ভৌতিক জগৎ ও মনোময় জগতের সংস্কার হইতে মুক্ত হওয়া যায় কিন্তু শুধু আজ্ঞাচক্রের বিন্দু পর্যন্ত গতি হইলেই সহস্রারস্থ পরমাত্মার সহিত মিলন সম্ভবপর হয় না। এই উভয়ের মধ্যে অনন্ত চিদাকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা ভেদ কি প্রকারে হইবে? তাহার জন্য খেচরী শক্তি আবশ্যক অর্থাৎ আকাশভেদিনী গতি। শুধু পঞ্চভূত শুদ্ধ হইলে হইবে না, কেবলমাত্র চিত্তশুদ্ধি দ্বারাও হইবে না, কারণ এই উভয় শুদ্ধ হইলে প্রপঞ্চ হইতে মুক্তিলাভ হইতে পারে, ইহা সত্য কিন্তু প্রপঞ্চাতীত পরমধামে যাইবার শক্তি কোথায়? পৌরাণিক পরিভাষাতে সহস্রদলকমলই বলি বা বৈষ্ণব পরিভাষাতে গোলকধামই বলি, যে নামেই অভিহিত করি না কেন, পরমধামে প্রবেশ করিতে হইলে চিদাকাশ ভেদ করিতে হইবেই। শুধু সমাধি দ্বারা তাহা সম্ভবপর নহে। প্রাচীন যোগিগণ জানিতেন যে নাভিস্থিত শক্তি আয়ত্ত করিতে না পারিলে এই আকাশগমন সম্ভবপর নহে। শুধু ভৌতিক আকাশে নহে, চিত্তাকাশেও নহে, চিদাকাশে স্বেচ্ছানুসারে গতিলাভ খেচরী শক্তি ব্যতীত সম্ভব নহে। নাভিচক্র ভেদ হইলে সেখান হইতে এক নাল প্রকাশ হয়, ঠিক প্রসিদ্ধ ব্রহ্মনালের অনুরূপ। ইহাকে কেহ যেন ষট্‌চক্রের অন্তর্গত মনে না করেন, কারণ ষট্‌চক্র ভৌতিক জগতের অন্তর্গত। নাভি হইতে যে ব্রহ্মনালের প্রকাশ হয় তাহারই ঊর্ধ্বে সুমঙ্গলা শক্তির অভিব্যক্তি ঘটে। এই সুমঙ্গলা শক্তিই আমাদের পূর্বোক্ত ললিতা। লীলার নায়িকা, সখিবর্গের অগ্রভূতা।

এই শক্তির সাহায্য ব্যতীত সহস্রারে প্রবেশ অসম্ভব। কোনো মতে প্রবেশ করিতে পারিলেও সেখানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরমশিবের সান্নিধ্যের প্রভাবে অভিভূত হওয়া স্বাভাবিক।

৩

আমরা এই শক্তিতত্ত্বকে এখানে বাকের বা শব্দের দিক্ দিয়া অনুধাবনের চেষ্টা করিতেছি। জপ-সাধনায় এই শব্দের মহিমা প্রত্যক্ষ অনুভূত হইয়া থাকে। জপের উদ্দেশ্য পরে আলোচনা করিব। তখন দেখা যাইবে যে বাকের চতুর্বিধ স্তরের মধ্যে পরাবাক্‌কে পৃষ্ঠভূমিতে রাখিয়া পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই তিনটি ক্রমশঃ বহির্মুখভাবে প্রকাশমান হয়। ইহা অবরোহক্রম। পুনর্বার জপসাধনকালে বৈখরী হইতে মধ্যমা ও পশ্যন্তীতে প্রবেশ হয়। ইহা অতি সাধারণ কথা এবং ইহাই আরোহক্রম। অবরোহ ও আরোহক্রমে এই তত্ত্বটি আলোচনা করা আবশ্যক, ইহা পূর্বে বলিয়াছি।

পরাবাক্ বিশ্বসৃষ্টির অতীত ভূমি। উহা অক্ষর ব্রহ্মের ক্ষরণস্বরূপ। শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের যে পরস্পর নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহা আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে অর্থের সঙ্গে একদিকে শব্দ অপরদিকে জ্ঞান সম্বন্ধ। অর্থ ও শব্দের মধ্যে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ। অর্থ ও জ্ঞান, ইহাদের মধ্যে বিষয়-বিষয়ী সম্বন্ধ। সুতরাং যতই অপরিস্ফুট হউক্ না কেন, শব্দ ও জ্ঞানের মধ্যেও পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহা ব্যবহার ভূমিতেও যোগিগণ অনুভব করিতে পারেন। ভূমিতে অর্থাৎ যে-ভূমিতে সাধারণ মানুষ বিদ্যমান রহিয়াছে, শব্দ ও অর্থ পরস্পর ভিন্ন। কোন্ শব্দ কি বুঝায়, তাহা শাস্ত্র বা ব্যবহার হইতে জানিয়া লইতে হয়। তদ্রূপ মধ্যমা ভূমিতে শব্দ ও অর্থ উভয়ের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ। পূর্বে ছিল ভেদ সম্বন্ধ, এখন হইল ভেদাভেদ সম্বন্ধ। পশ্যন্তী ভূমিতে শব্দ ও অর্থের অভেদ সম্বন্ধ। তাই এই স্তরে Creative Sound এই শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, অর্থাৎ সিদ্ধযোগীর মুখ হইতে উচ্চারিত শব্দ হইতেই অর্থের আবির্ভাব হইয়া থাকে। কারণ, অর্থ ও শব্দের সেখানে ভেদ নাই। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা পরে করা যাইবে।

মাতৃকা শব্দের অর্থ 'মা'। মাতৃকা বা মহামাতৃকা বিশ্বজননী। একই পরম সত্তা বহুরূপে প্রকাশমান হ'ন, শুধু ইহারই সম্বন্ধবশতঃ। 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' বেদে এই কথা আছে। একই পরমাত্মা 'মায়াভিঃ', মায়ার অসংখ্য বৃত্তি দ্বারা অসংখ্যরূপে প্রতিভাসমান হ'ন। মায়া ও মাতৃকা একই বস্তু। মায়া বিশ্বজননী, এ কথার যাহা তাৎপর্য, মাতৃকা হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহারও তাৎপর্য তাহাই। কিন্তু এই বিষয়টি বিশেষ-

ভাবে অনুধাবন না করিতে পারিলে স্পষ্ট ধারণার উদয় হওয়ার সম্ভাবনা নাই। মাতৃকা মূলে এক ও অভিন্ন। বস্তুতঃ ইহা অক্ষরব্রহ্মের ক্ষরণাত্মক স্বরূপভূতা শক্তি। প্রাচীন আগমে পরাবাক্‌রূপে ইহারই প্রশংসা কীর্তিত হইয়াছে। আমরা এখানে প্রাচীন সিদ্ধ তান্ত্রিকগণের দৃষ্টি অনুসারে মাতৃকা সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পরাবাক্ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন যোগীর ভিন্ন ভিন্ন ধারণা আছে, ইহা সত্য। বৈদিক সাহিত্যে শব্দব্রহ্মরূপে যাহার নির্দেশ পাওয়া যায়, ইহা তাহাই। এই শব্দব্রহ্মই অথবা পরামাতৃকাই বিশ্বের জননী।

এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনটি স্তর সম্বন্ধে ধারণা থাকা আবশ্যক। একটি স্তর যেখানে কোনোপ্রকার তরঙ্গ, স্পন্দন বা বিমর্শন নাই। ইহা দিব্য সমরস ভূমি। এখানে সৃষ্টি নাই, সংরক্ষণ নাই, সংহার নাই। সুতরাং তিরোধান শক্তি বা অনুগ্রহ শক্তির প্রশ্নও উঠে না। এখানে পূর্ণ সত্য আপন মহিমাতে পূর্ণ বিরাজমান। এখানে শিব-শক্তির প্রশ্ন নাই, জীব-জগতের প্রশ্নও নাই। ইহা এক অদ্বয় পরম স্থিতি। অবশ্য বুঝিবার জন্য এইরূপ ভাগ করিয়া বলা হইতেছে। বস্তুস্থিতিতে এইরূপ ভাগ করা সম্ভব নহে।

আর একটি স্থিতি আছে, তাহাকে দ্বিতীয় অবস্থা বলিতে পারি—সেখানে পরব্রহ্মও আছেন, শব্দব্রহ্মও আছেন তাঁহার সঙ্গে অভিন্নভাবে। এই শব্দব্রহ্মই সেখানে পরাবাক্‌রূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন। এই অবস্থা যুগল-ভাবাপন্ন। তান্ত্রিক পরিভাষায় ইহা শিব-শক্তির সমরসাত্মক অবস্থা। এই সামরস্য নিত্যসিদ্ধ। বৌদ্ধগণের দৃষ্টিতেও এইরূপ অবস্থার প্রতিভাস জাগিয়াছিল। ইহাকে তাঁহারা 'যুগনদ্ধ' অবস্থা বলিতেন। বৈষ্ণবরা এই অবস্থাকে 'যুগল' বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহাকে 'যামল' বলে। ইহা পুরুষ নহে, প্রকৃতিও নহে, অথচ একই সঙ্গে পুরুষও বটে প্রকৃতিও বটে। এই যে সামরস্য ইহা যে নিত্যসিদ্ধ, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। পূর্বের অবস্থাটি যেমন নিত্যসিদ্ধ ইহাও তদ্রূপ।

ইহার পর এই যামল অবস্থার ভেদ হয়। তখন দ্বিতীয় সত্তার আবির্ভাব হয় না, কারণ উহা অদ্বয় অবস্থা। সর্বপ্রথম যে স্থিতির কথা বলিয়াছি উহা কিন্তু অদ্বয় অবস্থাও নহে, উহা বিকল্পহীন অবস্থা। অদ্বয় অবস্থাতেও বিকল্প আছে, ঠিক সেইপ্রকার যেপ্রকার দ্বৈত অবস্থায় আছে। কিন্তু যেখানে দ্বৈতাদ্বৈত সব কিছু বিবর্জিত, সেখানে বিকল্পের সম্ভাবনা কোথায়?

এইপ্রকারে তিনটি অবস্থার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। তাহাই ক্রমশঃ এক, দুই ও বহুরূপে ব্যাকরণশাস্ত্রে তিন বচনরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। পালি প্রভৃতিতে এবং অন্যান্য ভাষায় দ্বিবচন নাই। ইহাতে বুঝা যায় প্রাচীন আর্যগণের বিশ্লেষণশক্তি কত তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহারা বুঝিতেন এক হইতে বহু হয় না, দ্বিতীয় না হইলে। সৃষ্টি বহুস্বরূপ, মূলটি এক। এক হইতে বহুত্বে আসিতে হইলেই দুইয়ের আবশ্যক হয়। এই দ্বিতীয়টি দুই অবস্থায় প্রকাশিত হয়—এক, একের সহিত অভিন্নরূপে জড়িত, দ্বিতীয় এক হইতে ভিন্নরূপে প্রকাশমান। যেটি অভিন্নরূপে জড়িত সেই সত্তাটিকে যামল সত্তা বলে। এই দুইটি সত্তা ব্যতীত সৃষ্টি হইতে পারে না। এক ও দুই যেখানে যামলরূপে প্রকাশমান, সেখানে এই উভয়ের মিলনে পরম অদ্বৈত সত্তার প্রকাশ হয়। আর যেখানে এক আর দুই পৃথক্‌রূপে সংস্থিত সেখানে উভয়ের মিলনে এই ভেদময় বাহ্য জগতের প্রকাশ হয়। একটিকে অন্তরঙ্গা শক্তি বলা যাইতে পারে এবং অপরটিকে বহিরঙ্গা শক্তি বলা যাইতে পারে। পরবর্তীকালে তাহাই করা হইয়াছে, কিন্তু সেরূপ না করিয়াও তত্ত্বের নির্দেশ চলিতে পারে। যেখানে আমরা সমগ্র বিশ্বের বিচার করি সেখানে এই গূঢ় রহস্যটিকে লক্ষ্য করিয়াই বিচার করিতে হয়। যাহাকে 'যামল' বলে তাহার ভিতর দিয়া অর্থাৎ তাহাকে অবলম্বন করিয়া পূর্ণে প্রবেশ করা যায়। যাহাকে 'দুই' বলে তাহাদের সম্মিলনের ফলে এই ভেদময় মায়িক জগতের আবির্ভাব হয়। আগমশাস্ত্রে রেখাবিন্যাস দ্বারা এই তত্ত্বটি বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। উভয়ত্রই শক্তির খেলা। একটি শক্তি শিবতত্ত্বে পৌঁছাইয়া দেয়, আর একটি শক্তি জীব ও জগতের দিকে ঠেলিয়া দেয়। একটি উর্ধ্বমুখ ত্রিকোণ, অপরটি অধোমুখ ত্রিকোণ। সমগ্র সৃষ্টি বুঝিতে হইলে এই উভয় ত্রিকোণের সংযোগ লক্ষ্য করা আবশ্যক। ইহারই নাম ষট্‌কোণ। উভয় ত্রিকোণের কেন্দ্ররূপী বিন্দু একই।

যাহা হউক, সৃষ্টিরহস্যের কথা বলিতে গেলে একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক মনে হয়। সৃষ্টির মূলে আছে বিন্দু। পরম স্বরূপের স্বাতন্ত্র্যবশতঃ স্পন্দন যখন এই বিন্দুকে স্পর্শ করে তখন এই বিন্দু রেখারূপে পরিণত হয়, সর্বাপেক্ষা হ্রস্বরেখা দুই বিন্দু দ্বারা গঠিত। ইহার পরবর্তী সৃষ্টি সাক্ষাৎভাবে বিন্দু হইতে হয় না, রেখা হইতে হয়। তখন কিন্তু দুইটি রেখা আবশ্যক হয়

না। তিনটি রেখা আবশ্যক হয়। এই তিন রেখা-সংযোগে যে ত্রিকোণ উৎপন্ন হয় তাহাই সৃষ্টির মূল যোনিস্বরূপ। বেদান্তে এইজন্য 'যোনেঃ শরীরম্' এই সূত্র করা হইয়াছে। ইহাকে আশ্রয় না করিয়া শরীর উৎপন্ন হইতে পারে না। যাঁহারা ন্যায়দর্শন আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন তাঁহাদের এ সম্বন্ধে পরিস্ফুট জ্ঞান ছিল, কিন্তু আপন আপন ক্ষেত্র অনুসারে। এইজন্য তাঁহারা বলিয়াছেন সৃষ্টির ক্রম এই : পরমাণু—দ্ব্যণুক—ত্রসরেণু। এইজন্য একটি পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয় কিন্তু তিনটি দ্ব্যণুক ভিন্ন ত্রসরেণু উৎপন্ন হয় না। এইজন্য বৌদ্ধরাও বলিয়াছেন, 'ষট্কেণ যুগপদ্‌যোগাৎ পরমাণোঃ ষড়ংশতা'।

ত্রিকোণের উৎপত্তি অত্যন্ত রহস্যময়। এই ত্রিকোণই মহাত্রিকোণ, যাহাকে কুণ্ডলিনী বলিয়া পণ্ডিতেরা বিচার করিয়া থাকেন। এই ত্রিকোণে—তাহা উর্ধ্বমুখী বা অধোমুখীই হউক্—তিনটি অবয়ব স্পষ্ট স্থিত রহিয়াছে। দৃষ্টান্তরূপে ধরা যাক্ ক-খ-গ একটি ত্রিকোণ। এইস্থানে ক-খ-গ ত্রিরেখাত্মক ত্রিকোণ। তারপর ক অথবা খ অথবা গ হইতে একটি কেন্দ্রাভিমুখী রেখা।
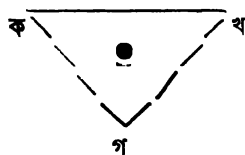
এবার আমরা বিন্দু সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। কিন্তু তাহার পূর্বে পরাবাকের কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ আবশ্যক। আমাদের জ্ঞানরাজ্যের ব্যবহার ভূমিতে তিনটি বিষয়ের সহিত আমরা পরিচিত : একটি বস্তু, যাহাকে প্রাচীন মুনি ঋষিরা অর্থ বলিতেন, যাহাকে আমরা সাধারণতঃ পদার্থ বলি; আর একটি জ্ঞান এবং তৃতীয়টি শব্দ। শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এই তিনটি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। এই তিনের মধ্যে দুইপ্রকার সম্বন্ধ লক্ষিত হয়; তাহা পূর্বে বলিয়াছি। উভয়ত্র অর্থের স্থান প্রধান। অর্থই এই জগৎ, কারণ ইহা পদার্থসমষ্টি। কিন্তু ইহার সহিত সম্বন্ধ আছে জ্ঞানেরও এবং শব্দেরও; অর্থাৎ অর্থের সহিত শব্দের যে সম্বন্ধ তাহাকে বলে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ, অর্থের সহিত জ্ঞানের যে সম্বন্ধ তাহাকে বলে বিষয়-বিষয়ী সম্বন্ধ। প্রাচীনকালের দার্শনিকগণ জানিতেন যে উভয়ত্রই সৃষ্টির রহস্য বিদ্যমান রহিয়াছে। সাধারণ অবস্থায় অর্থ এবং তাহার বাচক শব্দে যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা

যাইবে জ্ঞান এবং অর্থের সঙ্গে ঠিক সেইপ্রকার সম্বন্ধ রহিয়াছে কিন্তু অপর দিক্ দিয়া। অর্থের জ্ঞানই জ্ঞান, অর্থহীন জ্ঞান নিরর্থক কিন্তু তাহাও আছে। বিজ্ঞানবাদী তাহা ভালই জানেন এবং তাহার গভীর রহস্য আছে। এখানে তাহার আলোচনা করিব না। শব্দের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ তাহাও অকৃত্রিম কিন্তু আমরা অকৃত্রিমরূপে তাহা পাই না।

এই প্রসঙ্গে একটু বিশদভাবে আলোচনা আবশ্যক। আমরা জানি শব্দ আলাদা, অর্থ আলাদা। ঐ অর্থকে বুঝাইবার জন্য ঐ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে কিন্তু অন্য শব্দেরও প্রয়োগ হইতে পারে। জলরূপ পদার্থকে বুঝাইবার জন্য জল, নীর ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিতে পারি কিন্তু উভয়ই কৃত্রিম, কারণ বিভিন্ন ভাষায় জলের বাচক শব্দ বিভিন্ন, ইহা সকলেই জানেন। কোষাদি হইতে শব্দের জ্ঞানলাভ করিতে হয়, কিন্তু এ সমস্ত কল্পিত। জ্ঞানের রাজ্যেও ঠিক তাহাই। জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ ঠিক উহারই অনুরূপ। এইস্থলে শুধু বাচ্য-বাচকের দিক্ হইতে আলোচনা করিতেছি কারণ এই আলোচনার প্রধান লক্ষ্য শব্দ। শব্দ ও অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ তিনপ্রকার জানিতে হইবে। ইহার একটি অভেদ সম্বন্ধ, দ্বিতীয়টি ভেদাভেদ সম্বন্ধ এবং তৃতীয়টি ভেদ সম্বন্ধ। দার্শনিকগণ যে চারিপ্রকার বাকের নির্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পরাবাকে এই সম্বন্ধের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে তিনটি অবস্থা আছে যাহা বুঝাইবার জন্য পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী এই তিনটি শব্দের প্রয়োগ করা হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, পশ্যন্তী অবস্থায় শব্দ ও অর্থে অভেদ সম্বন্ধ অর্থাৎ যাহা শব্দ তাহাই অর্থ, যাহা অর্থ তাহাই শব্দ। মধ্যমা অবস্থায় শব্দ ও অর্থে ভেদাভেদ সম্বন্ধ অর্থাৎ ঐস্থলে ভেদও আছে, অভেদও আছে, ভেদের সঙ্গে অভেদ বিজড়িত। বৈখরী অবস্থায় শব্দের সঙ্গে অর্থের ভেদ সম্বন্ধ অর্থাৎ উভয়ের সম্বন্ধ কল্পিত বা conventional। আর পরাবস্থায় এ প্রশ্ন ওঠেই না, কারণ শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান পৃথক্‌রূপে সেখানে ভাসমান হয় না। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে বিষয় ও বিষয়ীরূপ সম্বন্ধও এইপ্রকার। পশ্যন্তী বাক্ আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

এখানে শুধু ইহাই বলিয়া রাখিতেছি যে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান—এই তিনের মধ্যে একহিসাবে দেখিতে গেলে প্রাধান্য শব্দেরই। পরামাতৃকা বিশ্বজননী, তাঁহার সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে বিশেষ আলোচনা সম্ভব নহে। পশ্যন্তী অবস্থায়

তিনটি সত্তাই অভিন্নরূপে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ অন্যসময়ে শব্দ ও অর্থ—এই দুইটির মধ্যে সম্বন্ধ কল্পিত হয় এবং অবস্থান্তরে জ্ঞান ও অর্থ—এই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কল্পিত হয়। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি: যাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্রের গভীর রহস্যে প্রবেশ করেন নাই সেইসকল যোগিগণ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির বিবরণ দিবার সময় এমন অনেক কথা বলিয়াছেন যাহা তান্ত্রিক যোগীর পক্ষেও চিন্তার বিষয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির প্রথম স্তর স্থূল অর্থ অবলম্বন করিয়া হয় এবং এই স্তরে দুইপ্রকার সমাধির উদয় হয়। আমরা স্থূলের বিষয় আলোচনা করিতেছি—এইজন্য এই দুটি স্তর সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক নামে প্রসিদ্ধ। সমাধি বুঝিতে গেলেই ঐ পূর্বোক্ত পশ্যন্তী বাকের ন্যায় শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করা আবশ্যক হয়। যতক্ষণ 'স্মৃতিপরিশুদ্ধি' না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বিকল্প নিবৃত্তি হইতে পারে না এবং সেইজন্য এই সমাধিজনিত প্রজ্ঞায় জ্ঞানের সঙ্গে শব্দ অনুবিদ্ধ থাকে। ইহা বিশুদ্ধ জ্ঞান নহে। অর্থ একদিকে বাচক শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট, অপরদিকে তদ্বিষয়ক জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ। ইহার ফলে শব্দের সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ আপনিই থাকিয়া যায়। এইজন্যই সাধারণতঃ বলা হয়—'ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে' অর্থাৎ লৌকিক জ্ঞানমাত্রেই শব্দসংবেধ থাকিয়া যায়। জ্ঞান বিশুদ্ধ হইতে হইলে উহাকে শব্দ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু 'স্মৃতিপরিশুদ্ধি' ব্যতীত উহা সম্ভবপর নহে। এই স্মৃতিপরিশুদ্ধি একটি মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম ব্যাপার, অর্থাৎ কোনো পরিচিত শব্দ শুনিয়া তাহা মোটেই বুঝিতে না পারা—সরলভাষায় বলিতে গেলে ইহাই স্মৃতিপরিশুদ্ধির লক্ষণ, অর্থাৎ কোনো শব্দ উচ্চারিত অবস্থায় শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঐ শব্দের বাচ্যার্থের অনুধাবন হয় চিত্তে। তদনুসারে ব্যবহার প্রবৃত্ত হয়। কেহ পরিচিত ভাষায় কটূক্তি করিলে মন বিষণ্ণ হয়। আবার চাটুকারের মত প্রশংসা করিলে মন প্রসন্ন হয়। এইভাবে পরিচিত ভাষা শ্রবণ করিয়া সাধারণ মনুষ্যের ভিতর বিকল্প উদয় হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যোগিকে ইহার ঊর্ধ্বে উঠিতে হয়। ইহার এতদূর পরিণতি হইতে পারে যে শব্দের ব্যুৎপত্তি থাকা সত্ত্বেও অর্থের বোধ না হওয়ার দরুণ চিত্তে কোনপ্রকার বিকার উৎপন্ন হয় না। ইহার ফলে পরিনিষ্ঠিত অবস্থায় অজানা ভাষায় কথা শুনিয়াও বুঝিতে পারা যায়। ইহাকেই বলে 'সর্বভূতরুতজ্ঞানম্'। এইপ্রকারে স্মৃতিপরিশুদ্ধি সম্যক্ সম্পন্ন হইলে সবিতর্ক সমাধি নির্বিতর্ক

সমাধিতে উন্নীত হয়। আমরা শুধু স্থূল আলম্বন গ্রহণ করিয়াই আলোচনা করিতেছি। সূক্ষ্মেও তদনুরূপ তবে এরূপ জটিলতা নাই। সবিচার ও নির্বিচার ইহার অনুরূপ জানিতে হইবে।

এই যে নির্বিতর্ক প্রত্যক্ষ ইহারই নাম পরপ্রত্যক্ষ। সম্প্রজ্ঞাত ভূমির যোগী এই পরপ্রত্যক্ষ দ্বারা নির্বিকারভাবে বস্তুর-স্বরূপ সাক্ষাৎকার করেন। তারপর ঐ স্বরূপকে জগৎকল্যাণের জন্য শব্দরূপ বাহনকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানোপদেশ দ্বারা ব্যবহারভূমিতে প্রেরণ করেন। ইহার বিশেষ আলোচনা পরে হইবে। এইস্থলে যে দুইটি ব্যাপার বর্ণিত হইল ঠিক ঐপ্রকার দুইটি ব্যাপার তান্ত্রিক যোগীকেও পশ্যন্তী ও মধ্যমাভূমির সন্ধিতে করিতে হয়। মধ্যমাভূমি কল্পনা রাজ্য, পশ্যন্তী নির্বিকল্প। পশ্যন্তীতে বাচ্য-বাচক অভিন্ন অর্থাৎ শব্দ ও তদ্বাচ্য অর্থ অভিন্ন। অর্থাৎ বাচক শব্দ এবং বাচ্য অর্থ সেখানে অভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। এইটি হইল পশ্যন্তী বাকের একটি দিক্ কিন্তু ইহার অপর দিক্ও আছে। বাচক শব্দের সহিত বাচ্য অর্থ যেপ্রকার অভিন্ন ঠিক সেইপ্রকার বোধ বা জ্ঞানের সহিত বোধ্য অর্থও অভিন্ন। অর্থের সহিত একদিকে বাচকের সম্বন্ধ তাই ইহা বাচ্য, তদ্রূপ অর্থের সহিত বোধরূপ জ্ঞানেরও সম্বন্ধ। এই বাচ্য অর্থকে শব্দ দ্বারা জ্ঞানে প্রকাশন—ইহাই পশ্যন্তীর সন্ধিতে মধ্যমাতে প্রবেশ। মহাজ্ঞান ঠিক এইস্থানে জ্ঞান হইয়াও বাক্‌রূপে প্রকাশিত হয়। আগম, বেদ প্রভৃতি ইহারই দৃষ্টান্ত। বেদ যেমন অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া দেখিতে গেলে অনন্ত—'অনন্তা হি বেদাঃ'—সেইপ্রকার জ্ঞানের ধারাও পৃথক্ পৃথক্। আগম, নিগম, তন্ত্র, বেদ উভয়ত্র একই নিয়ম। এইখানেই গুরুপরম্পরার রহস্য—যাহার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। সেই মহাজ্ঞান হইতে নিরন্তর অনন্ত মহাজ্ঞান নিঃসৃত হইতেছে। বৈদিক সাহিত্যেও শোনা যায় যে বিভিন্ন বেদের অগণিত সংখ্যক শাখা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তন্ত্রেও তাই, ইহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। চতুঃষষ্টি তন্ত্র, অষ্টাদশ আগম, দশ শিবাগম, তথাকথিত পাশুপত আগম—এইসকল দৃষ্টান্ত মাত্র। জ্ঞান নিরবধি। বোধরূপে তো বটেই, শব্দরূপেও। এই জ্ঞানের যে প্রস্তাব তাহাতে গুরুশিষ্যধারার রহস্য রহিয়াছে, যাহার কথা ইঙ্গিত করিয়াছি মাত্র। এই সম্বন্ধে আপাততঃ বিশেষ কিছু না বলিয়া মাতৃকা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতেছি।

মাতৃকা, মহামাতৃকা, বর্ণমালা—এসব মূলে এক অদ্বৈত মহাশক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার অনুরূপ নাম। এই সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার পূর্বে মনে রাখিতে হইবে 'মাতৃকা' শব্দের অর্থ মাতা, অম্বা, অম্বিকা—একই জিনিষ। মাতৃকা বলিতে কি বুঝায়? যে অনন্ত অখণ্ড মহাসত্য জগৎকে প্রকাশ করিতেছে, তাহার সেই স্বরূপভূতা শক্তিই মাতৃকা নামে পরিচিত। মাতৃকা-বিরহিত অর্থাৎ স্বরূপভূত শক্তিহীন সেই মহাপ্রকাশ প্রকাশস্বরূপ হইয়াও প্রকাশমান নহে। মহাজনগণ বলিয়াছেন—"বাগ্‌রূপতা চেদুৎক্রামেদববোধস্য শাশ্বতী ন প্রকাশঃ, প্রকাশেত সা হি প্রত্যবমর্শনী" অর্থাৎ জ্ঞান বা বোধ ইহার একটি শাশ্বত বা নিত্যসিদ্ধ বাগ্‌রূপতা রহিয়াছে। তাই জ্ঞান বা প্রকাশ স্বয়ংপ্রকাশরূপে পরিচিত হয়। অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপে যদি বাগ্‌রূপতা না থাকিত অর্থাৎ মাতৃভাব না থাকিত তাহা হইলে তাহা স্বরূপতঃ প্রকাশ হইয়াও প্রকাশমান হইতে পারিত না। কারণ মাতৃকাই প্রত্যবমর্শনকারিণী শক্তি, অর্থাৎ প্রকাশ তখনই নিজেকে প্রকাশ বলিয়া চিনিতে পারে যখন তাহার সঙ্গে মাতৃকা যুক্ত থাকে। মাতৃকা অন্তর্লীন হইয়া গেলে প্রকাশ প্রকাশই থাকে, কিন্তু তাহা নিজেকে প্রকাশ বলিয়া চিনিতে পারে না। কারণ প্রত্যবমর্শন শক্তি মাতৃকাতেই থাকে। মাতৃকা স্বরূপভূতা শক্তি। এই যে শক্তি ইহাকে আশ্রয় করিয়াই সকল সত্তা প্রকাশমান হয়।

সমগ্র জগৎ, ঈশ্বর, জীব এবং জ্ঞেয় জড়পদার্থ ব্যষ্টি এবং সমষ্টিভাবে মাতৃকা হইতে উদ্ভূত। অর্থাৎ অহংরূপে যে প্রকাশমানতা তাহার মূলেও মাতৃকা। এই অহং পূর্ণ অহং হইতে পারে এবং অপূর্ণ পরিচ্ছিন্ন অহং হইতে পারে কিন্তু উভয়ত্রই মাতৃকার খেলা রহিয়াছে। পূর্ণাহং সম্পূর্ণ মাতৃকাময়—অ-কার হইতে হ-কার পর্যন্ত যে মহান্ চক্র—'অ' বলিতে বুঝায় পরপ্রকাশ এবং 'হ' বলিতে বুঝায় বিমর্শ—এই 'অ' হইতে 'হ' পর্যন্ত পঞ্চাশৎ মাতৃকা সমষ্টিরূপে প্রকাশমান থাকিলে পূর্ণ অহংসত্তার অভিব্যক্তি থাকে। আদিতে অ-কার এবং অন্তে হ-কার এই মহামণ্ডলটি মাতৃকামণ্ডল। ইহার বিষয় পরে বিস্তারিতভাবে বলিব। ইহাই পূর্ণ অহংয়ের স্বরূপ। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম অব্যক্তরূপে সৎ এবং প্রকাশরূপে আত্মপ্রকাশরূপী এই অনন্ত মাতৃমণ্ডল। পূর্ণ অহং পরমেশ্বরের নিত্যসিদ্ধ নিজ স্বরূপ। এই স্বরূপ নিত্য প্রকাশমান স্বয়ংসিদ্ধ এবং পরিপূর্ণ—

ইহার বাহিরে কিছু নাই, থাকিতেও পারে না এবং ইহার মধ্যে ইহার সহিত অভিন্নভাবে অনন্তসত্তা রহিয়াছে। তাহাতে পরমপ্রকাশের পূর্ণত্বের ব্যাঘাত হয় না। এই প্রকাশের বাহিরে প্রকাশ কল্পনীয় নহে। কিন্তু মহাসিদ্ধ যোগিগণের নিজেদের খেয়ালবশতঃ অথবা প্রয়োজন হইলে—যে প্রয়োজন আমরা বিশ্ববাসী বুঝিতে সমর্থ নহি—আমরা অভিনব বিশ্ব প্রাপ্ত হইতে পারি। ইহা অতি গুহ্য ও গোপনীয় বিষয়। ঐসব স্থলে কূটাক্ষর 'ক্ষ' দ্বারা প্রবাহের সম্মুখ গতিকে প্রথম রোধ করিয়া নিতে হয়। তাহার পর যথাপূর্ব প্রকাশের অন্তর্বর্তী লীলা চলিতে থাকে। ইহা অতি গুহ্য—এখানে নামমাত্র উল্লেখ করিলাম।

পূর্ণ অহং এক ও অভিন্ন। ইহাতে ভিন্ন অবয়ব থাকিলেও তাহা 'সূত্রে মণিগণা ইব'। মালাতে যতই ফুল থাকুক্ পুষ্পের অন্তর্ভেদী সূত্র একই—তাই মালাকে এক বলে। এইস্থলেও অন্তর্ভেদী সূত্র একই—যাহা অ-কার হইতে হ-কার পর্যন্ত প্রসৃত হয়। এই যে অহং ইহা একমাত্র অহংই বটে। ইহাতে কোনো পদার্থ নাই, থাকিলে এই অহং পূর্ণ অহং না হইয়া অহং-ইদংয়ের সমন্বয়রূপে পরিণত হইত। পূর্ণ অহং চৈতন্যস্বরূপ, তাহাতে ইদন্তা নাই। একমাত্র অহন্তাই আছে। ইদন্তা স্বাতন্ত্র্যবলে সৃষ্টিমুখে আবির্ভূত হয়। সেই সৃষ্টির নাম হয় মহাসৃষ্টি। আমাদের খণ্ডকালের জগতে অনন্ত লোক-লোকান্তরে যাহা কিছু আছে, ছিল বা হইবে, সকলই নিত্য বর্তমানরূপে ঐ মহাসৃষ্টিতে বিদ্যমান। ঐ স্থানে কাল নাই, অথচ কাল আছে। যে কাল পরিণামের সাধক, যে কালের ধর্ম পরিণামরূপে আমরা দেখিয়া থাকি—যাহা অতীত, অনাগত ও বর্তমানরূপে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, ঐ ভূমিতে সে কালের অস্তিত্ব নাই। অথচ কাল যে নাই তাহাও নহে। ইহা অতি গুহ্য বিষয়। তান্ত্রিকগণ ইহাকেই মহাকাল বলেন। অহং হইতে ইদংরূপে ভাসমান হইলেই তাহা সৃষ্টিরূপে বর্ণিত হওয়ার যোগ্য। ইহার আদি, অন্ত নাই বলিয়া ইহাকে মহাসৃষ্টি বলে। যে কোনো সময়, যে কোনো স্থানে যাহা কিছু ছিল বা হইবে ঐ মহাসৃষ্টিতে তাহা নিত্য বিদ্যমান। কিন্তু তথাপি ঐ অবস্থা পূর্ণ অবস্থা নহে, সঙ্কুচিত অবস্থা, কারণ উহা ইদংরূপে ভাসমান, অহংরূপে নহে। পূর্ণ অহংয়ের সত্তা হইতেই এই মহাসৃষ্টির আবির্ভাব হয়। এই মহাসৃষ্টির সংহারই বস্তুতঃ মহাসংহার। পৌরাণিকগণ যাহাকে মহাপ্রলয় বা অতিমহাপ্রলয়

বলেন তাহা ইহার নিকট অতি তুচ্ছ—কারণ মহাসৃষ্টির অন্ত নাই। কাল হিসাবে তাহার অবসান কল্পনীয় নহে কিন্তু তাহারও অবসান আছে। তাহা হয় পূর্ণাহন্তা বোধের সঙ্গে সঙ্গে, কারণ তখন ইদংভাব মোটেই থাকে না। ইহাকে বলে পূর্ণতা লাভ, পরমেশ্বরত্ব, পরমশিবভাব। এই পূর্ণসত্তাকে বেদান্তের ব্রহ্ম বলিয়া মনে করা ঠিক নহে কারণ বেদান্তের অধিকারভুক্ত ব্রহ্মসত্তা অহংভাববর্জিত, আর এখানে আছে অহংভাবের পূর্ণত্ব। প্রকাশ বা মহাপ্রকাশ উভয়ত্র একই, মহাশক্তির সর্বাত্মনা পরমশিবের সঙ্গে সামরস্যভাব—এই অবস্থার বৈশিষ্ট্য। পূর্ণাহন্তা সম্বন্ধে বহু কথা বলিতে হইবে—এখানে দিঙ্-মাত্র নির্দেশ করা হইল। পূর্ণাহন্তাতে স্বাতন্ত্র্য অভিন্নরূপে বিদ্যমান থাকে—এই স্বাতন্ত্র্যেরই নাম পরাবাক্ বা মহামাতৃকা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রকাশের বাগ্‌রূপতা নিত্যসিদ্ধ। সুতরাং এই মহাপ্রকাশ স্বরূপশক্তি সমন্বিত। ইহা শুদ্ধ প্রকাশমাত্র নহে, তাহা হইলে অহংরূপে ইহার বিমর্শ হইত না।

৫

এই প্রসঙ্গে ইহার বুঝিবার সুবিধার জন্য প্রাচীন সাংখ্যের দৃষ্টিকোণ আলোচনা করিতে পারিলে ভাল হয়। সাংখ্যে প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন। পুরুষ চিদ্রূপ বা প্রকাশরূপ কিন্তু প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা এবং এই ত্রিগুণ মিথ্যা নহে, সত্য। অর্থাৎ বেদান্তকল্পিত মায়ার ন্যায় মিথ্যা নহে, ইহা সত্য। প্রকাশ বা পুরুষ অপরিণামী কিন্তু প্রকৃতি নিত্য পরিণামশীল। প্রকৃতির এই পরিণাম কেন হয় সে সম্বন্ধে প্রাচীন আচার্যগণের বহু বিচার আছে। কেহ কেহ বলেন, 'কালাদ্ গুণব্যতিকরঃ' ইত্যাদি। কিন্তু প্রসিদ্ধ সাংখ্য তাহা স্বীকার করেন না। সাংখ্যমতে এই পরিণামের বাহ্য হেতু নাই, স্বভাবই ইহার একমাত্র হেতু। তাই প্রকৃতিকে বলা হয় স্বতঃ পরিণামিনী। অবশ্য বিভিন্ন প্রকার পরিণামের জন্য বিভিন্ন প্রকার নিমিত্ত বা কারণ রহিয়াছে, কিন্তু শুধু পরিণাম প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ, নৈমিত্তিক নহে। এই পরিণাম সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে দুইপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়—একটি স্বরূপপরিণাম—ইহা স্বতঃ পরিণাম, ইহাতে সৃষ্টি হয় না। প্রকৃতি সর্বদাই স্বতঃ পরিণামসম্পন্ন। কিন্তু আর একপ্রকার পরিণাম আছে, তাহা বিসদৃশ পরিণাম। পূর্বের পরিণামটি সদৃশ পরিণাম বলিয়া ইহাকে বিসদৃশ পরিণাম বলা হয়। এই পরিণামের ফলে

সৃষ্টির উদয় হয়। নিমিত্ত জীবের পূর্বকৃত কর্মসংস্কার, তাহা বলাই বাহুল্য। এই বিসদৃশ পরিণামের ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা তিনটি বিভাগ আছে। প্রকৃতি ধর্মী, তাহার প্রথম পরিণামটি ধর্মপরিণাম। ধর্মের প্রথম পরিণামটি লক্ষণপরিণাম। লক্ষণপরিণামের পর অবস্থাপরিণাম। লক্ষণপরিণামটি কালগত পরিণাম— অতীত, অনাগত ও বর্তমান এই একটি ভেদ লক্ষণপরিণামে থাকে। সাংখ্য সৎকার্যবাদী। সৃষ্টি পরিণামরূপে হইলেও অসতের কখনও সৃষ্টি হয় না। যাহা পূর্বে অসৎ ছিল তাহা পরে অভিব্যক্ত হইয়া সদ্রূপে পরিণত হয়। এই অসৎ অবস্থাটি লক্ষণপরিণামের অন্তর্গত অনাগত কালকে লক্ষ্য করিতেছে। সুতরাং যাহা অনাগত কালে সদ্রূপে পরিদৃষ্ট হয় তাহা বর্তমানে কার্যরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং যাহা এখন নাই তাহাও অনাগত লক্ষণে আছে, কারণ না কখনও হাঁ হয় না। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে : যাহা অনাগত লক্ষণে আছে তাহা ভবিষ্যতে বর্তমানে পরিণত হইবে। কিন্তু যাহা অনাগত লক্ষণে দৃষ্ট হয় না, তাহা বর্তমানে আসিবে কি প্রকারে ? আচার্যগণ বলেন যে অনাগতে না থাকিলে বর্তমানে আসিতে পারে না ইহা সত্য, কিন্তু অনাগতে না থাকিলেও ধর্মপরিণামরূপে তো তাহা থাকিতে পারে। ঐ ধর্মপরিণামটি অনাগতের মধ্য দিয়া বর্তমানে আসিতে পারে। বিসদৃশ পরিণামের প্রথম পরিণামই হইল ধর্মপরিণাম। ধর্মপরিণামের দৃষ্টিতে ব্যাপক সৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং ধর্মপরিণামে থাকিলে একজন যোগী যদি তার সাক্ষাৎ করেন তাহা হইলে তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করিতে পারেন যে উহা বর্তমানে আসিবেই আসিবে লক্ষণপরিণামের মধ্য দিয়া। কিন্তু যখন তিনি দেখেন উহা ধর্মপরিণামেও নাই, তখন তাঁহাকে বলিতে হয় ইহা হইতে পারে না। কিন্তু তান্ত্রিক বলিবেন যে ইহাও ঠিক নহে। তখন ইহার সমাধান হইবে যে সাংখ্যদৃষ্টিতে ইহা অসম্ভব। কারণ ধর্মপরিণামে ইহার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু সাংখ্য ঈশ্বরবাদী নহেন, কিন্তু যিনি ঈশ্বরবাদী তান্ত্রিক তিনি বলিবেন সদৃশপরিণামশালী প্রকৃতিকে ঈশ্বর ক্ষুব্ধ করিতে পারেন, যদিও পুরুষ তাহা পারেন না। তান্ত্রিকের ঈশ্বর স্বাতন্ত্র্যময়, তাঁহার স্বাতন্ত্র্যবলে সদৃশ পরিণাম বিসদৃশ পরিণামে পরিণত হইতে পারে। যদি তাহা হয় তাহা হইলে ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্যবলে সদৃশ পরিণাম প্রকৃতিও ক্ষুব্ধ হইয়া বিসদৃশ পরিণাম সাধন করিতে পারেন। তখন ঐ প্রকৃতিই মায়ারূপে পরিণত হ'ন, যিনি অঘটনঘটনপটীয়সী,

তাঁহার অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর। কিন্তু ইহা মিথ্যা। কিন্তু তান্ত্রিক বলেন ইহা সত্য, কারণ তাঁহার দৃষ্টি আরও ঊর্ধ্বে। ইহার ফলে যাহা আমাদের সম্মুখে প্রকাশ-মান তাহাই মহাসৃষ্টি। ইহা বেদান্তেও নাই, সাংখ্যেও নাই, পাতঞ্জলেও নাই। এই মহাসৃষ্টির অংশ নিয়াই খণ্ড সৃষ্টি।

মহাসৃষ্টি যেমন সমগ্র বিশ্বের অন্তর্গত যাবতীয় সত্তার সমষ্টিস্বরূপ, তেমনি মহাপ্রলয়ও সমগ্র বিশ্বের অন্তর্গত যাবতীয় সত্তার চরম উপসংহারস্বরূপ। মহাসংহারের পরে বিশ্ব থাকে না, থাকিতে পারে না। পুরাণাদির কল্পিত মহাসংহার আপেক্ষিক, পূর্ণ নহে। পূর্ণ মহাসংহার হইলে ইদংরূপে প্রতীয়মান সত্তার অস্তিত্ব থাকা সম্ভবপর নহে। একমাত্র পরিপূর্ণ অহংই তখন থাকে। বর্তমান স্থলেও মহাসৃষ্টির অতীত অবস্থাই পূর্ণ অহং বা পরমশিব।

প্রশ্ন হইতে পারে: পূর্ণ অহং সত্তাতে কি মহাসৃষ্টির যাবতীয় সত্তা বিদ্যমান থাকে? ইহার উত্তর এই—থাকে অথচ থাকে না। সবই থাকে, কিন্তু ইদংরূপে থাকে না, অহংরূপে থাকে। পূর্ণ অহং সত্তাতে ইদংয়ের স্থান নাই। পূর্ণ অহং সত্তাই পূর্ণ অহং বিমর্শময়। তাহাতে ইদং সত্তা থাকিবে কি প্রকারে? তবে পূর্ণ অহংয়ের স্বাতন্ত্র্যবলে আদি সৃষ্টিরূপে ইদংয়ের আভাস প্রকাশ পাইতে পারে। ঐরূপ স্থলে সর্বপ্রথম পূর্ণ অহং সত্তার উপর স্বকল্পিত একটি আবরণ আসিয়া পড়ে। এই সব বিষয়ে পরে বিশেষভাবে আলোচনা করা যাইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই যে মহা আবরণ ইহা স্বরূপেরই আবরণ, আবার আবরণ হইয়াও ইহা আবরণ নহে। কারণ এই আবরণের আবির্ভাব হইলেও অখণ্ড পূর্ণ সত্তা অনাবৃতই থাকে। এইজন্যই বলা হয়—'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে'। এই যে মূল আবরণ এই আবরণের উপরে সৃষ্টির ব্যাপার আবির্ভূত হয়। এই আবরণই মহাশূন্য বা আকাশ নামে পরিচিত। কিন্তু এই প্রসঙ্গ এখন আলোচ্য নহে।

বেদান্তে এই আবরণ আবরণরূপে এবং সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বিক্ষেপরূপে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়, যদিও তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার অনেক বিস্তার আছে। কিন্তু তাহাও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য নহে।

এই যাহাকে মহাসৃষ্টি বলা হইল তাহা ইদংরূপে সমগ্র মহাসমষ্টির প্রতীক। এইটি যে মহাযোগী মহাকালের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে নিরন্তর ভাসিতে থাকে। ইহার কোন বিশেষ রূপ নাই। ইহা পরসামান্যরূপ—

অতীত, অনাগত ও বর্তমান এখানে অবস্থিত, স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ, চেতন ও অচেতন, জ্ঞাতা-জ্ঞান ও জ্ঞেয়, আন্তর ও বাহ্য—সমস্তই ইহার অন্তর্গত। ইহা ইদংরূপে নিত্যসিদ্ধরূপে বর্তমান থাকে। অন্যান্য দর্শনে অথবা অন্যান্য যোগের প্রক্রিয়াতে এইস্থানে আসিলেই এক হিসাবে ঈশ্বরপদে অধিষ্ঠিত হয় কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইহাও পূর্ণত্বের অবস্থা নহে, কারণ ইহা ইদংরূপে প্রতিভাত হয়, অহংরূপে নহে। পূর্ণ বস্তু একমাত্র অহং, তাহাতে ইদংভাবের লেশমাত্র থাকে না। ইদংভাব সৃষ্টির অন্তর্গত।

পূর্ণ বস্তু অখণ্ড মহাপ্রকাশ এবং পরাশক্তির সম্মিলিত, সম্মূর্চ্ছিত, অভিন্ন-স্বরূপ। পূর্ণস্বরূপে অহং আছে, কিন্তু তাহা অপূর্ণ অহং নহে। মহাসৃষ্টিতে অহং আছে, মায়াপ্রমাতা বা জীবরূপে অনন্ত বা অসংখ্য। ইদং আছে সর্ব-প্রথম মহাশূন্যরূপে, তাহার পর তত্তৎ প্রমাতার প্রমেয়রূপে, যাহা পরে বুঝিতে পারা যাইবে এবং উভয়ের সম্বন্ধাত্মক বিজ্ঞান রহিয়াছে। ইহা অনন্তরূপে কল্পিত হইলেও এক ও অভিন্ন। এই ত্রিপুটীর প্রথম আবির্ভাব মহাসৃষ্টিতে হইয়া থাকে। খণ্ড কালের সৃষ্টিতে বিভিন্ন লোক-লোকান্তররূপে ইহা ফুটিয়া উঠে। এইখানে সে-বিচার করণীয় নহে।

এই যে পূর্ণ অহং ইহা নিত্যসিদ্ধ। ইহা অহংকার বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন। পূর্ণস্থিতিতে অহংকার থাকিতে পারে না, গ্রাহকভূমিতে অহংকার থাকে, তাহা ঐশ্বরিক ভূমিতেই হউক্, জীবভূমিতেই হউক্। পূর্ণ অহং গ্রাহকপদ-বাচ্য নহে। গ্রাহক-গ্রহণ ও গ্রাহ্য—ইহা ত্রিপুটীর অন্তর্গত, পূর্ণ অহংয়ে ত্রিপুটী নাই, একমাত্র অহং আছে। পূর্ণ অহং ও অপূর্ণ অহংয়ের পার্থক্য কি সংক্ষেপে বলিতেছি। পূর্ণ অহং নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র কিন্তু গ্রাহকরূপী অহং নিরপেক্ষও নহে, স্বতন্ত্রও নহে। গ্রাহক অহং গ্রাহ্য ইদংসাপেক্ষ, কারণ গ্রাহ্য না থাকিলে গ্রাহক হইতে পারে না। পূর্ণ অহংয়ে গ্রাহ্য কোথায়, গ্রহণই বা কোথায়, গ্রাহকই বা কোথায়? সমস্ত অখণ্ডরূপে একমাত্র অহং, সেখানে দ্বিতীয় কিছুর স্থান নাই। গ্রাহকরূপী অহং ও পূর্ণ অহংয়ে অনেক পার্থক্য। গ্রাহকরূপী অহং সৃষ্ট কোন উপাধি আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে। এই যে সৃষ্ট আশ্রয় ইহা আপাততঃ দুই ভাগে বিভক্ত, বুঝিয়া রাখ। উভয়ই জড়—কিন্তু একটিতে প্রাণের ক্রিয়া হয় এবং সেখানে অহং প্রতীতির উদয় হয় এবং অপরটিতে প্রাণের ক্রিয়া হয় না এবং উহা ইদংরূপে প্রতীত হয়, অহং-

রূপে নহে। উহাকেই সাধারণতঃ জড়বস্তু বলে। সুতরাং বুঝিতে হইবে জড়বস্তু দুইপ্রকার—একটিকে অহং আশ্রয় করে এবং গ্রাহকপদে পরিণত হয় এবং অপরটিকে গ্রাহ্য বলা হয়। ইহার ভিতরে একটি রহস্য আছে, যাহার বিশেষ বিবরণ পরে বলিব। শাস্ত্র বলিয়াছেন 'প্রাক্ সংবিৎ প্রাণে পরিণতা'—সংবিৎরূপী চৈতন্য যখন সৃষ্টির ধারাতে আসিয়া অবরোহণ করে তখন সর্বপ্রথম উহাই প্রাণরূপে পরিণত হয়। ইহা আমরা মাতৃকা আলোচনা-প্রসঙ্গে বুঝিতে পারিব। কারণ অহংয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম কলা যে 'অ-কার' ইহাই মহা-প্রকাশের দ্যোতক আর 'হ-কার' প্রাণের দ্যোতক। উভয় একই অথচ এক নয়। একটি শিবরূপী অপরটি শক্তিরূপী অথচ চিৎস্বরূপে উভয়ই অভিন্ন। এই উভয়ের সম্মিলনে অন্তর্বর্তীভাবে অসংখ্য কলা আছে। অ-কার হইতে হ-কার পর্যন্ত পঞ্চাশৎ কলা প্রসিদ্ধ। ইহার মধ্যে উপকলা হিসাবে অনন্ত কলা খেলা করিতেছে। ইহার বিবরণ পরে দেওয়া যাইতেছে।

অ-কার হইতে হ-কার পর্যন্ত প্রসরণ সমাপ্ত হইলে উভয়ের আলিঙ্গনে অন্তর্বর্তীরূপে যাবতীয় কলা অভিন্নরূপে প্রকাশমান হইয়া অহংভাবের বিকাশ করে। এই যে হ-কার, ইহার পর উভয়ের পরস্পর আলিঙ্গনসম্ভূত সমষ্টি অখণ্ডরূপে প্রকাশমান হইয়া পূর্ণ অহংকে জাগাইয়া তোলে। এই যে হ-কার এই ভূমিতে আসিয়াই সংবিৎ প্রাণে পরিণত হয়। কুণ্ডলী-বিজ্ঞান প্রসঙ্গে ইহা আলোচনা করা হইবে। এই যে হ-কার ইহাই জাগতিক দৃষ্টিতে গ্রাহক ও গ্রাহ্যের সংযোজক। যতক্ষণ পর্যন্ত মহাশূন্যের আবির্ভাব হইয়াও হ-কারের আবির্ভাব হয় নাই, ততক্ষণ পর্যন্ত দেহাত্মবোধের উদয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কথাটা বুঝাইয়া বলিতেছি: প্রথমে ধর, 'অ' রূপী প্রকাশ পরিচ্ছিন্ন হইয়া মায়াপ্রমাতা নামে পরিচিত, যাহাকে সাধারণতঃ জীব বলে এবং তন্ত্রে যাহাকে 'পশু' বলে। ইহাতে পূর্ণ অহংয়ের অর্থাৎ পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যশক্তি সংকুচিত হইয়া গিয়াছে, ইহারই নাম আণব মল। এইস্থলে চিদণুরূপী দ্রষ্টা দৃশ্যরূপে কী দেখিতে পায়? মহাশূন্য অর্থাৎ মহাআবরণ বা পর্দা। ইহার পর পরাশক্তির প্রেরণাতে ঐ পর্দাতে প্রতিক্ষণে সংচরণশীল অসংখ্য চিত্র ফুটিয়া উঠে। এই যে চিদণু, ইহা চিত্রগুলিকে দেখিতে পায় তটস্থ বা উদাসীনভাবে ইহার পর ঐ সকল চিত্রের মধ্যে হঠাৎ কোন চিত্রের প্রতি তাহার আকর্ষণ হয়। কেন হয় তাহা সে জানে না, কিন্তু হয়। এই যে আকর্ষণ ইহারই নাম

'প্রাক্ সংবিৎ প্রাণে পরিণতা'—তখন ঐ চিত্র ইদংভাবাপন্ন হইলেও তাহার নিকট অহংরূপে প্রকাশমান হয়—ইহারই নাম দেহাত্মভাব। প্রথম অবস্থায় অণুরূপী মায়াপ্রমাতা দৃশ্যকে তটস্থ দৃষ্টি লইয়া দেখিতে পারে, সেখানে মহা-আবরণের পর্ব রহিয়াছে কারণ একদিকে চিদণু, অপরদিকে মহাশূন্যরূপ আবরণ উভয়ই রহিয়াছে; কিন্তু দেহাত্মবোধ নাই। কিন্তু যখন প্রাণের উদয় হয় তখন ঐ চিত্র দ্রষ্টা-আমির সহিত অভিন্নরূপে প্রতীত হয় অর্থাৎ দেহরূপে প্রতীত হয়। ভবিষ্যতে জানিতে পারা যাইবে ইহাই কারণদেহের বীজ। ইহার পর উহা হইতে স্ফুরণ হইয়া কর্মানুরূপ মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে। এ আলোচনা পরে হইবে। মাতৃগর্ভে প্রবেশ করার পর বর্গশক্তির দ্বারা মাতৃগর্ভে স্থূল দেহ রচনা আরম্ভ হয়।

এইস্থলে আমরা দেখিতে পাইলাম যে অহং দুইপ্রকার—একটি অকৃত্রিম স্বভাবসিদ্ধ অহং, ইহাতে প্রাণ নাই, আণবভাবও নাই, ইহাই পূর্ণ অহং। ইহার সম্মুখে তটস্থরূপে দৃশ্যও নাই, অহংরূপে তাদাত্ম্যযুক্ত দৃশ্যও নাই। আর একটি গ্রাহকরূপী অহং। গ্রাহকরূপী অহং দেহাত্মবোধ সম্পন্ন। তাহার মধ্যে প্রাণের ক্রিয়া হয় এবং তাহাতে দৃশ্যরূপে বাহ্যজগতের অবভাসন হয়। যদি কোন কৌশলে এই গ্রাহকরূপী অহংয়ের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে এই দৃশ্যকে সরাইয়া দেওয়া যায় অথবা যে আশ্রয় বা দেহ অবলম্বন করিয়া তাহার অহংভাব বিকশিত হইয়াছে তাহাকে পৃথক্ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই মুহূর্তেই সেই গ্রাহকরূপী অহং পূর্ণ অহংয়ে প্রবেশ করিবে। কিন্তু তাহা উচিত নহে, কারণ তাহা নির্বাণে লইয়া যাওয়ার আশংকা থাকে। নির্বাণ বা মহানির্বাণ অবস্থা পূর্ণ সত্যেরই দ্যোতক কিন্তু নিজে বল সঞ্চয় না করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে নাই। ঐরূপস্থলে নিজের অহং ঐ মহাসমুদ্রে ডুবিয়া যাইবার আশংকা থাকে। এইজন্যই ঋষিরা বলিতেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—বল বা শক্তি আশ্রয় করিয়া আত্মস্বরূপে প্রবেশ করিলে বুঝিতে পারা যায়—'নির্বাণং পরমং সুখং ততঃ কিং জায়তে ভয়ম্'? এইজন্যই মহাশক্তিকে আশ্রয় করিয়া মহাপ্রকাশে প্রবেশ করিতে হয়, তাহা হইলে পূর্ণ অহংয়ের বিকাশ স্বভাবতঃই ঘটিয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিয়া রাখি—শক্তি আহরণ না করিয়া পূর্ণ প্রবেশের ধৃষ্টতা করা উচিত নহে। কারণ ঐরূপস্থলে নিজের অস্তিত্ববোধ

সংরক্ষণ করা কঠিন হয়। যতক্ষণ মায়িক জগতের বিভিন্ন স্তরে সঞ্চরণ হয় ততক্ষণ ভয় থাকে না। কিন্তু ব্রহ্মে প্রবেশের সময় নিজের অস্তিত্ব লোপের আশংকা ঘটিয়া থাকে। মহাশক্তির কৃপা থাকিলে এইরূপটা হয় না, কারণ মায়ের স্নেহময় ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ণে আরোহণ করিলে ততটা আত্মলোপের আশংকা নাই। এইজন্যই প্রাচীনকালের নিয়ম ছিল মাতৃকার উপাসনা। মাকে আশ্রয় করিয়া তাহারই সাহায্যে পিতার নিকট উপস্থিত হওয়া। প্রাচীন তান্ত্রিকগণ আণব উপায়, শাক্ত উপায় ও শাম্ভব উপায়ের মধ্যে এই গূঢ় রহস্যটি প্রকাশ করিয়াছেন। আণব উপায়ের মূলে চিদণুর ব্যক্তিগত পুরুষকার, ইহা কুণ্ডলিনী জাগরণের পূর্বের অবস্থা। কুণ্ডলিনী জাগ্রত না হইলে নিজের পুরুষকার অবলম্বন করিয়াই নিজের সাধনকার্য নির্বাহ করিতে হয়, কিন্তু ইহা অত্যন্ত কঠিন এবং ইহার পরিণতি পূর্ণ পরিণতি নহে। প্রথম চেষ্টা আত্মশক্তির জাগরণের জন্য হওয়া উচিত। প্রক্রিয়া যাহাই হউক্ তাহা বিকারী নহে। আত্মশক্তির জাগরণই কুণ্ডলিনীচৈতন্য। আত্মশক্তি কুণ্ডলিনীরূপে জাগিয়া উঠিলে ঐ শক্তির প্রবাহ মহাসমুদ্রের দিকে স্বতঃই অগ্রসর হয়। তখন ঐ শক্তির ক্রোড়ে আরূঢ় হইয়া শক্তির ধারায় সঞ্চালিত হইতে হইতে মহাসমুদ্রে পৌছান যায়। অর্থাৎ জাগ্রৎ শক্তি হইতে শিবভাব পর্যন্ত উদয়। এই উপায়ই সংক্ষেপে শাক্ত উপায় নামে পরিচিত। পারিভাষিক জটিলতা এখানে বর্জনীয়। প্রশ্ন হইতে পারে: শক্তি জাগিয়া যখন জীবকে বা সন্তানকে শিবসন্নিধানে পৌছাইয়া দেয় তখন শাক্ত উপায়ের পরে আর অন্য উপায়ের কি সম্ভাবনা আছে? হাঁ, আছে। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সমুদ্রে পৌছিয়া গেলেও যাত্রার অবসান হয় না। শক্তির দ্বারা জীব শিবভাবে পরিণত হয়। জীব তখন আর পূর্বের জীব নহে, সে শিবস্বরূপ। কিন্তু এখানেও শেষ হয় না, কারণ শিবত্ব-লাভ করাই সাধকের কাম্য নহে, সাধকের কাম্য নিজেকে শিবরূপে চিনিতে পারা। শিবত্বলাভ করিয়াও যদি নিজেকে শিবরূপে চিনিতে না পারা যায় তাহা হইলে উহা কখনও বুদ্ধিমান জীবের কাম্য হইতে পারে না। বেদান্তেও একই কথা। সেখানে সপ্ত জ্ঞানভূমির কথা আছে। তাহার জন্য চতুর্থ ভূমি সাক্ষাৎ-কারাত্মক অর্থাৎ ঐ-ভূমিতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। কিন্তু উহাতে জীবন্মুক্তি হয় না। অপরোক্ষরূপে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলেও জীবন্মুক্তি হয় না। উহা গুরুর অনুগ্রহে হইতে পারে এবং নিজের পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যফলেও হইতে

পারে, কিন্তু উহাতে নিজের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। চতুর্থ ভূমিতে অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার, কিন্তু জীবন্মুক্তি আরম্ভ হয় পঞ্চম ভূমি হইতে। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম—ব্রহ্মবিদ্, বরীয়ান্, বরিষ্ঠ। চতুর্থ হইতে পঞ্চমে প্রবেশ কিভাবে এবং কখন হয়, ইহাই প্রশ্ন। যাহাদের ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি হইয়া গিয়াছে উপাসনার দ্বারা তাহারা চতুর্থ ভূমি প্রাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই পঞ্চম ভূমি প্রাপ্ত হয়, কোন ব্যবধান থাকে না। আকাশে সূর্য উদয় হইলে যদি সেখানে মেঘের আধিক্য না থাকে, তাহা হইলে প্রকাশ অনুভূত হয় কিন্তু মেঘ থাকিলে প্রকাশ অনুভূত হয় না। ঠিক সেইপ্রকার ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইলেই যে জীবন্মুক্তি হইবে তাহা নহে, এই স্থূল দেহে ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারের অনুভব হওয়া চাই। সাধারণতঃ এই অনুভব বুদ্ধির দ্বারা হয়। বুদ্ধি প্রাকৃত তত্ত্ব—উহা আবরণে মলিন থাকে। সাধন দ্বারা বুদ্ধির আবরণ অপনীত হইলে পক্ষান্তরে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উদয় হইলে ঐ নির্মল বুদ্ধিতে ঐ সাক্ষাৎকারের প্রতিবিম্ব পতিত হয়। উহারই নাম ব্রহ্মানুভব, তখনই জীবন্মুক্তি হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে আরও অধিক বিশদভাবে এই তত্ত্বটি প্রদর্শন করা হইয়াছে। তদনুসারে জ্ঞান ও অজ্ঞান—উভয়ই দুইপ্রকার। আমাদের বদ্ধভাব অজ্ঞান-বশতঃ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অজ্ঞানের নাম পৌরুষ অজ্ঞান—ইহা পুরুষের স্বরূপগত অজ্ঞান, ইহা সাধনা দ্বারা কখনও দূর হয় না। পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্তির একমাত্র উপায় সদ্‌গুরুর অনুগ্রহ। এই অনুগ্রহের ফলে একক্ষণের মধ্যেই অজ্ঞান সরিয়া যায় কিন্তু অজ্ঞান গেলেও তাহার অনুভব পাওয়া যায় না, কারণ বুদ্ধি মলিন রহিয়াছে। আর এইজন্য বুদ্ধিকে নির্মল করা আবশ্যক। প্রথম স্বরূপে জ্ঞান অর্জন করা, তাহার পর নির্মল বুদ্ধিতে প্রতিবিম্ব রূপে তাহা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৬

মাতৃকা ভিন্ন স্বরূপকে ধরিবার দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। মাতৃকা ভিন্ন পূর্ণ পরমেশ্বরের স্বরূপ, যাহাকে পূর্ণ অহং বলা হয় তাহার অনুভব হয় না। যাহাকে পশু বা জীবের স্বরূপ বলা হয়, তাহার উপলব্ধিও মাতৃকাসাপেক্ষ। এই যে পরিচ্ছিন্ন জীব—ইহার অনন্ত রূপ। পশুরূপী প্রত্যেক আত্মারই বৈশিষ্ট্য আছে। সব আত্মা মূলতঃ একই আত্মা হইলেও প্রত্যেক আত্মার বৈশিষ্ট্য আছে।

ইহা ভারতীয় দর্শন কেন, পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ দর্শনের পরম সম্পদ্—ইহারই নাম individuality, অনেকে ঠিক ঠিক ধরিতে না পারিয়া মনে করেন ইহা কল্পিত কল্পনানিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহা নিবৃত্ত হইয়া যায়। কিন্তু ইহা আর্ষ সিদ্ধান্ত অনুমোদিত নহে, মহাজন অনুভবসিদ্ধ নহে। যাঁহারা বৈশেষিক দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে ঐ সম্প্রদায়ের ঋষিগণ মুক্ত আত্মাতেও 'বিশেষ' পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যেক আত্মাই বিভু, ব্যাপক এবং যাবতীয় গুণ-সম্পন্ন ইহা সত্য, কিন্তু এক আত্মা ঠিক অন্য আত্মার মত নহে। মুক্তির সময় আগন্তুক আবরণটি সরিয়া যায় কিন্তু স্বরূপটি থাকিয়াই যায়। তখন দেখা যায় প্রত্যেক আত্মা ভিন্ন ভিন্ন, আত্মা নিত্য, মনও নিত্য এবং উভয়েতেই 'বিশেষ' আছে। 'বিশেষ' মানে quiddity—ইতরব্যাবর্তক ধর্ম। সংসার অবস্থায় গুণ, ক্রিয়া, দেহ প্রভৃতি সম্বন্ধ দ্বারা পরস্পর ভেদ জানিতে পারা যায় কিন্তু মুক্ত অবস্থায় এসব ভেদ থাকে না। তথাপি স্বরূপগত ভেদ থাকে। বৈশেষিকগণ ইহারই নাম দিয়াছেন 'বিশেষ'। ঠিক এই ভাবের কথা উপনিষদেও আছে এবং ব্রহ্মসূত্রেও আছে। ছান্দোগ্যে আছে—'পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে' অর্থাৎ তখন ব্রহ্মস্বরূপ পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হওয়ার ফলে প্রত্যেক আত্মা নিজ নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। 'সম্পদ্য আবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ' —ব্রহ্মসূত্রেও এই কথাই বলা হইয়াছে।

এই যে পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপ বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে এখানে ভেদ রহিয়া গেল। ইহা ভেদ নহে। প্রাচীন আচার্যগণ বলিয়াছেন—'ভেদাভাবেঽপি ভেদকার্যনির্বাহকো বিশেষঃ'। ইহা প্রাচীনকালের কথা। এই 'বিশেষ' সর্বত্রই অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলার মূলেও ইহাই। এখন মাতৃকাতত্ত্ব এবং তাহাদের সংঘটন বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে মূল উপাদান সত্তা এক থাকিলেও মাতৃকার প্রভাবে তাহাতে বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। দীক্ষার সময় সদ্গুরুকে এইজন্য প্রত্যেক আত্মার স্বরূপ দেখিয়া লইতে হয় এবং এই স্বরূপের প্রকাশ মাতৃকাঘটিত। মাতৃকার অনন্তপ্রকার permutation-combination। আপাতদৃষ্টিতে পঞ্চাশৎ মাতৃকা, কিন্তু মাতৃকার সংখ্যা অনন্ত। এক 'ক'ই অনন্তপ্রকার, এক 'খ'ই অনন্তপ্রকার ইত্যাদি।

একটি রহস্যের কথা এখানে বলা প্রয়োজন মনে হইতেছে। যাহারা যোগ-

শাস্ত্র পড়িয়াছেন তাঁহারা কিছু বুঝিতে পারিবেন। পাতঞ্জল যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে আছে—'সর্বং সর্বাত্মকম্' অর্থাৎ সব জিনিষের মধ্যেই সব জিনিষ আছে কিন্তু সেইখানে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে হইয়াছে যে প্রত্যেকটি বস্তু যদিও অপর প্রত্যেকটি বস্তুর সহিত অভিন্ন তবু তাহার নিজস্ব একটি সত্তা আছে। তাহা কিন্তু নষ্ট হয় না। এইজন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'জাত্যনুচ্ছেদেন সর্বং সর্বাত্মকম্'। জাতির উচ্ছেদ হয় না, অথচ সব জিনিষই সব। যেমন ধর, 'ক'—ইহার মধ্যে গ, ঘ, ল সবই আছে। তদ্রূপ 'খ'—ইহার মধ্যে ক আছে, গ আছে ইত্যাদি। 'জাত্যনুচ্ছেদেন' দ্বারা ইহাই বুঝান হইতেছে যে 'ক'য়ের মধ্যে অন্য সব থাকিলেও 'ক'-এর স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় না। এইজন্য আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন প্রত্যেকে নিজে ইষ্ট দেবতায় সব দেবতার পূজা করিতে পারেন। গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন, যে শ্রদ্ধার সহিত আমার অর্চনা করে আমি তাহা গ্রহণ করি, কিন্তু অন্য দেবতাকেও যদি শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্চনা করে তাহাও আমার নিকট পৌছায়। সুতরাং আসল কথা 'ক'-এর মধ্যে সবই আছে অথচ তাহার নিজ সত্তা নষ্ট হয় না।

এখন পথের পরিচয়। মায়া হইতে যোগমায়ায় গতির কথা। ইহা বিশেষরূপে মনে রাখিতে হইবে যে মায়ারাজ্যে পথ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। মায়ারাজ্য হইতে তথাকথিত যোগমায়ারাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে আদৌ পূর্ণ সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে। জন্ম-জন্মান্তর এবং যুগ-যুগান্তর মায়ারাজ্যে কাটিয়াছে কিন্তু পথ পাওয়া যায় নাই। মায়ারাজ্যের একমাত্র অনুভূতি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি, আবার জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি, পুনঃ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি। মায়ারাজ্য কালের অধীন, তাই কালের আবর্ত মায়ারাজ্যকে কখনই পরিহার করে না। জাগ্রতের পরে স্বপ্নাবস্থার উদয় হয়, স্বপ্ন পরে মনে থাকুক্ বা না থাকুক্, উহা জাগ্রতের পরবর্তী অবস্থা এবং স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তি বা তাহার আভাসপ্রাপ্তি ঘটে। আবর্ত শেষ হইলেই পুনর্বার জাগরণ, পুনঃ স্বপ্ন, পুনঃ সুষুপ্তি। অনাদিকাল হইতে এই আবর্ত চলিতেছে। ইহার পরে পূর্ণ বিশ্বে অন্তঃপ্রবেশ করিলে আমি অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। এই যে আবর্ত-গতি—ইহার সঙ্গে প্রাণ-অপানের অথবা শ্বাস-প্রশ্বাসের সূক্ষ্ম গতি জড়িত রহিয়াছে। মায়ারাজ্য ভেদ করিতে হইলে এমন কিছু শক্তি আবশ্যক যাহা মায়ার রাজ্যে থাকিয়াই মায়ার ঊর্ধ্বে সঞ্চরণ করে। মায়ারাজ্য কালের

অধীন ইহা পূর্বেই বলিয়াছি কিন্তু মায়ার ঊর্ধ্বে বা বাহিরে যে কাল নাই, একথাও সত্য নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে মায়ার ঊর্ধ্বে কাল থাকিলেও সেখানে আবর্ত-গতি নাই—একমাত্র মায়াতেই আবর্ত-গতি। আবর্ত-গতিতে চলিলে লক্ষ বৎসরেও কাল শেষ করা যাইবে না, কারণ কালকে শেষ করিতে সমগ্র মায়ারাজ্যকে ভেদ করিতে হইবে। মায়াতে অবস্থিত থাকিয়া তাহা সম্ভব নহে।

একটি কথা মনে রাখিতে হইবে মায়ারাজ্যে সত্যের যে রূপ দেখা যায় তাহা কল্পনামণ্ডিত। কল্পনাকে বাদ দিয়া নির্বিকল্প সত্য মায়ারাজ্যে থাকিয়া পাইবার উপায় নাই। মায়ারাজ্যে থাকা পর্যন্ত প্রকৃত জ্ঞানীর নিয়ম অনুসারে কালরাজ্যের পর পর স্তর অনুভব করা সম্ভব নহে। ইহার একমাত্র কারণ আবর্ত। এইজন্য প্রকৃত সদ্‌গুরু দীক্ষাকালে বীজমন্ত্র অর্পণের সময় সাধকের আধার অনুসারে কিঞ্চিৎ পরিমাণে মায়াকে ভাঙিয়া দেন। ইহা অত্যন্ত রহস্যময়। সাধারণ লোকে ইহা বুঝিতে পারে না। এই ভাঙিবার ফলে বক্র-গতি অস্ত হইয়া সরল গতির আভাস ফুটিয়া উঠে। তারপর ঐ সরল গতি ধরিয়া ক্রমশঃ কালরাজ্য এবং মনোরাজ্য উভয়ই ভেদ করা যায়। কিন্তু কালরাজ্যে অবস্থিত থাকিলে এই সরল মার্গে ঊর্ধ্বগতির সুবিধাটুকু পাওয়া যায় না।

কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি—যাঁহারা ফটোগ্রাফ বিজ্ঞান জানেন ও ফটোগ্রাফ তুলিতে অভ্যস্ত তাঁহারা অবগত আছেন photo lens দ্বারা অর্থাৎ দর্পণের দ্বারা বাহ্য জগতের চিত্র গ্রহণ করা যায় কিন্তু সাধারণ photographic যন্ত্র অতি সুনিপুণভাবে গঠিত না হওয়ার দরুণ এই বাহ্য-জগতের উন্মুখীকরণ (exposure) কিঞ্চিৎ কালের জন্য করিয়া দেওয়া সম্ভবপর বটে কিন্তু ইচ্ছানুরূপ সূক্ষ্ম করা যায় না। কারণ অল্প মূল্যের camera-তে instantaneous snap-shot-এর সম্ভাবনা খুব কম থাকে, কারণ উহার lens বা দর্পণ শক্তিশালী নহে। যতটুকু সময় exposure দেওয়া হয় অর্থাৎ ঐ দর্পণ বহির্মুখে খোলা থাকে ঠিক ততটুকু সময়ই দর্পণে প্রতিবিম্ব গ্রহণের সম্ভাবনা। বাহ্য বস্তু তীব্র গতিশীল হইলে ভাল camera ব্যতীত সাধারণ camera-তে ঠিক exposure হয় না। ঠিক সেইপ্রকার আমাদের মন ও ইন্দ্রিয় বাহ্য ভাবজগৎকে অনুভব করে বটে কিন্তু একটু বেশী সময় না পাইলে প্রতিবিম্ব গ্রহণ সঠিকভাবে হইতে পারে না। গতিশীল বস্তুর গতির মাত্রা

অনুসারে গতিকে চিত্রিত করিবার যন্ত্র আবশ্যক। গতি তীব্রবেগসম্পন্ন হইলে ঐ সাধারণ যন্ত্র উহাকে মোটেই গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু যে সব camera-তে lens power খুব অধিক আছে বা থাকে তাহাদের পক্ষে এই দ্রুত গতি গ্রহণ তত কঠিন নহে। ইহা সাধারণ সকলেরই পরিজ্ঞাত বিষয়।

মায়া ও যোগমায়ার রাজ্যের ব্যাপারও ঠিক এইরূপ। এইজন্য সদ্‌গুরু শিষ্যকে শক্তিশালী বীজরূপ তীব্রবেগসম্পন্ন যন্ত্র প্রদান করেন। উহা এত তীব্র যে মায়িক জগতের কোনো তীব্রতাকেই উহা স্বীকার করে না। এইটি বুঝিতে পারিলেই অর্ধমাত্রার তত্ত্ব বুঝিতে পারা যাইবে। দুর্গাসপ্তশতীতে অর্ধমাত্রার কথা এবং তন্ত্রেও বহুস্থানে আছে। কিন্তু সাধারণ লোকে উহার তাৎপর্য বুঝিতে পারে না। অর্ধমাত্রাকে আশ্রয় করিয়া যোগীকে উর্ধ্বে গতিশীল হইতে হইবে। অর্ধমাত্রার সাহায্য না পাইলে যোগীর এমন কোনো ক্ষমতা নাই যে মায়ারাজ্য ভেদ করিতে পারে।

তন্ত্রে এই বস্তুটিকে বিন্দুরূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে। অর্ধমাত্রা বিন্দুরই বেগের মাত্রা। মায়িক জগতে উহার সম্ভাবনা নাই এবং অর্ধমাত্রার সাহায্য না পাইলে জীব কখনই জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপ কালের আবর্ত ভেদ করিয়া গতির সরল বেগ গ্রহণ করিতে পারে না। যাঁহারা তান্ত্রিক বিজ্ঞান অবগত আছেন তাঁহারা জানেন যে বিন্দু হইতে পরমপদ পর্যন্ত যে কয়েকটি স্থান (station) আছে, সর্বত্রই অর্ধমাত্রা বা উহারই কোনো না কোনো অংশ কার্যকর হইয়া থাকে। বিন্দুর নামান্তর মহামায়া। এইখানে দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সাধক মায়ারাজ্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রবিষ্ট হয়। এইখানে প্রবিষ্ট হইলেই বিনা চেষ্টায় সরল গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ঐ সরল গতিতে তৃপ্ত না থাকিয়া উহাকে আরও অধিকতর সরল করা আবশ্যক হয়। অর্থাৎ বিন্দুরাজ্যে গতির বেগ যদি অর্ধমাত্রা হয় তাহা হইলে তাহার পরবর্তী প্রত্যেকটি station-এ অর্ধ অর্ধ হিসাবে কম হইয়া যাইবে—অর্থাৎ বিন্দুতে অর্ধমাত্রা, তাহার পর $\frac{১}{৪}$ মাত্রা, তাহার পর $\frac{১}{৮}$ মাত্রা ইত্যাদি। বিন্দুর উপরে এইসকল স্তর বিন্দু হইতে সূক্ষ্মতর। এইরূপ ক্রমিক সূক্ষ্মতা বাস্তবিক পক্ষে অনন্ত হইতে পারে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহা হয় না। প্রাচীন যোগিগণের অনুভব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে উহার সূক্ষ্মতম মাত্রা হয় $\frac{১}{২৫৬}$ অথবা $\frac{১}{৫১২}$, ইহা মনে রাখিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য ইহা নহে যে উহা অপেক্ষা

অধিকতর সূক্ষ্ম হইতে পারে না। সিদ্ধান্ত অনুসারে সূক্ষ্মতা অনন্ত দূর পর্যন্ত ব্যাপক কিন্তু কার্যতঃ তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। কার্যতঃ ১/২৫৬ অথবা ১/৫১২ সূক্ষ্মতার চরম মাত্রা মনে হয়। মন কালের সূক্ষ্মতার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংও অত্যন্ত সূক্ষ্মতালাভ করে। তদনুসারে উহার দৃশ্য বিশ্ব তদনুরূপ সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। ব্যবহারভূমিতে ঐ তথাকথিত চরম সূক্ষ্ম স্থানেই যোগীকে মন বর্জন করিতে হয়। তখন মনোনিবৃত্তির অবস্থা উদয় হয়। মনকে এইপ্রকারে পরিহার করা যোগীর নিজ ইচ্ছার বশে ঘটিয়া থাকে।

বিন্দু হইতে যে সব স্তর ভেদ করিতে হয় তাহা বলিতেছি। ইহা হইতেই বিশ্বভেদের পরিচয় পাঠক প্রাপ্ত হইবেন। ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম স্তরের দিকে গতি চলে—প্রথমে বিন্দু, এখানেই যোগী নিজের স্বাতন্ত্র্যবলে শিষ্যকে আকর্ষণ করিয়া বসাইয়া দেন। তাহার পর সে জপ-বিজ্ঞান বা ধ্যান-বিজ্ঞান দ্বারা এই মাত্রাকে অধিকতর সূক্ষ্ম করিতে থাকে। এইসব স্তরের নাম সংক্ষেপে—বিন্দু, অর্ধচন্দ্র, নিরোধিকা, নাদ, নাদান্ত, শক্তি, ব্যাপিনী, সমনা—এই পর্যন্ত মনোরাজ্যময় বিশ্ব। সৃষ্টির গতি ইহাকে ভেদ করিতে পারে না। যোগীকে সমনা স্থানে আসিয়া প্রতীক্ষা করিতে হয়। বিশ্বের যাবতীয় বন্ধন ও পাশ— এই সমনা ভূমি পর্যন্ত। ইহার পর আর কোনোপ্রকার অশান্তি নাই। কিন্তু যোগী ইচ্ছামাত্র এই স্থান ভেদ করিতে সমর্থ হয় না। বিশ্ব কুণ্ডলিনীর স্থানও এইখানেই। প্রকৃত শান্তির রাজ্য ইহার পরে।

তিনপ্রকার কৈবল্য অবস্থা আছে, তাহার পর আছে উন্মনী। এই তিন-প্রকার কৈবল্য জড় হইতে পূর্ণ বিশ্লেষকে লক্ষ্য করিয়া সংগঠিত হয়। জড়ের প্রথম স্থূলতমরূপ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা গুণত্রয়, তাহার পর মায়া, তাহার পর মহামায়া অথবা বিন্দু। মহামায়া হইতে আত্মা মুক্ত হইলে সেই সাধক শ্রেষ্ঠতম কৈবল্য লাভ করিল বলা চলে। তখন উহারও আত্মা জড়ের সূক্ষ্মতম কণা হইতেও বিমুক্ত—কিন্তু ইহা পূর্ণত্ব নহে। পূর্ণত্ব উন্মনী অবস্থায় ঘটিয়া থাকে। পূর্ণত্বে পরিপূর্ণ চৈতন্যের বিকাশ থাকে, কৈবল্যে তাহা মোটেই থাকে না। পূর্ণত্বে যাইবার কোনো পথ নাই। যোগী যখন ভগবদনুগ্রহের অধিকারী হ'ন তখন এই মনোরাজ্যের প্রান্তে আসিয়া প্রতীক্ষা করেন। ইহার পর অধিকারী পুরুষের জন্য পরমশিব হইতে উন্মনী শক্তি নামিয়া আসে। ঐ উন্মনী শক্তি যোগীর সত্তাকে সঙ্গে নিয়া পরমশিবে উপনীত হয়। উপনীত হইয়া

যোগীর পরমশিবত্ব সম্পাদন করে এবং স্বয়ং অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহাই যোগীর বা সাধকের পরমশিবত্ব লাভের ক্রম।

এই যে উন্মনাপদ ইহাই আত্মার নিত্য ও পরম স্থান। এই স্থানে শিবভাব আছে, শক্তিভাবও আছে কিন্তু উভয়েই অভিন্ন। আগমবিদ্‌গণ বলেন, ছত্রিশ-তত্ত্বের মধ্যে সকলের উপরে শিব-শক্তি নামে যে দুইটি তত্ত্ব রহিয়াছে তাহা এখানে আসিয়া এক হইয়া যায় এবং যোগী স্বয়ংই সেই অবস্থায় বিরাজ করেন। ইহাকেই পরমশিব, পরাশক্তি বা পরাসংবিৎ বলে। এখানে শিব-শক্তির ভেদ নাই। যদিও শিবও চিদ্রূপ এবং শক্তিও চিদ্রূপ তথাপি উভয়ের মিলন না হইলে পূর্ণত্ব সিদ্ধ হয় না। এই স্থানটি নিষ্কল পদ। শুদ্ধ শিব বিশ্বের শীর্ষস্থানে আছেন কিন্তু তিনি পূর্ণ নহেন। তাঁহারও অভাব আছে কারণ তিনি শক্তিহীন। তিনি বোধস্বরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু স্বাতন্ত্র্যহীন। সেইপ্রকার বিশ্বের শীর্ষদেশে যে শক্তি আছেন তিনি জগতের উপরে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি কিন্তু তাঁহাতেও পূর্ণতা নাই কারণ তাঁহাতে শিবভাবের যোগ নাই বলিয়া তাঁহাতে অপূর্ণতা রহিয়াছে। তিনি জড়শক্তি ব্যতীত অপর কিছু নহেন। যখন এই উভয়ের সংযোগ হয় এবং সংযোগের ফলে দুইটি এক হইয়া প্রকাশ হয় তখন তাহাই অদ্বৈততত্ত্ব। তাহাকে শিব বলিতে চাও পরমশিব বল, শক্তি বলিতে চাও পরাশক্তি বল। সেখানে স্বাতন্ত্র্য আছে, উহাই নিষ্কল। শিব নিষ্কল নহেন। তাঁহাতে শান্ত্যতীত কলা আছে, শক্তিও নিষ্কল নহেন তাঁহাতে শান্তিকলা আছে। কিন্তু তাঁহারা পূর্ণ নহেন, কারণ একের মধ্যে দ্বিতীয়ের অভাব রহিয়াছে। শিব নিষ্ক্রিয় ইহা সত্য এবং শক্তি নিত্য স্পন্দময়ী ইহাও সত্য—উভয় মিলিত হইলে যে বস্তুটি হয় তাহাকেই পূর্ণ বলে। ব্যবহার ভূমিতে তাহার নাম ভগবান্ অথবা ভগবতী। মনে রাখিতে হইবে ইহা ব্রহ্মস্বরূপই অথচ ব্রহ্ম নহেন। কারণ ব্রহ্মে স্বাতন্ত্র্য নাই, এখানে স্বাতন্ত্র্য আছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন মায়ার অন্তর্গতরূপে সমগ্র বিশ্বের প্রকাশ হয়। জীবের অবস্থাগুলি, যাহাকে আমরা তাহার আধ্যাত্মিক সম্পদ্ বলিয়া মনে করিতে পারি, সবই এই মায়ারাজ্যে ফুটিয়া উঠে। বিশেষজ্ঞগণ আপাততঃ মায়াকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তত্ত্ব-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। মায়ার প্রথমার্ধে অজ্ঞানী জীব সঞ্চরণ করে, দ্বিতীয়ার্ধে জ্ঞানপ্রাপ্তির পর জ্ঞানী জীবের সঞ্চরণ সম্ভবপর হয়। মায়ার এই দ্বিতীয়ার্ধকে কেহ কেহ বুঝিবার সুবিধার জন্য

যোগমায়া বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। কালের গতি উভয়ত্র একপ্রকার নহে। জীবের অজ্ঞান অবস্থায় কালের আবর্ত-গতি নষ্ট হয় না। এইজন্য জাগ্রৎ-স্বপ্ন ও সুষুপ্তির আবর্তন নিরন্তর ঘটিতে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাস অথবা প্রাণ-অপানের ক্রিয়াও পূর্ববৎ চলিতে থাকে। মনের সত্তা মায়ার প্রথমার্ধেও থাকে, দ্বিতীয়ার্ধেও থাকে কিন্তু প্রকারভেদ আছে। মায়ার প্রথমার্ধে আবর্তনের ক্রিয়া থাকে বলিয়া ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও স্থূল অথবা সূক্ষ্মভাবে তাহার সহিত জড়িত থাকে। মনের ক্রিয়া তাহার সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত থাকে। জাগ্রতের পর স্বপ্ন এবং স্বপ্নের পর সুষুপ্তি—এই তিনের মধ্যে মন সঞ্চরণ করে। জাগ্রৎ অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে এবং মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ সর্বদাই বিদ্যমান থাকে, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের ক্রিয়াও থাকে—ইহাই সাধারণ অবস্থা। স্বপ্ন অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের বহির্মুখ ক্রিয়া থাকে না বটে কিন্তু অন্তর্মুখ ক্রিয়া থাকে। বহির্মুখ ক্রিয়া না থাকার দরুণ বাহ্য ভৌতিক জগৎ ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে ভাসে না, কিন্তু তাহার সংস্কার ক্রিয়াশীল থাকে বলিয়া স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া অন্তর্মুখে চলিতে থাকে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের ক্রিয়াও থাকে। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের বহির্মুখ ক্রিয়া তো থাকেই না, অন্তর্মুখ ক্রিয়াও থাকে না। মন তখন নিষ্ক্রিয় অজ্ঞান অবস্থায় হৃদয়কোষে নিবদ্ধ থাকে। কেহ কেহ বলেন পুরীতত নাড়ীর মধ্যে মন নিষ্ক্রিয়ভাবে বিদ্যমান থাকে। এইটি অজ্ঞানের অবস্থা। এই অবস্থায় সংস্কারের উদ্দীপন হয় না এবং কোনোপ্রকারে মনের জাগৃতিও ঘটে না। এই পর্যন্ত অজ্ঞান রাজ্যের সীমা। বলা বাহুল্য, ইহা কালের অন্তর্গত। যে-কাল আবর্তশীল তাহা নিরন্তর এখানেও কার্য করিয়া থাকে। তাই মনকে কিছু সময় বিশ্রামলাভের পর পুনরায় বহির্মুখে ধাবিত হইয়া ইন্দ্রিয়ের সহিত যোগ দিতে হয়। সুষুপ্তি অবস্থায় কোনপ্রকার নাড়ির ক্রিয়া থাকে না যাহার প্রভাবে মনের সঞ্চার সম্ভবপর হইতে পারে। মনের সঞ্চারের জন্য মনোবহা নাড়ী নির্দিষ্ট আছে। সুষুপ্তি অবস্থায় এইসকল নাড়ী নিষ্ক্রিয় থাকে, তাই মনের কোন ক্রিয়া হয় না। তাই বাহ্য মনের প্রভাবে প্রভাবিত জ্ঞানের উদয়ও হয় না। এইজন্য সুষুপ্তিকে অজ্ঞানের অবস্থা বলা হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই সুষুপ্তিই মনের জাগ্রত হইবার একমাত্র স্থান। সদ্‌গুরুর কৃপার প্রভাবে এই সুষুপ্তির মধ্যেই মনে শক্তির সঞ্চার হয়। ইহারই নাম মনের ত্রাণ, তখন মনের উদ্ধার হয় অর্থাৎ ঊর্ধ্বগতি আরম্ভ হয়। এই ঊর্ধ্বগতির বেগ সঞ্চারিত

আত্মশক্তির তীব্রতার উপর নির্ভর করে। তখন হৃদয় হইতে জাগ্রত হইয়া মন ঊর্ধ্ব দিকে অর্থাৎ দ্বাদশান্তের দিকে সঞ্চরণ করিতে থাকে। এই ঊর্ধ্ব সঞ্চারের ফলেই তুরীয় অবস্থার উদয় হয়।

মন জাগিয়া উঠিলে উহারই নাম হয় যথার্থ মন্ত্র। অর্থাৎ মন তখন চিৎশক্তি-রূপে পরিণত হয়, তবে আংশিকভাবে ক্রমশঃ। এই ঊর্ধ্বগামী মন ঊর্ধ্বে গমন করে, আবার ফিরিয়া আসে। হৃদয়ে আসিয়া অস্তগত হয়। সূর্যের যেমন উদয়াস্ত, এইভাবে তখন মনেরও উদয়াস্ত ঘটে। ইহার বিস্তারিত বিশ্লেষণ তান্ত্রিক যোগশাস্ত্রে পাওয়া যাইতে পারে।

এই যে তুরীয় অবস্থা এইটি মনের অর্থাৎ জাগ্রৎ বা চিদ্‌ভাবাপন্ন মনের ঊর্ধ্ব-গতির অবস্থা। এই অবস্থায় সূর্যের উদয়াস্তের ন্যায় এই জাগ্রৎ মনেরও উদয়াস্ত থাকে। তাই একবার হৃদয় হইতে ঊর্ধ্বে দ্বাদশান্ত পর্যন্ত ছত্রিশ আঙুলি ঊর্ধ্ব-গতি হয়। আবার দ্বাদশান্ত হইতে হৃদয় পর্যন্ত অধোগতি হয়। ইহার অনেক রহস্য আছে। কালচক্রতন্ত্রে ইহার তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। এই জাগ্রৎ মনের অধঃ-ঊর্ধ্বগতি সরল মার্গে ঘটিয়া থাকে। এইখানে আর আবর্তগতি নাই। কিন্তু ইহা একেবারে স্থায়ী হয় না, ধীরে ধীরে অভ্যাস করিতে হয়। কারণ একবার গতি ঊর্ধ্বমুখে ঘটিয়া থাকে, তারপর উহা যথাস্থানে নামিয়া আসে। এইপ্রকার পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে স্থিতি ক্রমশঃ ঊর্ধ্ব দিকে ঘটিয়া থাকে।

আমরা যে জগৎ অনুভব করি—অবশ্য জাগ্রৎ অবস্থায় এবং আনুষঙ্গিকভাবে স্বপ্নেও—তাহা কালের আবর্ত-গতির অন্তর্গত। কালের আবর্ত-গতি এক হিসাবে দেখিতে গেলে অন্তহীন। তাই জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির ক্রমিক আবর্তও অন্তহীন। তান্ত্রিক যোগিগণ অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। তাঁহারা এই আবর্ত-গতির মধ্যে সাধনাকে ফেলিয়া রাখেন নাই। আবর্ত-গতিতে সাধক একবার নাগরদোলার মত ঊর্ধ্বে উত্থিত হয় আবার অধোদিকে নিপতিত হয়—বাস্তবিক উন্নতি কিছুই হয় না। কারণ উহা দ্বারা কালভেদ করা যায় না। সংসারচক্র অনাদি কাল হইতে এই আবর্তের মধ্যে চলিতেছে। এই চক্রের মধ্যে অবস্থিত হইয়া সাধনার প্রভাবে উন্নতিলাভ করার বিশেষ কোনো মূল্য নাই, কারণ আবর্তের প্রভাবে যতই ঊর্ধ্বগতি হউক্ পুনরায় অধোগতি অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য শুধু সাধনাতে আত্যন্তিক পরিশ্রম থাকিলেও স্থায়ী ফললাভ হয় না। সম্ভবপর হইলে সাধককে আবর্ত-গতি হইতে সরাইয়া সরল মার্গে বসাইয়া

সাধনায় প্রবৃত্ত করিতে হয়। তাহা হইলে সরল মার্গে থাকিয়া যে যতটা উন্নতি করিবে, সে ততটাই স্থায়ীভাবেই সম্পন্ন করিতে পারিবে। আবর্ত নাই বলিয়া পড়িয়া যাইবার কোনো আশঙ্কা নাই। প্রাচীন তান্ত্রিক যোগিগণ অর্ধমাত্রার মহাবিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই বিজ্ঞানের বলে সরল গতিকে আশ্রয় করিয়া ক্রমোন্নতির ব্যবস্থা আছে। সর্বপ্রথম, কালের মাত্রা হইতে এই অর্ধমাত্রার ধারার সঙ্গে যোজনা করিয়া দেওয়া সদ্‌গুরুর কর্তব্য। অর্ধমাত্রা যেখান হইতে আরম্ভ হয় বুঝিতে হইবে সেখান হইতেই সরল গতির প্রারম্ভ।

৭

কালের রাজ্যে লোক-লোকান্তর ভাসিতেছে। উহা মায়িক সত্তার পক্ষে যেমন সত্য তেমনি অমায়িক বা যোগমায়িক সত্তার পক্ষেও সত্য। তবে কালের অর্ধমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত না হইয়া দেশ ও কালরূপে জগতের যে স্বরূপ অনুভব করা যায়, তাহা নিরন্তর আবর্তশীল বলিয়া যোগী সাধকের পক্ষে ধারণার যোগ্য নহে। এইজন্য সর্বপ্রথমে যোগীর বিন্দুতে প্রবেশ আবশ্যক। বিন্দুতে প্রবিষ্ট না হইলে সরল মার্গে প্রবেশ করা সম্ভবপর নহে। বিন্দু সম্বন্ধে বহু কথা পরে বলা হইবে, এখানে শুধু দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হইল।

এই বিন্দুর স্বাভাবিক মাত্রা অর্ধ। এইখান হইতে সরল মার্গের প্রারম্ভ হইয়াছে এবং ইহাই যোগমার্গ। এই মার্গে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ ঊর্ধ্বগমন করিতে করিতে কালের সূক্ষ্মতম পরমাণু পর্যন্ত পৌঁছান যায়। উপায় একমাত্র অর্ধমাত্রা অবলম্বন। এই অর্ধমাত্রার একটি রহস্য আছে। বিন্দুপ্রাপ্তি একাগ্রতার ফলস্বরূপ। আমরা ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া আজ্ঞাচক্রের যে বিন্দুর সন্ধান পাই, ইহা সেই বিন্দুই তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত বিশ্ব ঐ বিন্দুতে একপ্রকার সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বিন্দুর পর উঠিতে হইলে অর্ধমাত্রা ক্রম অবলম্বন করিয়া মহাবিন্দু পর্যন্ত উত্থিত হওয়া আবশ্যক। বিন্দু হইতে মহাবিন্দু—ইহারই নাম সরলমার্গ। কালের কুটিলপথে যেমন ভৌতিক রাজ্য ও কল্পনার জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে, তেমনি কালের এই সরল মার্গেও বিরাট বিশ্ব বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা কালের রাজ্যে থাকিয়া দর্শন করা সম্ভবপর নহে। অর্ধমাত্রা সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। যদি কেহ এই প্রবাদের তথ্য অনুসন্ধান করেন তাহা হইলে তিনি উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই।

প্রশ্নটি এই : বিশ্ব সান্ত কি অনন্ত ? বিশ্ব সান্ত ইহাও সত্য, তেমনি বিশ্ব অনন্ত ইহাও তদ্রূপই সত্য। প্রবাদের এই রহস্যটি বুঝিতে পারিলে অনেক গভীর তত্ত্ব সহজেই ধারণায় আসিবে। অতি প্রাচীনকালে আমাদের দার্শনিক-মণ্ডলীর মধ্যে, বিশেষতঃ তার্কিকদের সহিত বিচার-প্রসঙ্গে পরমাণু তত্ত্ব লইয়া বিচার উঠিয়াছিল। দার্শনিকগণ (তার্কিকগণ) বলেন যে বাহ্যসত্তা বিশ্লেষণ করিতে করিতে—অবশ্য বিচারের দ্বারা—যেখানে যাইয়া আর বিশ্লেষণ সম্ভবপর হয় না, সেইখানেই বিশ্রাম নিতে হয়। একটিই পরমাণু কল্পনার মূল স্থান অর্থাৎ যাহার পর আর বিশ্লেষণ সম্ভবপর নহে, তাহাই পরম অণু। পরমাণুর মাত্রার তারতম্য অনুসারে বস্তুর স্থূলত্ব নির্ভর করে। যাঁহারা পদার্থের অনন্ত বিভাজ্যতা স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন প্রত্যেক সত্তাতেই অনন্ত পরমাণু রহিয়াছে। সুতরাং এই বিভাগ-প্রক্রিয়ার অবসান কোনো স্থানে সম্ভবপর নহে। অপর পক্ষ বলেন, অবসান স্বীকার না করিলে মেরু ও সর্ষপ সমপরিমাণ হইয়া যায়। এইজন্য অবসান স্বীকার করা আবশ্যক ইত্যাদি। প্রাচীন দর্শনের সর্বত্রই এইপ্রকার বিচার রহিয়াছে। আমাদের মনোবিজ্ঞানের ভিতরও এই রহস্য রহিয়াছে। একহিসাবে, মনের বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গেই দৃশ্য জগতের সূক্ষ্মতার অনুভব ঘটিয়া থাকে। আর মনকে বিশ্লেষণ না করিয়া যদি প্রথমেই পরিহার করা যায়, তাহা হইলে বিশ্ব প্রথম হইতেই শূন্য হইয়া যায়। একমাত্র পূর্ণ সত্যই তখন থাকে।

অর্ধমাত্রার বিষয়ে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য এই যে ক্রমশঃ সরল গতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মাত্রা সূক্ষ্ম হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ এই সূক্ষ্মতা অর্ধমাত্রা প্রভৃতিরূপে বিভক্ত হইয়া থাকে। যেমন বিন্দুস্থানে অর্ধমাত্রা কিন্তু অর্ধচন্দ্র স্থলে $\frac{1}{8}$ অংশ মাত্রা এবং নিরোধিকা স্থলে উহারও অর্ধেক। এইভাবে ক্রমশঃ মাত্রার বিভাগ হইতে হইতে ক্রমশঃ কালের ক্ষীণতম মাত্রা পর্যন্ত উপনীত হইতে হয়। কালের ক্ষীণতম মাত্রাকে তান্ত্রিকগণ কালের পরমাণু বলেন। ইহার পারিভাষিক নাম 'লব'। এইজন্য লবই কালিক বিভাগের ঊর্ধ্বগতির চরম সীমা মানা হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহা চরম সীমা নহে, কারণ যোগীর মানসিক সামর্থ্যের উপর এই চরমত্ব নির্ভর করে। যদি কোনো যোগী এই সীমা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হ'ন তাহা হইলে তাঁহার নিকট বিশ্বের চিত্র অধিকতর সূক্ষ্মরূপে থাকিয়াই যায়। কিন্তু তান্ত্রিক শাস্ত্রের

প্রাচীনতম বিবরণ বা record হইতে জানিতে পারা যায় যে ৫১২ মাত্রাই মাত্রাবিভাগের চরম সীমা, কারণ এ পর্যন্ত কোনো যোগীকে মাত্রা-বিভাগ প্রক্রিয়া ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্মরূপে করিতে দেখা যায় নাই। কিন্তু ইহার তাৎপর্য ইহা নয় যে মাত্রার সূক্ষ্মতা ইহা আপেক্ষা অধিক সম্ভব নয়। যেখানে কার্যক্ষেত্রে চরম সূক্ষ্মতা স্বীকৃত হইবে সেইখানেই কালের পরমাণু বা লবও স্বীকৃত হইবে। যাহাকে বিন্দুপ্রাপ্তি বলা হয় তাহা ষট্‌চক্র-ভেদের পরে ঘটিয়া থাকে। তাহার পর যে বিভাগ এই বিভাগের ফলে ক্রমশঃ কালের মাত্রা ক্ষীণ হইয়া যায় এবং তদনুসারে মায়ার মাত্রাও অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হয় এবং তাহার ফলে সত্যের জ্যোতিঃ অধিকতররূপে মলিনতা পরিহার করে। এই যে জগৎ ইহারই নাম মহামায়ার জগৎ। কালের আবর্তসম্পন্ন যে জগৎ ত্যাগ করিয়া এই জগতে প্রবেশ করা হইয়াছে তাহার নাম মায়াজগৎ। মায়াজগৎ অজ্ঞানীর কর্ম ও ভোগের স্থান—স্বর্গ, মর্ত্য, নরক প্রভৃতি অনন্তসংখ্যক লোক-লোকান্তর এই মায়িক রাজ্যে বিদ্যমান। এইখানে কাল আবর্তরূপে ক্রিয়া করিয়া থাকে অর্থাৎ একবার বামাবর্তে, পুনর্বার দক্ষিণাবর্তে, এবং দক্ষিণাবর্ত হইতে পুনঃ বামাবর্তে। ইহারই নাম অজ্ঞানীর জগৎ। সুষুম্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত ইহার অবসান ঘটে না। জীবন-মৃত্যু ইহারই অন্তর্গত। মৃত্যুর পরবর্তী নবীন জীবন ইহারই অন্তর্গত। সর্বত্রই এই আবর্তময় কালের খেলা বিদ্যমান রহিয়াছে অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিনটি লইয়া এই জগৎ গঠিত। কেহ সুদীর্ঘকাল স্বর্গে বাস করিতে পারেন, তদ্রূপ অধোলোকেও থাকিতে পারেন কিন্তু থাকিবেন কালের আবর্তেই। এই আবর্ত হইতে উদ্ধার করিবার একমাত্র সহায়ক সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরু যথানির্দেশ দীক্ষাশক্তি দ্বারা জীবাত্মাকে জ্ঞানবীজ দান করিয়া অর্থাৎ শুদ্ধ বিদ্যাদান করিয়া এই আবর্ত হইতে উদ্ধার করেন। নিজের তপস্যা, সাধনা, যম-নিয়ম প্রভৃতি কোনো উপায়ই ইহাকে অর্থাৎ অর্ধমাত্রারূপ কালকে ভেদ করিতে সমর্থ হয় না। ইহার ভেদক একমাত্র ভগবানের অনুগ্রহ শক্তি, যাহার অপর নাম শুদ্ধবিদ্যা। এই শুদ্ধবিদ্যা অন্যান্য শাস্ত্রের দিব্যজ্ঞানের সহিত তুলনীয় নহে, কারণ ইহা আত্মাতে প্রবিষ্ট হইলে অজ্ঞানকে নাশ করিয়া দেয় এবং জীবের অহন্তাকে জাগাইয়া তোলে।

এই অহন্তার পূর্ণ জাগরণের নামই পরমশিবত্ব লাভ। এই জাগরণের ক্রম আছে, সেইগুলিকে যোগ অথবা পরমজ্ঞানের জাগরণের ক্রম বা ভূমি বলা

যাইতে পারে। একেকটি ভূমি হইতে তাহার উর্ধ্ববর্তী ভূমিতে কালের মাত্রা সূক্ষ্মতর—সেইজন্য এখানকার জ্ঞান অহন্তারূপে এক হইলেও অধিকতর সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। এই যে ক্রম ইহাকে অনুসরণ করিতে কাল ক্রমশঃ লবরূপে পরিণত হয়। অবশ্য ইহা বিশিষ্ট যোগীর পক্ষে—কারণ প্রত্যেক যোগীর সামর্থ্য অনুসারে ইহা নির্ণীত হইয়া থাকে। এইখানেই মহামায়ার সংসারও অস্তমিত হইয়া যায়। মায়ার সংসার অস্তমিত হয় বিন্দুপ্রাপ্তির প্রভাবে, সদ্‌গুরুর কৃপাতে। এই পর্যন্ত সরলগতি যোগী জীবের পুরুষকার কিন্তু কালের পরমাণু পর্যন্ত পৌছিয়া গেলেই যোগী জীবের পুরুষকারও সমাপ্ত হইয়া যায়। ইহা যদিও খুব উচ্চ অবস্থা কারণ এখানে মায়ার ক্রিয়া এবং যোগমায়ার ক্রিয়া পরম উজ্জলভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে তথাপি ইহা পূর্ণত্বের দ্যোতক নহে। কারণ, এইস্থানেও অতি ক্ষীণতমভাবে হইলেও মনের ক্রিয়া থাকে। ইহার পরে ঐ ক্রিয়ার অর্পণ হইয়া যায়। অর্পণ হইয়া গেলেই যোগমায়ার রাজ্যেরও ভেদ হইয়া গেল জানিতে হইবে। অশুদ্ধ মায়ারাজ্য আবর্তময় কাল-লঙ্ঘনের সঙ্গে সঙ্গেই পরিত্যক্ত হয়। তাহার পর শুদ্ধমায়ারাজ্য আরম্ভ হয়—ইহাকেই তান্ত্রিকগণ মহামায়া বলেন। পরমশিব এখনও অনেক দূরে। বর্তমান নিবন্ধে এই শুদ্ধমায়াকেই যোগমায়া বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা বিন্দুর বিকাশের ফল। পরমশিব স্থান ইহারও অনেক উর্ধ্বে, উহাকে মহাবিন্দু বলে।

মনে রাখিতে হইবে, কৈবল্য-প্রাপ্ত আত্মা তিনভাগে বিভক্ত। অচিৎ অথবা জড় যখন স্থূলভাবাপন্ন তাহার নাম ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। যখন উহা সূক্ষ্মভাবাপন্ন তখন উহার নাম মায়া—ইহা প্রকৃতি হইতে কিঞ্চিৎ অধিকতর শুদ্ধ, কিন্তু একান্ত শুদ্ধ নহে। এই মায়াজগৎ পর্যন্ত সংসার। এই মায়ার উর্ধ্বে মহামায়া বা শুদ্ধমায়া বিদ্যমান রহিয়াছে। উহা জড় হইলেও অত্যন্ত শুদ্ধ—উহাকেই বিন্দু বলে। এই বিন্দুর দেহ বৈন্দব দেহ। ইহাও শ্রেষ্ঠতম কৈবল্যে থাকে না, কিন্তু আত্মা এতদূর পর্যন্ত কেবলী হইয়াও এবং নিজের পূর্ণ শুদ্ধিলাভ করিয়াও একেবারে নির্মল হইতে পারে না। আত্মার যথার্থ স্বরূপ শিবত্বময়। ঐ শিবত্ব পরমশিবভাব ব্যতীত অন্য কিছু নহে। শ্রেষ্ঠতম কৈবল্য অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও ঐপ্রকার শুদ্ধিলাভ হয় না। তখন প্রকৃতি, মায়া বা মহামায়ার আবরণ থাকে না বটে কিন্তু একটা সূক্ষ্ম আবরণ থাকে, যাহাতে আত্মার শিবত্ব আচ্ছন্ন হইয়া যায়। ঐ যে মলরূপ আবরণ উহা দূর না হইলে আত্মা পরমশিবরূপে

উপনীত হইতে পারে না। আত্মা সরল মার্গে মনোভূমির অন্ত পর্যন্ত আরূঢ় হইতে পারেন। ঐখানে যাইয়া মনের ত্যাগ হইয়া যায় এবং কৃপার জন্য প্রতীক্ষা করিতে হয়। উহাই বিশ্বের উচ্চতম অবস্থা কিন্তু পরমশিবে যাওয়ার প্রতিবন্ধকস্বরূপ। নদী পার হওয়ার জন্য যেমন লোক খেয়া নৌকার প্রতীক্ষায় থাকে সন্ধ্যাবেলায়, ঠিক সেইপ্রকার ঐখানে যাইয়া মহাকরুণার জন্য প্রতীক্ষা করিতে হয়। আত্মা এখন যেখানে রহিয়াছে সেখানে স্থূল মায়া তো নাই-ই কিন্তু সূক্ষ্মাদিরূপ মায়াও নাই। আপাততঃ কোনপ্রকার আবরণ সেখানে আছে বলিয়া মনে হয় না কিন্তু আবরণ আছে। এই আবরণ দূর করিবার জন্য উন্মনী শক্তি আসিয়া আত্মাকে গ্রহণ করে এবং উহাকে পরমশিবস্থানে পৌছাইয়া দেয়। উন্মনী শক্তির অবতরণ মহাকরুণা-শক্তির প্রতীক। উন্মনী শক্তি যাবতীয় তত্ত্বের শিখরদেশে অবতীর্ণ হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা পুরুষকারের দ্বারা মনো-রাজ্যের অথবা তথাকথিত যোগমায়া রাজ্যের চরম সীমা পর্যন্ত উপনীত না হয় ততদিন পর্যন্ত উন্মনী শক্তি তাহাকে স্পর্শ করে না। উন্মনী শক্তির প্রভাবে আত্মা পরমশিবধামে প্রবেশ করে এবং পরমশিবত্বলাভ করে। তখন ঐ শক্তি তিরোহিত হইয়া যায়। আত্মা তখন পরমশিবরূপে নিজেকে ঐ উন্মনা ভূমিতে দেখিতে পায়। ইহারই নাম, পৌরাণিক শাস্ত্রে, কাশীতে মৃত্যুর ফলে শিবত্বলাভ। পরমশিবস্থানই কাশীস্থান, কারণ ঐখানেই পূর্ণ তত্ত্বের পরম প্রকাশ হয়। উহাকেই ঔন্মনস ক্ষেত্র বলে।

এই যে পরমশিবভাব ইহাই আত্মার পূর্ণত্ব প্রাপ্তির নামান্তর। এই অবস্থায় আত্মা ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলক্ষণ। আত্মা তত্ত্বের মধ্যে থাকিয়া তত্ত্বের শিরোভূমি পর্যন্ত অধিকার করিতে পারিলে শিবত্বলাভ করে এবং তাহা ব্রহ্মাণ্ড, প্রকৃত্যণ্ড, মায়াণ্ড ও শাক্তাণ্ডেরও অতীত। কিন্তু উহাতে মল থাকে, কারণ উহা স্বাতন্ত্র্যশক্তিহীন আত্মা, উহাতে স্বাতন্ত্র্যশক্তি থাকে না। স্বাতন্ত্র্যশক্তি শক্তি-তত্ত্বরূপে নিষ্কল অবস্থায় স্থিত, কিন্তু উহাও পরমশিবের শক্তি নহে কারণ পরম-শিবের শক্তি, শিবসহ অভিন্ন। শিব তত্ত্বের মধ্যে শক্তিহীন হইলেও বোধস্বরূপ, ইহা নিষ্কল নহে কারণ ইহাতে শান্ত্যতীত কলা রহিয়াছে। তদ্রূপ শক্তিও মহাশক্তিরূপে তত্ত্বের মধ্যে পরিগণিত হয়—কিন্তু ইহাও অপূর্ণ—কারণ ইহাতে শান্তিকলা রহিয়াছে। শিব ও শক্তি পরস্পর মিলিত হইলে উহাই হয় শিবেরও পরম রূপ এবং শক্তিরও পরম রূপ। উহারই নাম পরমশিব,

উহা নিষ্কল। উহারই নামান্তর পূর্ণত্ব। আত্মার চরম লক্ষ্য এই পরম শিবত্বলাভ।

৮

এবার আমরা বিন্দুরাজ্য হইতে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বদিকে উঠিতে চেষ্টা করিব। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে মনে রাখিতে হইবে, বিশ্ব বাস্তবিকপক্ষে অনন্ত। মায়াজগতে বিশ্বের যে রূপ দেখিতে পাই এবং যাহা কালের আবর্তে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে উহাও অনন্ত। উহাকে ভেদ করিতে হইলে সদ্‌গুরুর কৃপায় বিন্দুরাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। এইখানে অর্ধমাত্রার প্রভাবে মায়াতীত শুদ্ধমায়ার বিকাশ হয়। তাহার পর ঐ শুদ্ধমায়ারাজ্য ভিন্ন ভিন্ন স্থিতিতে অতিক্রম করিতে হয়। এইভাবে কালের সূক্ষ্মতম পরমাণু পর্যন্ত উত্থান আবশ্যক। তাহার পর নিজের দুর্বলতাবশতঃ আর অধিক কালের রাজ্যে সঞ্চরণ সম্ভবপর হয় না। কার্যক্ষেত্রে তখন একদিকে যেমন কালের অবসান হয়, অন্যদিকে তেমনি যোগীর সামর্থ্যের অবসান হয়। তখন আত্মসমর্পণের ভাব জাগিয়া উঠে। ইহার পর আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে উন্মনী শক্তির প্রভাবে সেও পরমশিবস্থানে উপনীত হয় ও পরমশিবত্বলাভ করে। কাল সেখানে থাকে না, শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ মনও সেখানে থাকে না এবং ব্যক্তিগত পুরুষকারের স্থানও সেখানে নাই। ইহাই নিষ্কল পরম অবস্থা। প্রত্যেক আত্মার ইহাই চরম লক্ষ্য। লোক-লোকান্তরে গতি, লোকাতীত ভূমাস্বরূপে স্থিতি প্রভৃতি তাহার লক্ষ্য নহে। পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপই জীবের চরম লক্ষ্য—ইহাই পরমশিব। ইহা স্বাতন্ত্র্যহীন প্রকাশমাত্র নহে। এইখান হইতে যে সৃষ্টির প্রকাশ হয় তাহাই বিশ্বরূপে পরিচিত। তাহা সাক্ষাৎ পরমশিব হইতে ঘটিয়া থাকে। এইখানেই কামকলাতত্ত্বের রহস্য ফুটিয়া উঠে। এ বিষয়ে পরে বলিব।

আমরা যে পথ অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি তাহার দ্বারা পরমশিব পর্যন্ত স্থিতির সন্ধান পাওয়া যায় এবং পরমশিব হইতে চিৎকলা অবলম্বনে চিন্ময় বিশ্বের পরিচয়ও প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে সম্বন্ধে কিছু কিছু গুহ্য রহস্যের প্রকাশ পরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

সাধারণতঃ যোগপথে যাহারা প্রবৃত্ত হয় তাহারা পাতঞ্জল যোগের প্রদর্শিত পথের শেষ প্রান্তে গিয়া অস্মিতা ভূমিতে স্থিতিলাভ করে। এই ভূমিটি গ্রাহ্যসমা-

পত্তি (স্থূল ও সূক্ষ্ম), গ্রহণ-সমাপত্তি এবং গ্রহীতৃ-সমাপত্তির পর্যবসান অবস্থায় ঘটিয়া থাকে। ইহাই একাগ্র ভূমির প্রান্তবিন্দু। অস্মিরূপে আত্মসত্তা তখন সমস্ত বিশ্বকে আলম্বন করিয়া প্রকাশমান হইয়াছে, তাই ইহা একাগ্র সমাধি। কালরাজ্যে চিত্তকে সমাহিত করিলে এই পর্যন্তই যাওয়া সম্ভবপর হয়। একাগ্র ভূমিতে যে প্রজ্ঞার উদয় হয় তাহার নাম অস্মিতা প্রজ্ঞা। বলা বহুল্য, কালরাজ্য হইতে বাহির রাজ্যে যাইতে চেষ্টা করিলেও এখনও সম্পূর্ণ বাহির হওয়া সম্ভব হয় নাই। অস্মিতা ভূমি একাগ্র ভূমি। এখানেও কালের মাত্রা রহিয়াছে। শাস্ত্রবিদ্‌গণ জানেন, বর্ণের উচ্চারণকাল বিষয়ে প্রাচীন আচার্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে হ্রস্বস্বরের উচ্চারণকাল একমাত্রা, দীর্ঘের দুইমাত্রা, প্লুতের ততোধিক। কিন্তু যে বর্ণটি হ্রস্বস্বরও নয়, দীর্ঘস্বরও নয়, প্লুতও নহে কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণ, তাহার কালমাত্রা অর্ধমাত্রা—'ব্যঞ্জনং চার্ধমাত্রকম্'। একটি হলন্ত ক্ বা ল্ বা ট্-য়ের যে উচ্চারণ-মাত্রা তাহাই অর্ধমাত্রা। একাগ্র ভূমিতে অর্থাৎ অস্মিতা ভূমিতে যখন প্রজ্ঞার উদয় হয়, তখন এই অর্ধমাত্রাই প্রকাশমান হয়। কালকে সংক্ষিপ্ত করিতে করিতে অর্ধমাত্রা পর্যন্ত লইয়া আসা—ইহাই পাতঞ্জল যোগসাধনার নিগূঢ় রহস্য। অর্ধমাত্রা একাগ্র ভূমি, তাহার পর আছে নিরোধ। পাতঞ্জল যোগী স্থূলযোগী। তাহাদের বিশ্বের পরিজ্ঞান এই অর্ধমাত্রাতেই পর্যবসিত। ইহাই তথাকথিত অস্মিতা জ্ঞান। এই অস্মির ভিতরে সমগ্র বিশ্ব রহিয়াছে। যাহারা বৈরাগ্যসম্পন্ন এবং পরবৈরাগ্যের জন্য উৎসুক তাহারা এই অস্মিতা ভূমি হইতে ক্রমশঃ নিরোধের দিকে অগ্রসর হয়। কারণ, অস্মিতার পর আর কোথাও যাওয়ার মার্গ নাই। স্থূল মায়িক বিশ্ব এইখানেই পর্যবসান প্রাপ্ত হইয়াছে। পাতঞ্জল যোগীর সর্বজ্ঞত্ব লাভ এই অস্মিতা ভূমিতে পর্যবসিত। কারণ সর্ব বলিতে যাহা বুঝায় তাহাই বিশ্ব এবং অস্মিতাতে তাহাই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। যাহারা তীব্র বৈরাগ্যসম্পন্ন নহে, তাহারা এই অস্মিতা ভূমির পর নিরোধের দিকে অথবা বিবেকখ্যাতির দিকে অগ্রসর হয় না এবং ঠিকভাবে অগ্রসর হইতেও পারে না, কারণ তাহাদের অপর-বৈরাগ্য সিদ্ধ হইলেও পরবৈরাগ্যের উদয় হয় নাই। অপরবৈরাগ্য ভোগবৈতৃষ্ণ্যের নামান্তর, পরবৈরাগ্য গুণবিতৃষ্ণার নামান্তর। গুণের রাজ্যে থাকিতে গেলে পরবৈরাগ্য সম্ভব নহে। এই জাতীয় যোগী অস্মিতাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে এবং যে সকল বিভূতি তাহাদিগের নিকট অনাহূতভাবে উদিত হয় তাহাই

তাহাদের সম্পদ্। এইসকল যোগী পরবৈরাগ্যের দিকে অথবা নিরোধের দিকে অগ্রসর হয় না। ইহাদের লৌকিক স্থিতি যোগ-দৃষ্টিতে প্রকৃষ্ট, তথাপি এইসব যোগীর মার্গ অত্যন্ত বিপদ্‌সঙ্কুল, কারণ এইসকল যোগী যতই উচ্চভূমিতে উন্নীত হোন্ না কেন, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে দুইটি ন্যূনতা সাধারণতঃ বিদ্যমান থাকে। ইহার ফলে 'মধুমতী' ভূমি নামে একটি অবস্থার উদয় হয়। তখন অনেক দেব-দেবী, এমনকি সিদ্ধ মহর্ষিও এইসকল যোগীকে দর্শন দিয়া থাকেন এবং অনেক সময় অনাহূতভাবে অনেক কিছু সিদ্ধি প্রভৃতি বরদান করিয়া থাকেন। ইহা উচ্চ অবস্থা হইলেও পরম লক্ষ্যের দৃষ্টি অনুসারে যোগীর পক্ষে বিপজ্জনক অবস্থা। এই সময় এই বিপদ্ হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় নিজের ভিতরে আসক্তি অথবা প্রলোভনের ভাব না রাখা এবং স্ময় অথবা গর্বের ভাব পোষণ না করা। অহংকার এবং লোভ—এই দুইটি এই জাতীয় যোগীর পতনের কারণ। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির শিখরদেশে উপনীত হইয়া যদি কেহ এই দুইটি বিপদ্ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে অবশিষ্ট মার্গ সুগম হইয়া থাকে। কারণ, মধুমতী ভূমিটি দ্বিতীয় ভূমির নাম। মধুমতী ভূমি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যোগী যে অবস্থায় স্থিত হ'ন তাহা অতি শ্রেষ্ঠ অবস্থা। তখন ভূতজয় এবং ইন্দ্রিয়জয় তাহার আপনিই সিদ্ধ হইয়া যায়। ভূতজয় ও ইন্দ্রিয়জয় সিদ্ধ হইলে বাহ্য বিভূতির আকর্ষণ যোগীর থাকিতে পারে না। কারণ, যোগীর ভৌতিক দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি বিশুদ্ধ হওয়ার দরুণ তাহার ইচ্ছাই তখন শক্তি-রূপে পরিণত হয়। ইহা প্রচলিত যোগবিভূতি নহে—ইহা মনে রাখিতে হইবে। যোগবিভূতি সংযম হইতে উৎপন্ন হয় কিন্তু এই ইচ্ছারূপী শক্তি ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি হইতে আপনিই আবির্ভূত হয়। ইহার জন্য সংযম আবশ্যক হয় না।

এই ইচ্ছাশক্তির উদয়ে এক দৃষ্টিতে চিৎকলার বিকাশ হইতে থাকে। চিৎ-কলার বিকাশ ক্রমশঃ অধিক হইতে পূর্ণত্ব লাভ করে। যেমন চন্দ্রের কলা শুক্লপক্ষে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণিমা পর্যন্ত উপস্থিত হয়, সেইপ্রকার এই চিৎকলার বিকাশ পঞ্চদশী পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে। তাহার পর স্বভাবের নিয়মে সঙ্কোচের আবির্ভাব হয়। শুক্লপক্ষের পর কৃষ্ণপক্ষের আবির্ভাবের ন্যায় এই স্থলেও ক্রমশঃ নিবৃত্তিভাব প্রধান হইয়া থাকে। ইহার পর চিৎকলার যেমন উদয় হয় না, তেমনি তাহার তিরোভাবও হয় না—এইরূপ একটি অবস্থার আবির্ভাব হয়। দেহ থাকা পর্যন্ত এই ভূমি অবধিই অধিগত হয়। যোগিগণ ইহাকে

তাঁহাদের পরিভাষায় 'অতিক্রান্তভাবনীয়' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার পর পরম পদ প্রাপ্তি।

ইচ্ছাশক্তির এই দুইটি দিক্ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে—একটি শুক্লপক্ষের অনুরূপ, অপরটি কৃষ্ণপক্ষের অনুরূপ, তাহার পর কালাতীত। এই যে অবস্থাটি বলিলাম, ইহা অস্মিতা সমাধি হইতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। কোনো কোনো স্থলে বিবেকখ্যাতির অভাববশতঃ অস্মিতাসিদ্ধির পূর্ণতার প্রভাবে ঈশ্বরত্ব লাভ হয়। ইহাই সাংখ্যের ঈশ্বর—'ঈশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা'। এই ঈশ্বর সাধারণ পুরুষ মাত্র কিন্তু ঐশ্বর্যসম্পন্ন। ঐশ্বর্যের অপগম হইলে তদধিষ্ঠিত ব্রহ্মাণ্ডের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই যোগী কৈবল্যপথের জন্য অবতীর্ণ হয়।

যাহারা বিবেকখ্যাতির মার্গে অগ্রসর হয় তাহাদের ঐ জাতীয় অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয় না। বিবেকখ্যাতির মার্গে চলিতে চলিতে পরবৈরাগ্যের উদয় হয় এবং তখন গুণবিতৃষ্ণা ঘটিয়া থাকে। তখন পুরুষের সাক্ষাৎকার হয়—'পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্' এবং পুরুষের সাক্ষাৎকারের আলোকে গুণময়ী প্রকৃতিকেও দর্শন করিয়া থাকে এবং দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, কেননা তাহা পরিণামযুক্ত। এইভাবে ধীরে ধীরে বিবেকখ্যাতি পূর্ণত্ব লাভ করে এবং পুরুষ কেবলীরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু এ অবস্থার বিশেষ বিবরণ এখানে দেওয়া অনাবশ্যক।

তান্ত্রিক যোগিগণ ঐ একাগ্র ভূমির অর্থাৎ অস্মিতা ভূমির অর্ধমাত্রারূপ জ্ঞান নিজ সম্পদ্‌রূপে গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন পথে চলিতে আরম্ভ করেন। ইহাদের লক্ষ্য ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরত্বও নহে এবং কৈবল্য প্রাপ্তিও নহে। ইহারা কালমার্গকেও সমাপ্ত করিতে অগ্রসর হ'ন। সাধারণ অবস্থায় জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির মধ্য দিয়া কালের আবর্ত চলিতেছিল কিন্তু এইসকল যোগী অর্ধমাত্রাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমশঃ তাহাকে ভেদ করিতে করিতে 'মধ্যমা প্রতিপদা' অর্থাৎ সুষুম্নার সরল মার্গ অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ কালকে ভেদ করিতে চেষ্টা করেন। এই স্থিতিতে প্রথম অবান্তর অবস্থা বিন্দুপদ, দ্বিতীয় নাদপদ। বিন্দুপদের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর, নাদের অধিষ্ঠাতা সদাশিব। বিন্দু অবস্থায় স্বভাবতই সর্বজ্ঞত্ব লাভ হয়। ইহাকে সাধারণতঃ লোকে সিদ্ধাবস্থাও বলিয়া থাকে। এই অবস্থায় সমগ্র বিশ্বের যাথার্থ্যরূপের দর্শন হয় অর্থাৎ বাচ্য ও বাচক হিসাবে উভয়ে ভেদ রহিয়াছে—এইটি পূর্ণরূপে তখনই অধিগত হয়, যখন বাচ্যাংশের অনুভবের পর বাচকাংশের

অনুভব পরপর ঘটিয়া থাকে। বাচ্যাংশের অনুভবের সঙ্গে সিদ্ধাবস্থার উদয় হয়। ইহাকে সর্বজ্ঞত্ব লাভ বলে। কিন্তু বিন্দু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরবর্তী অবস্থায় যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। বিন্দুর মধ্যে অর্ধচন্দ্র নামে একটি অবান্তর অবস্থা আছে। তাহার পরই নিরোধিকা শক্তির প্রাচীর রহিয়াছে, যাহার প্রভাবে বিন্দু হইতে নিরোধিকা ভেদ করিয়া নাদে যাওয়া সুকঠিন। বিন্দুর অনুভব এবং নাদের অনুভব একপ্রকার নহে। বহু সিদ্ধপুরুষ বিন্দুভূমি হইতে নাদভূমিতে যাওয়ার চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হ'ন না। নাদভূমি হইতে বিন্দুভূমিতে নামিয়া আসাও তত সহজ নহে। উভয়ত্র মহাশক্তি পরা-সংবিতের সাক্ষাৎ নির্দেশ আবশ্যক। আত্মবলের গরিমা লইয়া কেহ বিন্দু হইতে নাদে যাইতে পারে না। বিন্দুর জ্ঞান অর্থাৎ বিন্দুস্থ পুরুষের জ্ঞান এবং নাদস্থ পুরুষের জ্ঞান একপ্রকার নহে। বিন্দুতে ভেদজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, নাদের অন্তঃস্থিত জ্ঞানই অভেদ জ্ঞান। বিন্দু হইতে নাদে যাইতে হইলে যেমন মহাশক্তি শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ আবশ্যক, তেমনি নাদ হইতে বিন্দুতে আসিতে হইলেও উহা আবশ্যক। বিন্দুর জ্ঞান ভেদমূলক জ্ঞান, নাদের জ্ঞান অভেদমূলক জ্ঞান। বিন্দুতে সবই দেখা যায় অপরোক্ষভাবে কিন্তু নিজ হইতে ভিন্নরূপে। কিন্তু নাদেও সব সাক্ষাৎকার হয়, কিন্তু নিজ সত্তা হইতে অভিন্নরূপে। [যাঁহারা শ্রীঅরবিন্দের দর্শন আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা লক্ষ্য করিবেন যে বিন্দুর জ্ঞান কতকটা Overmind-এর অবস্থা এবং নাদের জ্ঞান Supermind-এর অবস্থা]

নাদের জ্ঞানের সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের নদনের অনুভব হয় অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বের যাবতীয় সত্তা সবই মনে হয় আমি—ইহারই নাম নদন। বিন্দুস্থ সিদ্ধ পুরুষের তাহা হয় না এবং হইতেও পারে না কারণ তাহা হইলে বিশ্বে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, কারণ বিন্দুস্থিত মহাপুরুষগণই এই বিশ্বের সঞ্চালক। যাঁহার যেরূপ সেবাবাসনা রহিয়াছে তাহাকে জগন্মাতা সেইরূপ সেবার ভার দিয়া থাকেন। এই অবস্থায় নিজের সেবার কার্য পরিত্যাগ করিয়া নাদে প্রবিষ্ট হইলে বিশ্বে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এইজন্য যাইতে হইলে কিয়ৎকালের জন্য মায়ের অনুমতি লইয়া যাইতে হয়। যখন ভেদকামনা উন্মূলিত হয় তখন বিন্দু হইতে নাদে প্রবেশ সহজেই ঘটিয়া যাইবে, তখন নিরোধিকা শক্তি বাধা দিবে না।

নদনরূপ ব্যাপারটি অতি অদ্ভুত। ইহা সাধারণ লোকে হয়তো বুঝিতে পারিবে না, সেইজন্য ইহার তত্ত্ববিশ্লেষণ কিঞ্চিৎ মাত্রায় করা হইতেছে। আমরা

শব্দ বলিতে সাধারণতঃ বৈখরী শব্দই বুঝিয়া থাকি, যাহা উচ্চারণ করা যায় এবং কানে শোনা যায়। এই শব্দ ভৌতিক আকাশের ধর্ম। যখন সাধক গুরুদত্ত মন্ত্র লাভ করিয়া জপ করিতে থাকেন, তখন প্রথমে এই শব্দেরই ক্রিয়া হয়। গুরুদত্ত মন্ত্রে সদ্গুরুপ্রদত্ত স্বভাবসিদ্ধ চিৎশক্তি নিহিত থাকে। ইহা পশ্যন্তী অবস্থার কথা, যেখানে অবগাহন করিয়া গুরু শিষ্যের বীজমন্ত্র উদ্ধার করেন। ইহার পর মধ্যমা অবস্থায় ঐ বীজকে কল্পনার রাজ্যে মধ্যমা বাকের মধ্য দিয়া শিষ্যকে অর্পণ করিবার জন্য ভৌতিক আকাশে নামিয়া আসেন এবং বৈখরীরূপে উহাকে অর্পণ করেন। এই বৈখরী শব্দের মধ্যে, যাহা শিষ্য সদ্গুরু হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, দুইটি অংশ পৃথক্ পৃথক্ লক্ষ্য করিতে হইবে। একটি ইহার স্থূল অংশ, যাহা শিষ্য শ্রোত্র দ্বারা গ্রহণ করিয়াছে এবং একটি উহার সূক্ষ্ম অংশ, যাহা ঐ স্থূল আবরণের মধ্যে ঢাকা রহিয়াছে। শিষ্য নিরন্তর গুরুনির্দিষ্ট ক্রমে মনের ক্রিয়া ঐ স্থূল অংশের উপরে সম্পাদন করিতে পারিলে স্থূলের আবরণটি কাটিয়া যায়। যে শব্দটি শিষ্য গুরুর মুখ হইতে শোত্রেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণ করিয়াছিল, উহা সেই আবরণ। নারিকেলের মধ্যে যেমন একটা বাহ্য স্থূল আবরণ আছে, তাহাকে সরাইয়া ফেলিতে পারিলে ভিতরে সুস্বাদু বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, এখানেও সেইরূপ। ঐ শব্দের স্থূল আবরণটি নিরন্তর জপের দ্বারা ভাঙিয়া ফেলিতে হয়। ঐ স্থলে মন্ত্রের অর্থবোধের কোন প্রয়োজন হয় না এবং ধ্যানেরও কোন আবশ্যকতা থাকে না। ঐ স্থূল আবরণটি অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্জগতে আপেক্ষিক জ্যোতির প্রকাশ হয় ও ভিতরে সমগ্র সত্তাটি আলোকে আলোকিত মনে হয়। এইটি কল্পনার জগৎ অথবা চিত্তাকাশ। এই আলো ক্রমশঃ উজ্জ্বল ও নির্মল হইতে থাকে। ইহারই নাম চিত্তশুদ্ধি। ইহা মধ্যমা বাকের পরিপক্ব অবস্থা। ইহার পর এই মধ্যমার জ্যোতিঃ বা চিত্তজ্যোতিঃ চিদালোকে পরিণত হইয়া যায়। তখন ঐ মনোময় জ্যোতিঃ আর থাকে না, বাহ্য বৈখরী শব্দের ঝঙ্কারও থাকে না, চিদালোকে আলোকিত চিদাকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানে গুরুদত্ত মূল বস্তুর সাক্ষাৎকার হয়—যাহা অতি গুপ্তভাবে তিনি সংরক্ষণ করিয়াছিলেন এবং এমন একটি ব্যাপারের অনুভব হয় যাহাকে তান্ত্রিকগণ পারিভাষিকভাবে 'নদন' বলিয়া থাকেন। এখানে বিশ্বের সমগ্র সত্তাই—আমি এইরূপে অনুভব হয়। ইহা পূর্বাভাস মাত্র—ইহার পর বহু অবস্থা আছে।

তদ্রূপ বিন্দু হইতে নাদে প্রবেশ হইলেও ঐ নন্দনের অনুভূতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহের বোধ থাকে না, সর্বত্রই নিজ সত্তার ব্যাপ্তির অনুভূতি হয়। সমগ্র বিশ্বই আপন বলিয়া মনে হইতে থাকে।

পাতঞ্জল ভাষ্যকার ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে চিত্তরূপী নদী দুইদিকে প্রবাহিত হয়—একটি অন্তর্মুখে, একটি বহির্মুখে। যেটি অন্তর্মুখ প্রবাহ—উহারই নাম কল্যাণস্রোত, যেটি বহির্মুখ উহার নাম বিষয়স্রোত। আমাদের মনোময় কোষে একটি ধারা বহির্মুখে প্রাণময় কোষ ভেদ করিয়া ইন্দ্রিয় অবলম্বনে ভৌতিক জগতের দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এই ভূতাকাশেই অনন্ত কোটি স্থূল লোক-লোকান্তর অবস্থিত রহিয়াছে। ইন্দ্রিয় দ্বারা এই বহির্মুখ প্রবাহ প্রসৃত হয়—এই অবস্থায় প্রাণময় কোষের ক্রিয়া থাকে। তাই সাধকের শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিতে থাকে। মনের আর একটি প্রবাহ অত্যন্ত নিগূঢ়ভাবে অন্তর্মুখে অথবা উর্ধ্বদিকে প্রবাহিত হয়। সাধারণতঃ ঐ ধারার সন্ধান কেহ পায় না। একবার উহা পাইলে তখন দেহাত্মবোধ কাটিয়া যায় এবং ঐ ধারা-প্রবাহে নিজ সত্তাকে ঢালিয়া দেয়, উহা অন্তর্মুখ আনন্দময় ধারা—ঐ ধারাই পূর্ণ আত্মচৈতন্যের প্রকাশের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ঐটি সুষুম্নার উর্ধ্বস্থিত বজ্রানাড়ী ও চিত্রিণী নাড়ীর পরবর্তী ব্রহ্মনাড়ীর ক্রিয়াবস্থা। উহাকেই যোগিগণ মায়ের কোল বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। উহাই এক হিসাবে ভগবানের আনন্দময় ধাম—ঐখানে মাতৃঅঙ্কে দ্রষ্টারূপে বিশ্বের সাক্ষিস্বরূপ লাভ করিয়া পরম পিতা ও পরম মাতার স্নেহে বর্ধিত হইয়া আত্মা অন্তর্মুখ হইয়া আনন্দের আস্বাদন করে। এই ব্রহ্মনাড়ীর অতীত অবস্থাই ব্রহ্মস্বরূপ এবং যোগী ইহাও অনুভব করে যে তাহাকে তুলিয়া লইবার জন্য স্বরূপ হইতেও শক্তি আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করে। ইহার কারণ এই যে ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত যোগী যখন তাঁহারই আকর্ষণে তাঁহার দিকে অগ্রসর হয় তখন তাঁহাকে স্বধামে রাখিবার জন্য পরাশক্তিও ব্যাপৃত হইয়া পড়েন। সে ব্রহ্মস্বরূপে যায় না, সে ব্রহ্মানন্দ অখণ্ডরূপে অনুভব করে। কালের প্রভাব বা মায়ার প্রভাব তাহাকে বাধিত করিতে পারে না, কারণ তাহারা ঐ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না, বাধা দিবে কি প্রকারে ?

যাহা হউক্—এই যে উর্ধ্ব উদ্‌গমনরূপ ব্যাপার—যাহার প্রভাবে বিজ্ঞান-ময় কোষের মধ্য দিয়া আনন্দময় কোষে গতি হয়—ইহাই নন্দনের রহস্য।

বিন্দু হইতে নাদে আসিলে নদন ক্রিয়ার আস্বাদন পাওয়া যায়। এই নাদভূমিতে এই যে ঊর্ধ্বগতির কথা বলা হইল, যখন এই ঊর্ধ্বগতির ঊর্ধ্বসীমা ভেদ হইয়া যায় তখন খেচরী গতির প্রারম্ভ হয়। অর্থাৎ সাধক নিজের ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়াও যখন ঊর্ধ্বগতিশীল হ'ন, তখনই খেচরীয় গতির আরম্ভ। তখন তাহার দেহাভিমান বিলুপ্ত হয় এবং শক্তির বিকাশ আরম্ভ হয়। পূর্বে বলিয়াছি বিন্দু, অর্ধচন্দ্র, নিরোধিকা, নাদ, নাদান্ত, শক্তি। নাদান্তই ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ জ্যোতির স্থান। তাহারই পর চিদাকাশে গতি লাভ হয় ও ঊর্ধ্বগতি চলিতে থাকে।

এইখানে এই খেচরী সম্বন্ধে একটি বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। ইহা শক্তিবিজ্ঞানের আলোচকের পক্ষে অবশ্য জ্ঞাতব্য। শক্তি অর্থাৎ আত্মশক্তি দুই অবস্থাতে অবস্থিত। আত্মা যখন পশুভাবে থাকে তখন তাহার শক্তি থাকে চক্রাকারে এবং আত্মা যখন শিবভাবে উন্নীত হয় তখন তাহার শক্তি থাকে শক্তিরূপে, সরলরেখারূপে, তখন আর চক্রভাব থাকে না। আত্মশক্তি একই কিন্তু ভূমিভেদে তাহা নানা। আত্মার ভূমি সাধারণ মনুষ্যের বিচারযোগ্য বা বোধযোগ্য ভাষায় বলিতে গেলে তিনটি অথবা চারিটি—একটি প্রমাতার পদ, একটি প্রমাণের পদ, ইহা স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দুইপ্রকার এবং একটি প্রমেয়ের পদ। এই একই শক্তি বিভিন্ন নাম লইয়া বিভিন্ন ভূমিতে কার্য করিয়া চলে। পশু অবস্থায় উহা চক্ররূপে কার্য করে—অর্থাৎ খেচরী চক্র। পশুত্ব কাটিয়া গেলে উহা শক্তিরূপে কার্য করে। তখন চক্রভাব থাকে না—উহার নাম হয় খেচরী শক্তি। খেচরী শক্তি ও খেচরী চক্র একই বস্তু—আত্মা মুক্ত অবস্থায় খেচরী শক্তি লইয়া বিহার করেন। উহা তাঁহার নিজ শক্তি, উহা তাঁহারই অধীন এবং বদ্ধ অবস্থায় ঐ খেচরী শক্তির অধীন তাঁহাকে থাকিতে হয়। সাধারণ মনুষ্য বাহ্য দৃষ্টিতে যতই বড় যোগী, জ্ঞানী বা ধার্মিক হোন্ না কেন, তাহার শক্তি চক্রাবস্থা হইতে শক্তিরূপে পরিণত না হইলে সবই বৃথা। সুতরাং খেচরী শক্তি যদি কোনো মনুষ্যের প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহার শিবত্ব লাভ হইয়া গিয়াছে। সামাজিক দৃষ্টিতে কেহ তাহাকে জীবন্মুক্ত বলুক্ বা না বলুক্ কিছু আসে যায় না। আত্মশক্তির পূর্ণ জাগরণ—ইহাই শিবত্ব। এই শক্তি স্তরে স্তরে ক্রিয়া করিয়া থাকে। কোনো স্তরে ইহার নাম গোচরী শক্তি, কোনো স্তরে ইহার নাম দিক্‌চরী শক্তি, কোনো স্তরে ইহার নাম ভূচরী শক্তি। শক্তির জাগরণ হইলে প্রতি ভূমিতেই উহার জাগরণ হয়—ইহা বলাই বাহুল্য।

কেহ ভূচরী চক্রের অধীন রহিয়াছেন অথচ তাঁহার খেচরী শক্তির জাগরণ হইয়াছে, ইহা হইতে পারে না। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি : খেচরী শক্তি জাগিলে যোগীর অনুভব কি প্রকার হয় এবং ভূচরী শক্তি জাগিলেই বা কি প্রকার হয় ? খেচরী শক্তি জাগিলে আত্মা নিজেকে আর পশুরূপ মনে করে না, শিবত্ব তাঁহার প্রত্যক্ষ হয় এবং এই দেহের প্রমাতারূপ অভিমান তাহার থাকে না, কারণ তাহা হইলে সে তো পশু হইয়া যাইবে, তবে ব্যবহারের জন্য তাহা রাখিতে পারে। শিবোহংরূপে তাহার অনুভব নিরন্তর থাকিয়া যায়, সে পুরুষ কি স্ত্রী, জ্ঞানী কি অজ্ঞানী, বালক অথবা বৃদ্ধ—এসব প্রশ্ন ওঠে না। এসব স্থূলদেহের কথা, স্থূলদেহের অভিমান চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার অভিমান আছে শিবোহংরূপে। সুতরাং অনন্ত কোটি বিশ্বের সর্বত্র সে দ্রষ্টারূপে নিজেকে অনুভব করিয়া থাকে। ভূচরী শক্তি জাগিলে ভূচরী চক্রের ক্রিয়া তিরোহিত হইয়া যায়, ভূচরী চক্রের প্রভাবে একটি পরিচিত দেহকে নিজ দেহ বলিয়া অভিমান করা হয়। আর ভূচরী চক্রের অবসানে ভূচরী শক্তির প্রভাবে বিশ্বের সকল দেহকেই নিজদেহ বলিয়া বোধ হয়। এই বিষয়ে আরও অনেক রহস্য আছে, পরে আলোচনা করিব।

৯

আমরা এখন পর্যন্ত পরমশিব পর্যন্ত জীবের আত্মপ্রকাশ হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। এ বিষয়ে অগ্রে অগ্রসর হইবার পূর্বে দার্শনিক জগতের চিন্তা-প্রবাহের উপর একটু দৃষ্টিপ্রক্ষেপ আবশ্যক। জীব অজ্ঞানে পতিত এবং মায়ার অধীন। অনাদিকাল হইতেই এইরূপ হইয়া আছে—ইহা প্রায় সকল দার্শনিকই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই স্থিতির মূল কারণ জীবভাবের আবির্ভাব এবং তাহার স্বরূপাবরণ। নানাপ্রকারে অনেকেই এইরূপে বিচার করিয়াছেন। কিন্তু দার্শনিক বিচক্ষণবর্গের মধ্যে এই বন্ধন ও মোক্ষ নানাপ্রকারে আলোচিত হইলেও ইহার রহস্য আলোচনা অনেকেই করেন নাই। ষড়্‌দর্শনের মধ্যে স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন ন্যায়-বৈশেষিক জীবের গতি বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ঊর্ধ্বগতি এবং মোক্ষ বা অপবর্গ—এই দুইটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, জীবের দুঃখ-নিবৃত্তির সাপেক্ষ, নিরপেক্ষ—দুইটি সাধন আছে। একটি সাধন ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং ধার্মিক পরিবেশের মধ্যে নিজেকে সংরক্ষণ—ইহার ফলে

ব. বি./তা. সা. ১৭-৭

স্বর্গলোকের বিচিত্র সুখরাশি জীবের আয়ত্ত হয়। এই সুখভোগও অনিত্য, তাই শ্রেষ্ঠ জীব ইহাকে উপেক্ষা করিয়া মোক্ষের দিকে অগ্রসর হয়। তাহা জ্ঞানমাত্রসাধ্য। ধর্ম হইতে স্বর্গলাভ হয়, আত্মজ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়। মোক্ষলাভ হইলে তাহার আর কিছু কাম্য থাকিতে পারে না। নৈয়ায়িকের ইহাই মত, বৈশেষিকগণেরও তাহাই। বৈশেষিকগণ 'বিশেষ' পদার্থ মানেন বলিয়া, বলিয়া থাকেন যে মুক্ত অবস্থায় মুক্ত পুরুষের একটি বৈশিষ্ট্য থাকে। আত্মা এবং মন উভয়ে তাঁহারা বিশেষ পদার্থ স্বীকার করেন। ইহার ফলে আত্মা অজ্ঞানের আবর্তে আর পতিত হয় না, ইহা সত্য কিন্তু তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য লইয়া অনন্তকাল পর্যন্ত বিরাজ করে। তাহার জন্মান্তর হয় না, সংসারে আর আসিতে হয় না। ন্যায় ও বৈশেষিকে কিঞ্চিৎ ভেদ থাকিলেও উভয়ের মত প্রায় একইপ্রকার। মীমাংসকগণের মতে স্বর্গলাভ এবং স্বর্গে পরিস্থিতি স্বীকৃত হয়। উহা ঠিক মোক্ষের অনুরূপ নহে, তবে একটি নিত্য সুখময় অবস্থান তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্বত্রই মুক্ত হইয়া গেলে আর সংসারের সহিত সম্বন্ধ থাকে না। শৈব, পাশুপত, বীরশৈব, বেদান্তের বিভিন্ন প্রস্থান— সর্বত্রই আপন আপন মতের উদ্ঘোষণ হইয়াছে। কোথাও দুঃখ-নিবৃত্তির প্রাধান্য, কোথাও সুখোপলব্ধির প্রাধান্য—এইরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। জৈনদিগের কৈবল্যলাভ এবং নিত্যসিদ্ধ অবস্থার লাভ আলোচনাও এই জাতীয় চিন্তার অন্তর্গত। বৌদ্ধগণের বিভিন্ন সম্প্রদায়েরও তাহাই। দুঃখ-নিবৃত্তি অথবা আনন্দ যাহাই হউক্ না কেন সর্বত্র সবই নিত্যরূপে গৃহীত হইয়াছে।

যাঁহারা যোগমার্গে প্রারূঢ় তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে মনুষ্য কালের রাজ্যে পতিত হইয়া আছে। অনাদিকাল হইতেই আছে, ইহা সত্য। এই কালের রাজ্য যথাসম্ভব গ্রহণ করিয়া পূর্ণভাবে ত্যাগ করিতে হইবে এবং এই ত্যাগের প্রসঙ্গে একটি রহস্যময় তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। একটু বিচার করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে সকল সম্প্রদায়েরই যোগিগণ একাগ্র ভূমিতে আসিয়া কালের রাজ্যকে ক্রমশঃ ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অধিকাংশ দার্শনিকগণ যোগমার্গে অগ্রসর হইতে হইতে একাগ্র ভূমিতে আসিয়া সমগ্র বিশ্বকে একসঙ্গে গ্রহণ করিয়া থাকেন, যাহার ফলে তাহার সর্বজ্ঞান অবশ্যই হয়, কিন্তু উহা থাকে না। পূর্বেই বলিয়াছি, একাগ্র ভূমিতে

কালের মাত্রা অর্ধমাত্রারূপে নির্মিত হয়। এই কলঙ্কিত অর্ধমাত্রার মধ্যেই জাগ্রৎ-স্বপ্ন ও সুষুপ্তির ধারা অনাদিকাল হইতে আবর্তক্রমে চলিতেছে। এই সকল ধারা মায়ারাজ্যের তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু গুরুকৃপায় প্রজ্ঞার উদয় হইলে এই কালজগতের অর্ধমাত্রা পরিত্যক্ত হইয়া যায়, কারণ তখন চিত্ত একাগ্র ভূমি হইতে নিরোধের দিকে অগ্রসর হয়।

তান্ত্রিক যোগিগণ এই কালের অবশিষ্ট অর্ধমাত্রা গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ তাহাকেও ভেদ করিতে চেষ্টা করেন। এইস্থলে পূর্বত্যক্ত অর্ধমাত্রার কোনো প্রশ্নই নাই। তাহা অজ্ঞানকালীন জগতের সঙ্গে সঙ্গে সদ্‌গুরুপ্রদত্ত অর্ধমাত্রা গ্রহণের সময় পরিত্যক্ত হইয়াছে, কারণ ইহা না হইলে যোগী বিন্দুতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা অনধিগম্য হইলেও যোগীর পক্ষে এই অর্ধমাত্রা আস্বাদনযোগ্য। সাধারণ জীবের পক্ষে এই অর্ধমাত্রার রাজ্য অজ্ঞানময় ঘোরতর অন্ধকারের রাজ্য। কিন্তু যোগীর দৃষ্টিতে ইহাই প্রজ্ঞার রাজ্য। এই অর্ধমাত্রা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে চরম অবস্থায় কালের লব বা পরমাণুতে পরিণত হয়—এ বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। যদিও স্থূল মায়ারাজ্যে এবং সূক্ষ্ম মহামায়ারাজ্যে কালের এই ক্রমিক সঙ্কোচ-পরম্পরা চলিতেই থাকে তথাপি ইহার পরিণামে কালনিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। স্থূল যোগীর পক্ষে একাগ্র ভূমি হইতে নিরোধ ভূমি পর্যন্ত এই মার্গ প্রসারিত। এই নিয়ম উভয়ত্রই প্রযোজ্য। স্থূল অর্ধমাত্রা স্থূল কালকে আশ্রয় করিয়া কল্পিত হয় এবং যোগীর সর্বজ্ঞত্ব এই অর্ধমাত্রার মধ্যে স্থাপিত। কারণ, যোগীর সর্ব বাস্তবিক সর্ব নহে। ইহা তাহার অনুভূতিতে প্রকাশমান সর্ব। মায়ারাজ্যের ইহাই খেলা। কিন্তু মহামায়ারাজ্য বা শুদ্ধমায়ারাজ্যের ব্যাপারও অনেকটা এইপ্রকার। কারণ, সেখানেও বিন্দুস্থ অর্ধমাত্রা হইতে কালের লব পর্যন্ত যে ঊর্ধ্বগতিশীল মার্গ আছে, তাহাতেও পরপর অর্ধমাত্রার প্রকাশ হইয়া থাকে এবং পরপর তাহার নিরোধও হইয়া যায়। চরম নিরোধ হয় কালের পরমাণু বা লব প্রাপ্তির সময়। স্থূল দৃষ্টির দিক্ হইতে দেখিতে গেলে বামাবর্ত ও দক্ষিণাবর্ত কালের ক্রমনিবৃত্তি এই স্থূল অর্ধমাত্রা প্রাপ্তির সময়ে অর্থাৎ কালের বক্রভাব তখন থাকে না কিন্তু সরল পথ থাকে এবং তাহাও কালেরই পথ। ক্রমশঃ এই সূক্ষ্ম অর্ধমাত্রাও পরিণামে পরিত্যক্ত হইয়া যায়। উভয়ে মিলিয়া কালচক্রের পূর্বার্ধ ও পরার্ধ পরিত্যক্ত হয়। তখন কাল থাকে না,

কালের অন্তর্গত বিশ্ব কোথায়? এই কালগত বিশ্বই আত্মার নিকট এতদিন ইদংরূপে পরিগণিত ছিল। ইহার পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এক হিসাবে কালের পরিত্যাগ, অন্যহিসাবে দেশের পরিত্যাগ হইল এবং আর এক হিসাবে দেখিতে গেলে ভাবেরও পরিত্যাগ হইল। কিন্তু অহং কোথায়? এই অবস্থায় জীব বিপন্নভাবে ব্যাকুল হইয়া নিজেকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। ইহার পর যে অবস্থার প্রাপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা তাহা অতি অদ্ভুত, তবে তাহার পূর্বে এই যে নিরোধের পরবর্তী অবস্থা, তাহার একটু সমালোচনা আবশ্যক।

কালের দক্ষিণাবর্ত ও বামাবর্ত কাটিয়া গেলেই সাধারণ যোগীর নিরোধ প্রকাশমান হইতে লাগিল, ইহা সত্য। কিন্তু অন্তে এই সূক্ষ্ম নিরোধও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। সমগ্রসরল মার্গ অতিক্রম না করা পর্যন্ত এই অন্তিম নিরোধ উপলব্ধ হয় না, কিন্তু কালের পরমাণু পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন ইহা সম্পন্ন হয় তখন এই সূক্ষ্ম নিরোধেরও আর স্থান থাকে না। সাংখ্যযোগ এবং বেদান্ত—উভয়ত্রই তাহার পর যে অবস্থার নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে কাল থাকে না, ক্রম থাকে না, ব্যক্তিত্ব থাকে না এবং ভাবাভাবময় প্রকাশ কিছুই থাকে না। কি থাকে? এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই ওঠে। যাহাদের জীবনের লক্ষ্য পরমাত্মা বা ঈশ্বরের প্রাপ্তি তাহাদের দিক্ হইতে বলিতে গেলে একমাত্র ঈশ্বর থাকে। বেদান্তের দিক্ হইতে বলিতে গেলে বলিতে হয় একমাত্র ব্রহ্ম থাকে। কিন্তু অহংরূপে প্রকাশমান যে আমি—কালের জগতে কণারূপে খেলিতেছিল—তাহার কিছুই থাকে না। তাই বলা হয়, ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার কালের অতীত। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারও তাই এবং সেখানে কিছুতো থাকেই না এবং অহংও থাকে না। কিন্তু অদ্বৈত পরমশিব অথবা পরাশক্তির দিক্ হইতে যে নির্দেশ পাওয়া যায় তাহাতে জানা যায় যে তখন আর কিছু না থাকিলেও একমাত্র আমিই থাকে। এই আমিই পূর্ণ আমি এবং এই আমি থাকিলে নিশ্চয় জানিবে সবই থাকে, না থাকার কিছুই নাই। এ বিষয়ে অনুধাবন করিতে না পারিলে কামকলা-রহস্য কেহই কিছুই বুঝিতে পারিবে না।

এই যে পূর্ণ অহং—যাহা ব্রহ্মপ্রাপ্তিতেও পাওয়া যায় না, ঈশ্বর-প্রাপ্তিতেও পাওয়া যায় না, তাহা কি? ইহার সমাধান এই: এই আমি আমিই, আমি ছাড়া কিছুই নয়। ব্রহ্মের বাহিরে অসীম অনন্ত মায়াজগৎ খেলা করিতেছে। মায়াজগৎ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মসমুদ্রে অবগাহন ঘটে। এই ব্রহ্মসমুদ্র

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, ইহাতে তরঙ্গ নাই, দেশ নাই, কাল নাই, অন্তসাপেক্ষতা নাই। ইহা আপনাতে আপনি প্রকাশমান। ইহাতে আমিও নাই। যাহা আছে তাহা সচ্চিদানন্দ অখণ্ড প্রকাশ। আমিরূপে একটা বিবর্তের উদয় হইয়াছিল, ইদংরূপ বিবর্তের সহিত অনাদিকাল হইতে তাহা খেলা করিতেছিল। কিন্তু ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে দুইটি বিবর্তই মিলাইয়া গেল। সুতরাং সেখানে আমি নাই। আমি যে কোথায় আছি, কি ভাবে আছি—এ প্রশ্ন উঠিতেও পারে না। ঈশ্বর অবস্থাতেও কতকটা এইরূপ। ব্রহ্মদৃষ্টিতে সব মিথ্যা, ঈশ্বর-দৃষ্টিতে সব পরিণামশীল কিন্তু সত্য, কিন্তু যেটি পূর্ণত্বের দ্বার তাহা এই স্থলেও প্রকাশিত হয় না। ইহাই কামকলারহস্য আলোচনা করিবার পূর্বপীঠ।

এইবার ব্রহ্ম ও পরমাত্মা হইতে পূর্ণ অহংরূপী মহাসত্তার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক্। এই পূর্ণ অহংরূপ সত্তা যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন শিব-শক্তির সামরস্য ঘটে। এইখানেই পীঠ রচনা আরম্ভ হয়। আচার্য যোগিগণ বলিয়াছেন, শিব ও শক্তির যে একটি সামরস্য তাহাই পরমবিন্দু। ইহারই নাম কামবিন্দু। ইহাকে পারিভাষিক ভাষায় সূর্য বলা হয়। আর যে দুটি বিন্দু শিবরূপে ও শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তাহার একটিকে অগ্নি বলা হয় এবং অপরটিকে বলা হয় চন্দ্র। মূলে এই ত্রিবিন্দু বোঝা আবশ্যক। পূর্ণ বিন্দু সূর্যরূপে উর্ধ্ব দিকে মধ্যস্থলে থাকে। আর অগ্নি ও সোমরূপ দুইটি বিন্দু দুইটি স্তনরূপে উহার নিম্নদিকে দুইদিকে থাকে। ইহাই ত্রিবিন্দুর অবস্থান। তাহার নীচে নাভিস্থানে হার্ধকলারূপে একটি বিচিত্র শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাই কামকলার স্বরূপ। ইহা হইতেই পূর্ণ স্বরূপের অন্তর্গত ভগবদ্ধাম অনন্তরূপে খচিত হয়। উহার প্রধান চিত্রটি লইয়া আমরা ভবিষ্যতে আলোচনা করিব—যাহার নাম শ্রীচক্র। এইপ্রকার অন্যান্য অবান্তর চিত্রও রহিয়াছে।

১০

কামকলাতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিভাত হয় না, যতক্ষণ এক ও নানার পরস্পর গভীর সম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর না হয়। সাধারণতঃ দ্বৈত এবং অদ্বৈত দৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য আছে। তদনুসারে দ্বৈত দৃষ্টি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভবপর যতক্ষণ সৃষ্ট জগৎ ও জগতের রহস্য সম্বন্ধে আমাদের অপরোক্ষ জ্ঞান না হয়। কিন্তু

অপরোক্ষ জ্ঞানলাভের পর সাধারণতঃ দ্বৈতের অস্তিত্বই লুপ্ত হইয়া যায়। অদ্বৈত বোধ যাহার যে ভূমিতেই হউক্ না কেন সেইখানেই তাহার সর্বজ্ঞানের সমাপ্তি ঘটিয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে দ্বৈত ও অদ্বৈতের সম্বন্ধ—ভেদ বা ভেদাভেদ যাহাই হউক্ না কেন, পরম অদ্বৈতের মীমাংসা তখনও হয় না। দ্বৈতনিবৃত্তি হইয়া গেলে অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠা হয় এবং তখন বিশ্বজগতের ভান থাকে না অথবা থাকিলেও বিশ্বজগতের সঙ্গে মূল সত্তার সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় না। ইহার একমাত্র কারণ শিব-শক্তির সামরস্যরূপে অদ্বৈত স্থিতির অভাব। কামকলা-বাদিগণ প্রাচীন সময় হইতেই দেখাইয়া আসিয়াছেন যে শিব-শক্তির সামরস্যরূপ বিন্দু প্রাপ্ত না হইলে আনন্দময় নিত্যসিদ্ধ বিশ্বের আবির্ভাব হইতে পারে না। আগমিকগণ কামকলার রহস্য উদ্ঘাটনে যতই প্রয়াস করুন্ না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত স্থিতি ও গতির একান্ত সমন্বয় বুদ্ধিগোচর না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত রহস্যের ভেদ হইতে পারে না। অগ্নি সংহারের প্রতীক, সোম সৃষ্টির প্রতীক। কিন্তু সংহার কেবল অগ্নি দ্বারা হয় না এবং সৃষ্টিও কেবল সোমের দ্বারা হয় না। সোম অথবা চন্দ্রের কলা বিগলিত হইয়া সৃষ্টির উপাদানরূপে পরিণত হয় কিন্তু এই বিগলনের মূলে আছে দাহিকাশক্তিসম্পন্ন অগ্নির ক্রিয়া। সুতরাং সৃষ্টি চন্দ্রকলা হইতে হইলেও চন্দ্রবিন্দু হইতে হয় না। চন্দ্রবিন্দু বিগলিত হইয়া বিশ্বের উপাদানরূপে পরিণত হয়। কিন্তু এই বিগলনের মূলে যে শক্তি কার্য করিতেছে তাহাই অগ্নি। সুতরাং অগ্নির সাহায্যে চন্দ্রকলা হইতে সৃষ্টি হয়। ঠিক সেই-প্রকার সংহার হয় অগ্নির দ্বারা কিন্তু কেবল অগ্নি প্রজ্বলিত না হইয়া সংহার কার্য সম্পাদন করিতে পারে না। সেই অগ্নিকে পুষ্ট করিবার জন্য চন্দ্রকলা আবশ্যক হয়। ইন্ধন অথবা তৈল ব্যতীত যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া স্থিতিশীল হইতে পারে না, ইহাও সেইপ্রকার। চন্দ্র হইতে সৃষ্টি হয় বটে কিন্তু তাহাতে অগ্নির সাহায্য দরকার। অগ্নি হইতে সংহার হয় ইহা সত্য কিন্তু তাহার পশ্চাতে চন্দ্রের সম্বন্ধ দরকার। কিন্তু যখন অগ্নি ও সোম এই উভয়ের মাত্রায় বৈষম্য না থাকে তখন একদিকে যেমন সৃষ্টি হইতে পারে না অপরদিকে তেমনি সংহারও হইতে পারে না। এই মধ্যস্থ সৃষ্টি-সংহারশূন্য অবস্থাকে স্থিতি বলে। ইহার দ্যোতক সূর্য। এখানে ব্যবহারের জন্য স্থিতি বলিতে আপেক্ষিক স্থিতি গ্রহণ করিতেছি, নিরপেক্ষ স্থিতির কথা বলা হইতেছে না। কিন্তু আপেক্ষিক হইলেও তাহার পশ্চাতে নিরপেক্ষ সত্তা থাকা আবশ্যক। এই যে নিরপেক্ষ

অগ্নিকলা ও সোমকলার সাম্য—ইহাই স্থিতিবিধায়ক। এই যে স্থিতি ইহাই অগ্নি ও সোমের নিত্য সামরস্য। ইহাকেই বলে সূর্য।

সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে যে একই সবিতার একদিকে চন্দ্রের ক্রিয়া হয়, অপরদিকে অগ্নির ক্রিয়া হয়। এই যে নিত্য স্থিতিবিন্দু ইহা এক হইয়াও এক নয় এবং এক না হইয়াও এক। ইহাকেই বলা হয় কামতত্ত্ব। সূর্য অথবা কাম একই বস্তু। এই অগ্নি ও সোমের সামরস্যটি নিত্য সামরস্য, সেইজন্য বাহ্য জগতেও ইহার সন্ধান লাভ করা যায়। সূর্যকিরণ হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সংহার হয়—ইহা বালক-বালিকাও জানে, কিন্তু সূর্য হইতে চন্দ্রকলা প্রকট হইয়া জগতের যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করে—ইহা সাধারণ প্রৌঢ়গণও জানেন না। সূর্যের মধ্যেই অগ্নিশক্তিও আছে, সোমশক্তিও আছে। অগ্নিশক্তি দ্বারা ধ্বংসের কার্য হয়, সোমশক্তি দ্বারা সৃষ্টির কার্য হয়।

কামকলার প্রধান বিন্দুই রবি বা সূর্য—এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যে ভাগবতী সৃষ্টির এবং প্রেমময় জগতের আবির্ভাবের কথা বলা হইতেছে তাহা এই কামকলারই কার্য। ইহার বিস্তারিত আলোচনা ভবিষ্যতে করা যাইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সূর্যের অন্তর্বর্তী এই অগ্নিশক্তি ও সোমশক্তির ব্যাপার জগতে নিরন্তর চলিতেছে কিন্তু জগৎ তাহা জানে না।

আমরা পরমশিবের কথা মাঝে মাঝে বলিয়া থাকি। কিন্তু পরমশিব যে কি বস্তু সে ধারণা আমরা অল্পই করিতে পারি। নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা সহজ, সগুণ ঈশ্বরের ধারণাও সহজ। জীবের ধারণা সহজ, জগতের ধারণাও সহজ। কিন্তু পরমশিবের স্বরূপকল্পনা অত্যন্ত কঠিন। শাস্ত্রের যাবতীয় বিষয় স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে—অবশ্য আপন আপন দৃষ্টি অনুসারে। কিন্তু কামকলার আলোচনা করিতে হইলেই তাহার পৃষ্ঠভূমিতে পরমশিবকে রক্ষা করিতে হয়। পরমশিব ব্যতীত শিব-শক্তির সামরস্যরূপ বিন্দু পাওয়া যাইবে না। ব্রহ্মতত্ত্বে তাহা নাই, ঈশ্বরতত্ত্বেও তাহা নাই। শিবরূপী মহাপ্রকাশ এবং শক্তি বা বিমর্শরূপী উচ্ছ্বাস একসঙ্গে সমন্বিত হইয়া সমরসভাবে প্রকাশ হইলে যে অবস্থার সূচনা পাওয়া যায়, তাহাতে integration-এর চরম অভিব্যক্তি হয়। তাহাই অখণ্ড, তাহাই সামরস্য। এই যে শিব-শক্তির সামরস্য, এই সামরস্যের একটা দিক্ আছে তাহা সৃষ্টির অনুকূল এবং অপর একটি দিক্

আছে তাহা সৃষ্টির নিত্যবিরোধী। প্রকাশ নিত্যপ্রকাশ তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার প্রকাশমানতা যাহার প্রভাবে ঘটিয়া থাকে তাহাই বিমর্শ। প্রাচীন তান্ত্রিক আচার্যগণ ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই পরাবাক্ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। কেহ কেহ শব্দব্রহ্ম নামেও ইহাকে আখ্যায়িত করেন এবং এইস্থলে একদিকে পরব্রহ্ম এবং অপর দিকে শব্দব্রহ্ম এই দুইটি শব্দের প্রয়োগ হয়। একদিকে শিব, অপর দিকে শক্তি, দুইটি সত্তার অভিন্নতা প্রকাশিত হয়। ইহাই সৃষ্টির বীজ। এই সৃষ্টি কামকলার সৃষ্টি। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত এই সৃষ্টির সন্ধান না পাওয়া যায় ততদিন পর্যন্ত যে সৃষ্টির চর্চা আমরা করিয়া থাকি, তাহা হয় মায়িক, মায়াপ্রসূত অথবা মহামায়িক অর্থাৎ বৈন্দব। প্রাচীন আচার্যগণ বিশ্বসৃষ্টির মূলে এই কামকলার ক্রিয়া দেখিতে পাইতেন। কিন্তু সকলেই যে পাইতেন তাহা নহে, কারণ যাহার দৃষ্টিতে শিব-শক্তির সামরস্য ভাসে না তাহার পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। বিশ্বরচনা হয় তিন স্তরে। আমরা যে ভাবে বিশ্বকে পাই তাহা উহার স্থূলরূপ। উহার যেটি সূক্ষ্মরূপ, সেটি তত্ত্বরূপ এবং উহার যেটি চরম কারণরূপ তাহা কলারূপ। সুতরাং বিশ্বকে কলাময়রূপেই সাধারণতঃ পাওয়া সম্ভব। এই যে কলা ইহাই চিৎকলা। ইহা চিৎ হইতে বিলক্ষণ। শিব চিৎস্বরূপ এবং শক্তি তাঁহার কলাস্বরূপ এবং এই দুইটি—যেখানে সমরস, তাহাই কামরূপী বিন্দু। এই বিন্দুর একটা বহির্নিঃসৃতি আছে, সেইটি হার্ধ-কলারূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই হার্ধকলা নানাপ্রকারে তরঙ্গিত হইয়া তত্ত্ব সৃষ্টি করে। ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বই হউক্ অথবা যে কোনো সংযোগবিশিষ্ট তত্ত্বই হউক্ না কেন তাহার পশ্চাতে বা মূলে হার্ধকলা আছে। যাঁহারা মন্ত্র-রহস্যবিৎ তাঁহারা এই হার্ধকলা বিশেষরূপে জানেন। এই যে সৃষ্টি, যাহা শিব-শক্তি সামরস্যমূলক, তাহাই আনন্দময়ী সৃষ্টি। যে সৃষ্টির সহিত আমরা পরিচিত তাহা দুঃখময়ী সৃষ্টি, তাহা শিব-শক্তির সামরস্য হইতে হার্ধকলারূপে উদ্ভূত ধারাজন্য নহে। এইজন্যই নিষ্কল পরমশিব অবস্থা না হইলে কামবিন্দুর অভাববশতঃ আনন্দময়ী হার্ধকলার সৃষ্টি অনুভব করা যায় না।

যাঁহারা মন্ত্র-বিজ্ঞান আলোচনা করেন তাঁহারা জানেন যে শাক্তমন্ত্রের প্রাণ-বস্তুই হইল হার্ধকলা। যে কোন মন্ত্র হউক্ না কেন, মূলে তাহার যেটি চৈতন্য-শক্তি তাহাই প্রাণবস্তু। পূর্ণাহন্তা বিশুদ্ধ চৈতন্যের স্বরূপ। তন্ত্রশাস্ত্রে নানাপ্রকার চক্ররচনার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এইসব চক্র দিব্য ভুবনস্বরূপ। মন্ত্র যে

প্রকার অসংখ্য তদ্রূপ চক্রও অসংখ্য। তবে অভিব্যক্তির তারতম্য আছে। চক্রতত্ত্ব আলোচনা করিবার পূর্বে মন্ত্র সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

শৈবাগম প্রভৃতি আগম শাস্ত্রে এবং শাক্তাগমের কামকলা বিষয়ক গ্রন্থে যাহা জানিতে পারা যায় তাহা হইতে বুঝা যায় শৈবাগমের প্রসিদ্ধ মন্ত্র এবং শাক্তাগমের মন্ত্রতত্ত্ব ঠিক একপ্রকার নহে। আপনাপন ভূমিতে উভয়ই সত্য কিন্তু উভয়ে পার্থক্য আছে। সিদ্ধান্তশৈব মতে এবং অন্যান্য দ্বৈত শৈবমতেও মন্ত্র শুদ্ধবিদ্যার নামান্তর। এই মন্ত্রের অধিষ্ঠাতাকে মন্ত্রেশ্বর বলে এবং তাহারও পরাবস্থার নাম মন্ত্রমহেশ্বর। এই যে মন্ত্র ইহা শুদ্ধবিদ্যারূপ ভগবদনুগ্রহেরই প্রকাশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে মায়ার সংস্পর্শ আছে। যদিও এই মায়া মহামায়ারূপী তথাপি তাহাকে মায়া না বলিয়া অন্যরূপে বর্ণনা করা সম্ভব নহে। এই মন্ত্র বিশ্লেষণ করিলে জানিতে পারা যায় যে ইহাদের কতকগুলি শুদ্ধজগতে অর্থাৎ মহামায়ার জগতে কার্য করে এবং কতকগুলি মায়ার জগতে কার্য করে। কিন্তু মন্ত্রের অধিষ্ঠাতা উভয়ত্র বৈন্দবদেহসম্পন্ন অধিকারী পুরুষ। অপরমন্ত্রেশ্বররূপে এই অধিকারী পুরুষ মায়িক জগতে কার্য করেন এবং পরমন্ত্রেশ্বররূপে তিনি মায়াতীত শুদ্ধ জগতের অধিষ্ঠাতা। এই মন্ত্র শুদ্ধ হইলেও ইহাতে মায়ার অংশ মিশ্রিত আছে। বৈন্দব জগৎ কুণ্ডলিনীস্বরূপ মহামায়ার অন্তর্গত এবং শাক্তগণ যে মন্ত্রের কথা বলিয়া থাকেন, উহার মূলে আছে শিব-শক্তির সামরস্য। এই সামরস্যের ফলে পূর্ণাহন্তা উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠে। ইহাই মন্ত্রের প্রাণশক্তি। কিন্তু মহামায়ার জগতে যে সকল মন্ত্র বিরাজ করে তাহাতে এই শিব-শক্তির সামরস্য নাই।

এই বিষয়টি বুঝিতে হইলে একটি ক্রম অবলম্বন করিয়া তত্ত্বদর্শন আবশ্যক। সিদ্ধান্তীগণ বলেন, শিব, শক্তি ও বিন্দু—ইহাই তাঁহাদের রত্নত্রয়। শিব চিৎস্বরূপ, শক্তি চিদ্রূপা কিন্তু বিন্দু চিৎস্বরূপ নহে। বিন্দু শুদ্ধ মায়ারূপী পরিগ্রহশক্তিরূপ অচিৎ তত্ত্ব। শিব এবং শক্তি উভয়ই চিৎস্বরূপ—একথা বলা হইয়াছে। কিন্তু শিব নিষ্ক্রিয়, শক্তি ক্রিয়াত্মিকা। শিবে যখন শক্তির অভিব্যক্তি হয় তখন তাহা ইচ্ছারূপেই হয় অর্থাৎ শিবের যাহা ইচ্ছা তাহাই শক্তির স্বরূপ। এই শক্তি সমবায়িনী শক্তি নামে প্রসিদ্ধ। ইহা শিবের সহিত নিত্য অভিন্নভাবে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু বিন্দু এরূপ নহে। বিন্দুও শিবেরই শক্তি, তবে সমবায়িনী নহে, পরিগ্রহ শক্তি, যাহার নামান্তর উপাদান শক্তি। বিন্দুর উপাদান জড়—

সেইজন্য শিবে ইচ্ছার উদয় হইলে ঐ ইচ্ছারূপা শক্তির আঘাতে বিন্দু ক্ষুব্ধ হয় এবং ক্ষুব্ধ হওয়ার পর সেই আকার গ্রহণ করে। ইহারই নাম মহামায়ার ক্রিয়া। মহামায়ার ক্রিয়া হইতে শুদ্ধ জগৎ উৎপন্ন হয়, যাহার নামান্তর বৈন্দব জগৎ। মায়াজগৎ মহামায়ার অধঃপ্রদেশে বিদ্যমান। মায়ায় সঞ্চালন হয় মহামায়ার স্তর হইতে। মহামায়ার সঞ্চালন হয় শক্তি বা চিৎশক্তি হইতে এবং চিৎশক্তির সঞ্চালন স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে। তাহা হইলে বুঝা গেল, শিবের সমবায়িনী শক্তি ইচ্ছারূপ পরিগ্রহ করিলে বিন্দুরূপ শুদ্ধ উপাদান অর্থাৎ মহামায়া ঐ শক্তির অনুরূপ আকার ধারণ করে। এই শক্তির আকার যতই শুদ্ধ হউক্ না কেন সম্পূর্ণ চিদাত্মক নহে। এই কথাটি মনে না রাখিলে মহামায়া জগতের মন্ত্রতত্ত্ব আর শাক্তাগমের মন্ত্রতত্ত্ব—এই উভয়ের প্রভেদের রহস্য বুঝা যাইবে না।

শাক্তাগমের মন্ত্রতত্ত্ব সাক্ষাৎ চিৎশক্তিস্বরূপ, যাহার মূলে থাকে শিব-শক্তির সামরস্য। সুতরাং শাক্ত আগমের শক্তি যাহাকে মন্ত্ররূপা শক্তি বলা হয়, তাহা স্বভাবতঃই চিৎকলাময়, যাহার মূলে আছে শিব-শক্তির সামরস্য। মহামায়ার জগতে মন্ত্র ক্রিয়া করে এবং এই ক্রিয়ার ফলে মহামায়ার স্বরূপ পর্যন্ত অধিগত হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু মহামায়া ভেদ করিতে না পারিলে—শুধু ভেদ নহে, শিব-শক্তি সামরস্য না ঘটিলে কামকলার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে না। যে সকল যোগী মহামায়িক শব্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের স্থিতি চরম অবস্থায় শিবত্বলাভ। এই শিবত্বে শিব-শক্তির সামরস্য খেলা করে না। সুতরাং কামকলা হইতে উহার বিলক্ষণতা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে। ইহার পর আমরা চক্রনির্মাণ, চক্রাধিষ্ঠান এবং মূল শক্তির অবান্তর বিবিধ প্রপঞ্চ—এই-সকল বিষয়ে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব, কারণ ইহা না বুঝিলে কামকলা বিজ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

মন্ত্র ও উহার আনুষঙ্গিক বিষয় আলোচনা করিবার পূর্বে মন্ত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। মন্ত্র-বিজ্ঞান সুপ্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। বৈদিক-বিজ্ঞানও মন্ত্র-বিজ্ঞান, তান্ত্রিক-বিজ্ঞানও মন্ত্র-বিজ্ঞান এবং অন্যান্য প্রাচীন বহু বিজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায় যাহার মূলে মন্ত্রশক্তির ক্রিয়া সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মন্ত্রপদবাচ্য হইলেই সকল মন্ত্রই যে একপ্রকার, তাহা মনে করা চলে না। মন্ত্রের ভিতরও স্তরভেদ আছে, শক্তিগত ভেদ,

লক্ষ্যগত ভেদ আছে এবং এইরূপ নানাপ্রকার বৈচিত্র্য মন্ত্রবিজ্ঞান অনুশীলন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়। পতঞ্জলি যোগী ছিলেন, যোগশাস্ত্রের প্রবক্তা ছিলেন কিন্তু তিনিও মন্ত্র-বিজ্ঞানের প্রশংসা স্পষ্টভাবে করিয়াছেন। তাঁহার কৈবল্যপাদের প্রথম সূত্রেই মন্ত্র ও তজ্জন্য সিদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ স্থানে নির্মাণকায় বা নির্মাণচিত্তের প্রসঙ্গে নির্দেশ করা হইয়াছে যে মন্ত্রশক্তির দ্বারাও নির্মাণচিত্ত রচিত হইতে পারে। তবে তিনি যোগমার্গে প্রসিদ্ধ ধ্যানজ নির্মাণচিত্তেরই প্রশংসা করিয়াছেন—ইহা সত্য। মায়ারাজ্যে মায়াশক্তির অন্তর্গতরূপে মন্ত্রশক্তির পরিচয় আপামর সাধারণ সকলেই প্রায় জানেন এবং এই সিদ্ধির অলৌকিকত্বও সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু ইহা ক্ষুদ্র সিদ্ধি। মায়াশক্তির প্রভাবে, অবশ্য তারতম্য অনুসারে, অন্যান্য লৌকিক শক্তির স্তম্ভন অথবা নিরাকরণ সম্ভবপর—ইহা প্রচলিত বহু তান্ত্রিক গ্রন্থ হইতেও জানিতে পারা যায় কিন্তু এই সকল শক্তির আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ নাই, কারণ এই সকল ক্ষুদ্র মায়িক শক্তি ইন্দ্রজাল এবং নানাপ্রকার অলৌকিক কৃত্যরূপেই আত্মপরিচয় দিয়া থাকে। ক্ষপণক, দিগম্বর প্রভৃতি সম্প্রদায়, তাল-বেতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়, কাপালিকদের মধ্যেও কেহ কেহ এই জাতীয় শক্তির অনুশীলন করিয়া থাকেন। শঙ্করাচার্যের 'সৌন্দর্যলহরী'র লক্ষ্মীধর-কৃত টীকাতে বহু ক্ষুদ্র তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের এবং তাহাদের অলৌকিক সিদ্ধির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই মন্ত্রমূলক কিন্তু বলা বাহুল্য, এই সকল মন্ত্র মায়ারাজ্যের বিষয়। প্রকৃত শুদ্ধ মন্ত্র মহামায়া রাজ্যের বিষয়। মহামায়া রাজ্যেরই নামান্তর বৈন্দব রাজ্য। বিন্দুর নামান্তর চিদাকাশ। এই মহামায়িক বা বৈন্দব রাজ্য শুদ্ধমায়ার রাজ্য। জীব যখন সদ্‌গুরুর কৃপা প্রাপ্ত হয় তখন এই রাজ্যেই তাহার প্রতিষ্ঠা হয়। শুদ্ধ তত্ত্বপঞ্চকের মধ্যে শুদ্ধবিদ্যা নামক তত্ত্বই মন্ত্রশক্তির প্রাপ্তি ও বিকাশের ক্ষেত্র। কোনো সাধক বা যোগীর মলপাক সম্পূর্ণ হইলে শ্রীভগবানের কৃপা সদ্‌গুরুর মুখ হইতে মন্ত্ররূপে নিঃসৃত হইয়া তাহাকে মায়িক রাজ্য হইতে উদ্ধারের পথে লইয়া যায়। এইখানে সদ্‌গুরু হইতে সে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় তাহার নাম শুদ্ধবিদ্যা। শুদ্ধবিদ্যা অহন্তারই আত্মপ্রকাশ, অবশ্য আধার অনুসারে। এই অহন্তা পূর্ণাহন্তা নয়, ইহা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে, পূর্ণা-হন্তার কথা ইহার পরে বলিতেছি।

সাধক যোগী সদ্‌গুরুপ্রদত্ত এই মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধবিদ্যাভূমিতে অবস্থান

করে। এই অবস্থাটি শুদ্ধ জগতের দ্বারস্বরূপ। শুদ্ধ জগতে অহন্তার প্রাধান্য এবং ইদন্তার অভিভব ক্রমশঃ ঘটিয়া থাকে। এই মার্গের প্রারম্ভই শুদ্ধবিদ্যাতে। কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতেছি :—মায়িক জগতের মনুষ্যমাত্রেই দেহাভিমানবিশিষ্ট—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ প্রভৃতি প্রাকৃত তত্ত্বে অহংভাবের অভিনিবেশ—ইহাই তাহাদের বৈশিষ্ট্য। এইটি অজ্ঞান। অচিদ্ বস্তুতে চিদ্-ভাবের আরোপ করিয়া এই জ্ঞানের উদ্ভব হয়। সদ্‌গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের প্রভাবে ক্রমশঃ এই অজ্ঞান কাটিয়া যাইতে থাকে। অজ্ঞান দুইপ্রকার—অচিৎসত্তাতে চিদ্‌ভাব এবং চিৎসত্তাতে অচিদ্‌ভাব। মায়িক জগতের জীবের মধ্যে মুখ্য অজ্ঞান অচিৎসত্তায় চিদ্‌ভাবনা অর্থাৎ দেহাদিতে অহংবোধ। সাংখ্য অথবা পাতঞ্জল মার্গে এই অজ্ঞানের নিবৃত্তির ফলে কৈবল্যের প্রাপ্তি ঘটে অর্থাৎ অচিৎরূপা প্রকৃতি ও প্রকৃতির বিকার হইতে নিজেকে চিদ্‌রূপে পৃথক্ মনে করা —ইহাই বিবেকজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। এই জ্ঞানের ফলে ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না কিন্তু সংসার নিবৃত্তি হয় এবং কর্মক্ষয় হইয়া যায় বলিয়া জন্মান্তরের সম্ভাবনা থাকে না। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীবের অধোগতি রুদ্ধ হইয়া যায় কিন্তু উর্ধ্বগতি প্রাপ্তি হয় না। কেবলী পুরুষ ত্রিশঙ্কুর ন্যায় ঐ কেবলী অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকেন, তাঁহার উপরে উঠিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যাঁহারা সদ্‌গুরুর কৃপায় শুদ্ধবিদ্যা প্রাপ্ত হ'ন তাঁহারা সংসার ও জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণ প্রভৃতি হইতে এবং কৈবল্য হইলেও উদ্ধার পান, কারণ গুরুদত্ত মন্ত্ররূপী শুদ্ধবিদ্যা বিদেহ আত্মাকে বৈন্দবদেহ দান করে। ইহাই জ্ঞানদেহ। এই দেহ কালের অধীন নহে। এই দেহে অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই নিজের মধ্যে শুদ্ধ অহং অভিমানের কিঞ্চিন্মাত্র উদিত হয়। ইহাই মন্ত্রজগতে ক্রমবিকাশের প্রারম্ভ। মন্ত্র অবস্থার পর মন্ত্রেশ্বর অবস্থা—ইহা শুদ্ধবিদ্যার উপরকার তত্ত্ব এবং এইপ্রকার পরপর আরও তত্ত্ব আছে। এইপ্রকার তত্ত্ব হইতে তত্ত্বান্তরে যোগীর ক্রমবিকাশ ঘটে অর্থাৎ যে মন্ত্রতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সে স্বাতন্ত্র্যশক্তির ক্রমবিকাশে ঈশ্বরতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এইপ্রকারে ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে সদাশিবতত্ত্বে উন্নীত হয় ইত্যাদি। এইপ্রকারে অহং ভাবের ক্রমশঃ বিকাশ হয় এবং ইদং ভাবের তিরোধান ঘটিয়া থাকে। যে এই অবস্থার চরম অবস্থা—যাহা তত্ত্বের মধ্যে শিবশক্তিরূপে পরিচিত—তাহা প্রাপ্ত হয়, সে শিবত্বলাভ করে অথবা শক্তিভাব লাভ করে অধিকার অনুসারে কিন্তু পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে না। শিব অপূর্ণ,

শক্তিও অপূর্ণ। মহামায়ার জগতে শিবই শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব কিন্তু তাহাতেও মল আছে, শক্তিতে তো আছেই এবং এই মল আণব মল নামে প্রসিদ্ধ। শিব বিশুদ্ধ-বোধস্বরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু শক্তিহীন—ইহাই তাহার অপূর্ণতা। তদ্রূপ পূর্ণশক্তি স্বাতন্ত্র্যরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাও অপূর্ণরূপ, কারণ ইহা জড় শক্তি—ইহাতে বোধ নাই। শিব বোধস্বরূপ, শক্তি স্বাতন্ত্র্যস্বরূপ—যখন এই দুইটি স্বরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখনই পূর্ণতা। কিন্তু মহামায়া জগতে তাহা সম্ভব নয়, মহামায়া ভেদ করিতে পারিলে তাহা উদয় হয়। মহামায়া ভেদ করিলে যে পূর্ণত্বের উদয় হয় তাহাই পরমশিব বা পরাসংবিৎ নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থলে শিব ও শক্তিতে কোনো ভেদ নাই। এইটিই শিবশক্তির সামরস্য এবং ইহাই নিষ্কল অবস্থা। মাহামায়ার জগতে শিবও স-কল, শক্তিও স-কল। শক্তির কলা শান্তিরূপা, শিবের কলা শান্ত্যতীতা। কিন্তু আত্মার পূর্ণস্বরূপে কোনো কলা নাই, ইহা নিষ্কল অবস্থা। এই আত্মাই পরমশিব, এই আত্মাই পরাসংবিৎ, এই আত্মাই পূর্ণ—এই উভয়ের সামরস্য আশ্রয় করিয়াই কামকলার বিকাশ হয়। কামকলাবিজ্ঞান মহামায়ার জগতের যোগীর জন্য নহে, ইহা শাক্ত যোগীর জন্য। এই জন্যই পূর্বে বলা হইয়াছে যে মায়া তো দূরের কথা, মহামায়ার রাজ্যেও মন্ত্রের পূর্ণত্ব ঘটে না, কারণ শিব-শক্তির ভেদ রূপ কলা তখনও থাকিয়া যায়। কিন্তু পরাসংবিতের রাজ্যে যাহাকে পরমশিবের স্থিতি বলা হয়, তাহাই আত্মার পূর্ণ স্থিতি। সেইখানে যে মন্ত্রের প্রকাশ হয় তাহাই প্রকৃত মন্ত্র—যাহার কথা আমরা ভবিষ্যতে আলোচনা করিব।

Note :—[আমরা মন্ত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে মায়ান্তর, মহামায়ান্তর এই দুইটি পৃথক্ স্তরের উল্লেখ করিয়া সর্বোপরি শাক্ত স্তরের কথা বলিয়াছি। মায়ার তো কথাই নাই, মহামায়া পর্যন্ত শিব-শক্তিতে মিলন হয় না। মহামায়ার উর্ধ্বে যে ভূমি ঐটি অদ্বৈত ভূমি—ঐখানে শিব-শক্তির ভেদ থাকে না—ইহাও পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এই অদ্বৈতভূমি সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে হইতেছে। এই অদ্বৈত ভূমিতে পরমশিব ও পরাশক্তি অভিন্নরূপে প্রকাশ-মান থাকে কিন্তু এই অভিন্ন প্রকাশ সত্ত্বেও বাহ্য দৃষ্টিতে একটা বিভাগ রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এইটি অদ্বৈত ভূমি তাহা সত্য, কিন্তু শৈবগণের দৃষ্টিতে এইটি পরমশিবের অবস্থা। পরাশক্তি তাঁহার সহিত অভিন্ন, ইহা মনে রাখিতে

হইবে। কিন্তু শাক্তগণের দৃষ্টি অন্যপ্রকার। যাঁহারা কুলমার্গের ইতিহাস অবগত আছেন তাঁহারা ইহা অবশ্যই জানেন। শাক্তগণ শক্তি-অদ্বৈতবাদী। তাঁহাদের মতে এইটি মহাশক্তির অবস্থা—মহাপ্রকাশরূপ পরমশিব তাঁহার সহিত অভিন্ন 'ত্রিপুরা রহস্য' প্রভৃতি শাক্তাদ্বৈত সম্প্রদায়ের গ্রন্থ জানিতে হইবে। 'শিবদৃষ্টি' নামক গ্রন্থ শৈবাদ্বৈতবাদিগণের মূল গ্রন্থ। আরও রহস্যের বিষয় এই যে প্রাচীনকালে সোমানন্দের ন্যায় সর্বজনপূজ্য বিশিষ্ট আচার্যও একসঙ্গে দুই নৌকায় পা দিয়াছিলেন। তাঁহার 'শিবদৃষ্টি' নামক গ্রন্থ শৈবাদ্বৈত সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে পরমশিবের প্রাধান্যই অঙ্গীভূত হইয়াছে, যদিও শিব-শক্তি সর্বথা অভিন্ন ইহাও অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এই সোমানন্দের আরও একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে তাহা 'পরাত্রিংশিকা' নামক গ্রন্থের 'বিবরণ' নাম্নী টীকা। এই টীকা গ্রন্থে সোমানন্দ স্বয়ং শাক্তাদ্বৈতপক্ষই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় তিনি শিবাদ্বৈতপক্ষ, শক্তি-অদ্বৈত পক্ষ, উভয়ই সমর্থন করিতেন। ভক্তের চিত্ত যেদিকে ধাবিত হয় সেই পক্ষই গ্রহণ করা উচিত। সিদ্ধান্তদৃষ্টিতে উভয়ই সত্য।]

জপ-রহস্য*

১

জপসাধনা অধ্যাত্ম সাধনবিজ্ঞানের মধ্যে একটি সুপরিচিত সাধনা হইলেও ইহার নিগূঢ় রহস্য সাধারণের পক্ষে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা মাত্র। বৈদিক, পৌরাণিক, স্মার্ত, তান্ত্রিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সকল সাধনাতেই জপের মহত্ত্ব ও আবশ্যকতা মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে। সুফী সাধক ও ফকীরদের মধ্যে এবং খৃষ্টীয় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ভক্তদের মধ্যে জপের প্রথা অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে। যোগিগণ জপের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন—তাঁহারা বলেন ইহা ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত স্বাধ্যায়েরই প্রকার বিশেষ মাত্র। সুষ্ঠুভাবে যথাবিধি অনুষ্ঠান হইলে ইহার ফলে পরমাত্মার প্রকাশ ও ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে এবং অন্যান্য বহু আনুষঙ্গিক ফলের উদয় হয়। যে নাদানুসন্ধানের মহিমা হঠযোগী, রাজযোগী, মন্ত্রযোগী ও লয়যোগী সমভাবে ঘোষণা করিয়া থাকেন তাহাকে জপেরই একটি বিশিষ্ট অবস্থার নামান্তর বলিয়া গ্রহণ করা চলে। প্রাচীন শাব্দিকগণ ইহাকে 'বাগ্‌যোগ' বলিয়া বর্ণনা করিতেন এবং "ইয়ং হি মোক্ষমাণানামজিহ্মা রাজপদ্ধতিঃ" অর্থাৎ মুমুক্ষু মনের পক্ষে ইহাই সরল রাজমার্গ বলিয়া ইহার সর্বোপযোগিতা স্বীকার করিতেন। মধ্যযুগের সন্তগণ 'সুরতশব্দযোগ' নামক যে যোগপন্থার অনুসরণ করিতেন তাহা বাগ্‌যোগেরই প্রকারভেদ মাত্র। যোগের কঠিন প্রক্রিয়া, যজ্ঞের জটিল বিধান, জ্ঞানমার্গের বিচারবহুল গভীর ভাবনা এবং ভাবভক্তির রসময় উল্লাস, সকল সাধকের পক্ষে সুলভ নহে। কিন্তু জপ সকলের পক্ষেই অল্পায়াসসাধ্য। অথচ ঠিকভাবে করিতে পারিলে উহা হইতে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ প্রভৃতি সকল সাধনারই ফললাভ সহজ হয়। শুধু তাহাই নহে, সবিশেষ ভাবের পূর্ণতা এবং যাবতীয় বিশেষের উপশম অর্থাৎ ব্রহ্মের মহান্ ও পরম রূপ নাদাশ্রয়বশতঃ জাপকের পক্ষে যতটা সুগম হয় অন্য সাধকের পক্ষে ততটা হয় না।

*স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী বিরচিত "জপসূত্রম্" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা।

গ্রন্থকারকে গ্রন্থমধ্যে প্রস্তুত বিষয়ের স্পষ্টীকরণের জন্য আনুষঙ্গিকভাবে বহু তত্ত্বের আলোচনা করিতে হইয়াছে। মন্ত্র, যন্ত্র এবং তন্ত্র কাহাকে বলে, মন্ত্রজপরূপা ক্রিয়ার নিষ্পত্তি কি ভাবে হওয়া উচিত, উহার চরম লক্ষ্য কি, ধ্বনি (নাদ), সংখ্যা ও ভাব বা অর্থের, অর্থাৎ বাক্, প্রাণ ও মনের বা অগ্নি, সূর্য ও চন্দ্রের স্বরূপ ও প্রকারভেদ কি, জপের অন্তরায় কি এবং অন্তরায়নিবৃত্তির উপায় কি—এই জাতীয় বহু প্রশ্নের সমাধান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে সপ্তব্যাহৃতি রহস্য ও মহামায়া তত্ত্ব প্রাসঙ্গিক বহু বিষয়ের সহিত সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। এ আলোচনার তুলনা নাই। চিৎশক্তি শুধু চিন্মাত্র বা প্রকাশমাত্র নহে—উহা চিতের নিজেকে বিশেষ বিশেষভাবে ঈক্ষণের সামর্থ্য। উভয়ই স্বরূপতঃ এক হইলেও উভয়ে বৈলক্ষণ্য আছে। এই বৈলক্ষণ্য স্বীকার করিয়াই উভয়ের অদ্বয়তা স্বীকার্য। বিমর্শহীন প্রকাশ প্রকাশমান হয় না বলিয়া অপ্রকাশ বা অসৎকল্প। কিন্তু প্রকাশ ত বিমর্শহীন হয় না। তাই প্রকাশের স্বপ্রকাশতা ও সদ্‌ভাব অক্ষুণ্ণই থাকে। সৎ ও অসৎ এই বিরুদ্ধভাব বিকল্প মাত্র—নির্বিকল্প বা অদ্বয়ই তত্ত্বাতীত পরম তত্ত্ব। গ্রন্থকার আগম ও উপনিষদের সারাংশ স্বকীয় অপূর্ব যুক্তি ও বিবেচন-সরণি দ্বারা এমন মনোজ্ঞভাবে সুকৌশলে স্থাপন করিয়াছেন যে উহা মন্দবুদ্ধি পাঠকেরও বোধগম্য না হইয়া পারে না। তবে আন্তরিকতা ও মনোনিবেশ আবশ্যক।

আর একটি বিষয়ে দুই একটি কথা বলা উচিত মনে হইতেছে। বর্ণমাতৃকা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকিলে প্রাণের স্পন্দনের তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না। তন্ত্রশাস্ত্রে এই জন্য মাতৃকার বিবেচন করা হইয়াছে। প্রাচীনকালের কোন কোন মূল আগম গ্রন্থে বর্ণমালার বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। অভিনব গুপ্ত, স্বতন্ত্রানন্দ নাথ প্রভৃতিও এ বিষয়ে আপন আপন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনা করিয়াছেন। বর্তমান সময়েও কোন কোন মহাত্মা অল্পবিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে জপসূত্রকার অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ও সমন্বয় শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। আশা করি ভবিষ্যতে এই গ্রন্থের বিস্তারিত সমালোচনার অবসরে কোন মনীষী তুলনামূলক রীতিতে প্রাচীন ভারতের বর্ণবিজ্ঞান রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিবেন। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও জৈন আগমে সর্বত্রই এই বিষয়ে বহু তথ্য পাওয়া যাইতে পারে।

২

শাস্ত্রে আছে—শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত হইলে পরব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। শব্দাতীত পরম পদের সাক্ষাৎকার করিতে হইলে শব্দ আশ্রয় করিয়াই শব্দরাজ্য ভেদ করিতে হয়। সমগ্র বিশ্ব শব্দ হইতে উদ্ভূত এবং শব্দেই বিধৃত। "শব্দেষ্বে-বাশ্রিতা শক্তির্বিশ্বস্যাস্য নিবন্ধনী", "বাগেব বিশ্বা ভুবনানি যজ্ঞে বাচ ইৎ সর্বমমৃতং যচ্চ মর্ত্যম্" ইত্যাদি শাস্ত্রবচন হইতে জানা যায় যে শব্দই জগৎ-সৃষ্টির মূল। সৃষ্টির বাহিরে যাইতে হইলেও শব্দই একমাত্র আলম্বন। সেইজন্য জপসাধনাতে শব্দকে ধরিয়াই শব্দাতীত পরব্রহ্ম পদে যাওয়ার উপদেশ আছে।

বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা ভেদে চারি প্রকার বাকের কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। বৈখরী বাক্ শব্দের নিম্নতম স্তর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাকে ধরিয়া ক্রমশঃ পরাবাক্ পর্যন্ত উঠিবার এবং পরে উহাকেও অতিক্রম করিবার প্রয়োজন আছে। বৈখরী ইন্দ্রিয়গোচর সমগ্র স্থূল বিশ্বে ও স্থূল দেহে অনন্তপ্রকারে তৎ তৎ স্থান অনুসারে কার্য করিতেছে। 'বৈখরী বিশ্ববিগ্রহা'। ইহাকে অতিক্রম করিতে না পারিলে মনুষ্য স্থায়ীভাবে বহির্মুখ বৃত্তি পরিহার করিয়া আন্তরবৃত্তির আশ্রয় লাভ করিতে পারে না।

আত্মা স্বরূপতঃ পূর্ণপ্রকাশাত্মক পরমেশ্বররূপ, স্বতন্ত্র ও ভোক্তা হইলেও স্বেচ্ছাপূর্বক জীবভাব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও ভোক্তৃভাব লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। আত্মাতে অখিল শক্তির অভেদে সমন্বয় আছে বলিয়া আত্মার পূর্ণাহন্তাব স্বভাবসিদ্ধ। 'অ' হইতে 'হ্' পর্যন্ত যাবতীয় বর্ণ বা কলা পরস্পর ও আত্মার সহিত অভিন্নরূপে অখণ্ডভাবে স্ফুরিত হওয়াই আত্মার পূর্ণাহন্তা। ইহারই নামান্তর চৈতন্য, বিমর্শ, স্বাতন্ত্র্য বা ঐশ্বর্য। এই সকল অকারাদি বর্ণের বাচ্য অনুত্তরাদি বিমর্শ আত্মার নিজ বিমর্শেরই স্বরূপভূত। অখণ্ড স্থিতিতে এসব এক ও অভিন্ন রূপেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু আত্মা স্বেচ্ছাপূর্বক সৃষ্ট্যুন্মুখ হইলে তাঁহার স্বরূপাশ্রিত নিজামর্শের লেশরূপে অনুত্তরাদি বাচক পূর্বোক্ত অকারাদি বর্ণ উদ্ভাবিত হয়। অদ্বৈত স্থিতিতে যে সকল কলা অভিন্নভাবে আন্তর শব্দ বা স্বভাবরূপে বিদ্যমান থাকে তাহারা তৎস্বরূপে অক্ষুণ্ণ থাকিয়াও সৃষ্টির উন্মেষ দশাতে যেন অংশতঃ বিভক্তরূপে ক্রমশঃ ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্ট বর্গশক্তি ও অ আ প্রভৃতি পঞ্চাশৎ রুদ্রশক্তিরূপে অবতীর্ণা হয়। পরে ঐ সকল শক্তি হইতে পদ-বাক্যসমূহরূপে অসংখ্য ক্ষুদ্রশক্তিসকল আবির্ভূত

হয়। অকারাদি, আত্মার নিজ বিমর্শস্বরূপ ও স্বাভিন্ন হইলেও, অজ্ঞানাবস্থাতে নিজাত্মা হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হয় বলিয়া কলা বা অংশ নামে আখ্যাত হয়। ইহারাই মাতৃকাশক্তি। ইহাদের দ্বারা আত্মার স্বীয় ঐশ্বর্য বা বিভব (আচার্য শঙ্কর দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রে মহাবিভূতি বলিয়া যাহার উল্লেখ করিয়াছেন) বিলুপ্ত-প্রায় হয়। কলা আত্মস্বরূপ হইতে উদ্ভূত হইয়া আত্মার ঐক্যভাবকে ঢাকিয়া রাখে। তখন শিবরূপী আত্মা জীব বা পশুরূপে আবির্ভূত হ'ন। ইহাই তাঁহার স্বরূপসঙ্কোচ বা অণুভাবপ্রাপ্তি। এই অণুরূপী প্রমাতা তখন পূর্ববর্ণিত অষ্টবর্গীয় ব্রাহ্মী-আদি শক্তি, অকারাদি রুদ্রশক্তি ও তদুত্থ পদবাক্যাদিময় অসংখ্য ক্ষুদ্র শক্তির ক্রীড়নক হইয়া পড়ে। মাতৃকাসকল অণু জীবের প্রতি সংবেদনেই অন্তঃপরামর্শন দ্বারা স্থূল-সূক্ষ্ম শব্দানুবেধ করে ও বর্গ বর্গী প্রভৃতি দেবতানিচয়ের অধিষ্ঠানের দ্বারা চিত্তে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, রাগ, দ্বেষাদি ভাব বা বৃত্তিসমূহ উদ্ভাবিত করে। এইপ্রকারে আত্মার অসঙ্কুচিত স্বাতন্ত্র্যময় চিদ্‌ঘন-রূপ আচ্ছন্ন হয় ও দেহাত্মভাব, পারতন্ত্র্য ও পাশবন্ধনের সূত্রপাত হয়।

মাতৃকার এই লয়বিক্ষেপকারক প্রভাব বৈখরী বাকে অত্যন্ত প্রস্ফুট। চিদুন্মেষের অভাববশতঃ সাধারণ মনুষ্য বৈখরীভূমিতে আবদ্ধ থাকে—ইহাকে লঙ্ঘন করিয়া মধ্যমাতে প্রবেশ করিতে পারে না। বৈখরী বাকের কার্যক্ষেত্র স্থূল হইলেও উহার প্রভাব অশুদ্ধ মনোময় স্তর, সূক্ষ্মভূত ও লিঙ্গশরীরেও লক্ষিত হয়। কালের আবর্তনে পর্যায়ক্রমে স্থূল ও সূক্ষ্মভাবের উদয়াস্ত হইয়া থাকে। একবার স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে গতি হয়, পুনর্বার সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে প্রত্যাগমন হয়, তদনন্তর স্থূল হইতে পুনরায় সূক্ষ্মের দিকে ধারা বহিতে থাকে। এইভাবে নিরন্তর স্থূল ও সূক্ষ্মের আবর্তন ঘটিয়া থাকে। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির আবর্তন এই মহা আবর্তনেরই একদেশ মাত্র। গতির এই আবর্তনভাব বৈখরী ভূমির বৈশিষ্ট্য। মলিন বাসনাবশতঃ গতির বক্রতা সম্পন্ন হয় বলিয়া নিম্ন-ভূমিতে আবর্তন স্বাভাবিক। ইহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার একমাত্র উপায় গুপ্তমার্গ অবলম্বনে সরল গতির সাহায্যে ঊর্দ্ধ্বদিকে ক্রমিক আরোহণ। মধ্যমা ক্ষেত্র হইতেই ইহার প্রারম্ভ হয়।

মধ্যমা ভূমিকে মন্ত্রময়ী ভূমি বলা হয়, কারণ মন্ত্ররূপেই মধ্যমা বাক্ আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে। মনের শোধন ও তাহার ফলে বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচনের সামর্থ্যলাভ ক্রমশঃ এই স্থান হইতেই হইয়া থাকে। মনুষ্যকণ্ঠ হইতে বৈখরী

বাক্ উত্থিত হয়—উহার মূলে মানসিক চিন্তা (চেতন ও অবচেতন উভয় ক্ষেত্রে) ও মনোগত ভাব বা অর্থ জড়িত থাকে। যোগিগণ যে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের সাঙ্কর্যের কথা বলিয়া থাকেন তাহা এই বৈখরী ভূমির শব্দকে লক্ষ্য করিয়াই বুঝিতে হইবে। স্মৃতিপরিশুদ্ধি দ্বারা সাঙ্কর্য পরিহার বৈখরী ভূমি হইতে মধ্যমা ভূমিতে প্রবেশের আনুষঙ্গিক রূপ মাত্র। বাকের সঙ্গে প্রাণশক্তি এবং মনঃশক্তি অবিনাভূতভাবে বিদ্যমান আছে এবং প্রাণসূত্র ধরিয়া পৃথিব্যাদি পাঁচটি মহাভূতেরও সম্বন্ধ আছে। তা ছাড়া, চিতের সম্বন্ধ তা আছেই। তবে বৈখরী স্তরে এই চিদংশ আচ্ছন্নপ্রায় থাকে। ইহার আভাস সাধারণতঃ পাওয়া যায় না বলিয়া ইহা তখন থাকিয়াও না থাকার সমান। এইজন্য এই ভূমিতে মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময় এই নিম্নবর্তী তিন কোষের দিকে আকর্ষণ থাকে। মন ও প্রাণের ক্রিয়াসমন্বিত স্থূল দেহের প্রতি আকর্ষণ ইহারই নামান্তর। এইজন্যই এই ভূমিতে দেহাত্মবোধ প্রবল থাকে। বিষয়ের প্রতি আসক্তির তীব্রতাবশতঃ বৈরাগ্য, বিবেক প্রভৃতি সুকুমারভাব অভিভূত থাকে। মধ্যমা ক্ষেত্রে নাদময় চিদ্রশ্মি নিত্য বিরাজমান। এইসকল রশ্মি স্বরূপতঃ বৈখরী ভূমিতে দৃষ্টিগোচর হয় না। বৈখরীতে এই সকল অবতীর্ণ হইলে নানাপ্রকার বর্ণ ও ইন্দ্রিয়গোচর উজ্জ্বল আলোকরূপে প্রতিভাসমান হয়। উহার সঙ্গে চিদনুসন্ধান থাকে না। সেইজন্য সূক্ষ্মতম চৈতন্যের মিশ্র অনুভব বৈখরী হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মধ্যমাতে না যাওয়া পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

তাই যে কোন উপায়েই হউক্ বৈখরী হইতে মধ্যমা ভূমিতে উত্থান একান্তই আবশ্যক। এই উত্থান ব্যাপারে একদিকে গুরুশক্তি ও অপরদিকে স্বকীয় প্রযত্ন অপরিহার্য। এই ক্রমিক বিকাশের কার্যে জপসাধন অত্যন্ত সহায়ক। ঈশ্বরপ্রণিধান বা ভজন, নিষ্কাম কর্মযোগ ও ভৌতিক দেহ ও চিত্তের সংস্কারমূলক আত্মশোধন এই উত্থান কার্যে যথাসম্ভব সাহায্য করিয়া থাকে। সাধকের দৃষ্টি এই ভূমিতেই প্রত্যাবর্তিত হইয়া অন্তর্মুখী হইতে আরম্ভ হয়। বৈখরী ভূমিতে লক্ষ্য থাকে বাহিরের দিকে ও নীচের দিকে—অর্থাৎ মূলাধারের দিকে, কিন্তু মধ্যমা ভূমিতে ঐ লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়—তখন লক্ষ্য বাহিরে বা নীচে না যাইয়া অন্তরের বা উপরের দিকে আকৃষ্ট হয়। মূলাধারের পরিবর্তে সহস্রারের বা গুরুধামের দিকে অথবা অখণ্ড নিত্য সত্তার দিকে লক্ষ্য স্থাপিত হয়। বিষয়াসক্তিবর্জিত চিত্ত তখন শুদ্ধ হয়। ভাবনাদি অন্যান্য উপায়েও মধ্যমা

ভূমিতে উত্থান হইতে পারে, তবে জপসাধনার সৌকর্য অন্যান্য সাধনা হইতে অধিক। 'মধ্যমা' শব্দের অর্থ যাহা দুইটি প্রান্তের মধ্যবর্তী—এক প্রান্তে দিব্য পশ্যন্তী বাক্ এবং অপর প্রান্তে পাশব বৈখরী বাক্, এই উভয়ের মধ্যে সংযোজক সেতু-স্বরূপ মধ্যমা বাক্ ক্রিয়াশীল। সেইজন্য পশুভাব হইতে দিব্যভাবে আসিতে হইলে এই মধ্যপথরূপী সেতু অবলম্বন করা আবশ্যক।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বৈখরী বাক্ বা লৌকিক শব্দে চৈতন্যের রশ্মি প্রচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু মধ্যমা বাকে উহা প্রচ্ছন্ন নহে, কিন্তু প্রস্ফুট। এই সকল রশ্মি নাদরূপী সূত্র অবলম্বন করিয়া অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তাই মূলতঃ সবই বীজাত্মক এবং বীজ বিন্দুরূপী কেন্দ্রে নিত্য অবস্থিত। বৈখরী বাক্ যেমন ব্যক্ত, মধ্যমাকে সেরূপ ব্যক্ত বলা চলে না। কিন্তু ব্যক্ততা মধ্যমাতে আছে—সঙ্গে সঙ্গে অব্যক্ততাও আছে। সেইজন্য অর্থাৎ মধ্যবর্তী বলিয়া মধ্যমাকে ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়াত্মক বলা হয়।

মন্ত্র চিদ্‌রশ্মিময়। বৈখরী ভূমিতে চিদ্‌ভাব গুপ্ত বলিয়া এবং বাক্ অসংস্কৃত বলিয়া বৈখরীবর্ণের মন্ত্রময়তা স্বীকার করা যায় না। তবে স্বরূপতঃ উহার মন্ত্রাত্মতা না থাকিলেও মন্ত্রময় চিদ্‌রশ্মির বাচক বলিয়া বৈখরীবর্ণ হইতে উদ্‌ভূত যাবতীয় স্থূল বিদ্যাকেও 'মন্ত্র' আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। মীমাংসকগণের মন্ত্রাত্মক দেবতাবাদ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। "মন্ত্রাশ্চিন্মরীচয়ঃ। তদ্‌বাচকত্বাদ্ বৈখরীবর্ণবিলাসভূতানাং বিদ্যানাং মননাৎ ত্রাণতা।"

মধ্যমার ওপারে পশ্যন্তী বা দিব্যবাক্। ইহা একপ্রকার অব্যক্ত। এই বাক্ হইতে নিখিল দেবতানিচয় প্রকাশিত হন—এই সকল দেবতা সর্বজ্ঞ এবং সমগ্র বিশ্বের কার্যে আপন আপন অধিকার অনুসারে ব্যাপৃত। শুধু দেবতার প্রকাশ পশ্যন্তী বাকের কার্য নহে—বিষ্ণুর পরমপদ পর্যন্ত পশ্যন্তী ভূমি হইতেই দৃষ্টিগোচর হয়। সূরিগণ যে পরমপদ নিরন্তর দর্শন করেন তাহা এই ভূমি হইতেই জানিতে হইবে। বস্তুতঃ পশ্যন্তী বাকেই কারণস্থ চৈতন্যের স্ফূর্তি হয়—ইহাই দেবতার স্বরূপ। প্রাচীনকালে মন্ত্রসাক্ষাৎকারের ফলে যে ঋষিত্ব লাভ হইত তাহা এই পশ্যন্তী ভূমি লাভের ফল। ইহাই আত্মার 'অমৃত কলা'—"বিন্দেম দেবতাং বাচমমৃতামাত্মনঃ কলাম্"। পশ্যন্তীর স্বরূপ দর্শন হইলে অধিকার নিবৃত্তি হয়—"তস্যাং দৃষ্টস্বরূপায়ামধিকারো নিবর্ততে।" এক হিসাবে দেখিতে গেলে পশ্যন্তীর পরে বাকের আর কোন উচ্চতর অবস্থা কল্পনীয় হয়

না। এইজন্যই প্রাচীন আচার্যগণের মধ্যে অনেকে বাক্‌কে ত্রিবিধ (ত্রয়ী বাক্) বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি পশ্যন্তীরও একটী পরাবস্থা আছে স্বীকার করিতে হইবে। তাই কেহ কেহ নামতঃ পরা বাক্ স্বীকার না করিলেও কার্যতঃ 'ত্রয্যা বাচঃ পরং পদম্' বলিয়া প্রকারান্তরে উহাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এই পরাবাক্ চিন্ময় ও পরম অব্যক্ত। এই ভূমিতে ব্যষ্টিদেবতার প্রকাশ নাই,—সমষ্টি দেবতা বা ঈশ্বরচৈতন্যে সমস্ত বাক্ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই বাক্‌সৃষ্টির ঊর্দ্ধ্বতম শিখর হইতে নিম্নতম ভূমি পর্যন্ত সমরূপে ব্যাপ্ত। ইহা ঊর্দ্ধ্ব সহস্রারের সর্বোচ্চ অগ্রভূমি হইতে উত্থিত হইয়া মূলাধার পর্যন্ত ব্যাপ্ত, ইহা যেমন বলা চলে, তেমনি ইহা মূলাধারের নিম্নস্থিত মহাকারণ সমুদ্রে প্রকাশমান অধঃ সহস্রার হইতে উত্থিত হইয়া ঊর্দ্ধ্ব সহস্রারের দ্বাদশদলে বাগ্‌ভব কূট পর্যন্ত ব্যাপ্ত, ইহাও বলা চলে। কেহ কেহ এরূপ বলিয়াও থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে ঊর্দ্ধ্ব সহস্রারেরই ভিন্ন ভিন্ন স্তরে এই তিনটি বাকের উদ্‌ভব—তন্মধ্যে একটির (মধ্যমার) বিস্তার নীচের দিকে হৃদয় পর্যন্ত, দ্বিতীয়টির (পশ্যন্তীর) নাভি বা উহার কিঞ্চিৎ নিম্নদেশ পর্যন্ত এবং তৃতীয়টির (পরার) মূলাধার পর্যন্ত। অধ-ঊর্দ্ধ্ব সর্বদেশব্যাপী সৎ রূপ চৈতন্যই পরা বাকের তাৎপর্য। ইহারই নাম নিত্য অক্ষর।

এই অবস্থার পরে আর শব্দের গতি নাই। মধ্যমা বাক্ হইতে এই অক্ষর ব্রহ্ম পর্যন্ত যোগীর গতি শব্দব্রহ্মের অন্তর্গত। অক্ষরব্রহ্ম ভেদ হইলেই পর-ব্রহ্মের দ্বার খুলিয়া যায়। পরব্রহ্ম শব্দাতীত। তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—"শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।"

যতদূর পর্যন্ত শব্দের বিকাশ আছে ততদূর পর্যন্তই আকাশ কল্পিত হয়। যেটি নিত্য অক্ষর অথবা সৎ তাহারই নাম পরমাকাশ, যাহাকে বিভিন্ন প্রস্থানে এবং বৈদিক মন্ত্রাদিতেও পরম ব্যোম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে। যেটি শব্দাতীত অবস্থা সেখানে আকাশ নাই—সেখানে শক্তি ও শিব দুইটী তত্ত্ব অবিভাজ্য যুগ্মরূপে বিরাজ করিতেছে। যুগলভাব, যামলভাব অথবা যুগনদ্ধভাব শিবশক্তির এই অবিনাভাবেরই সূচনা করে। সমনা ও উন্মনা শক্তি উভয়ই ব্রহ্মশক্তি—সমনা শক্তিতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া পরব্রহ্মের ইচ্ছানুসারে সৃষ্টি বিস্তার করে এবং উন্মনা শিবতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া পরব্রহ্মের বিমর্শহীন

বিশ্বাতীত দিকে উন্মুখ হইয়া আছে। শিব-শক্তি অভিন্ন বলিয়া কাহাকেও ছাড়িয়া কেহ অবস্থান করিতে পারে না। ইহার পর আর তত্ত্ব নাই। সেখানেই তত্ত্বাতীত অদ্বৈত স্থিতি।

কিন্তু এই অদ্বৈতের মধ্যেও দুইটি দিকের সন্ধান পাওয়া যায়—একটি অখণ্ড সচ্চিদানন্দের দিক্‌, যাহা বিশ্বাতীত হইলেও সূক্ষ্মতম ধ্যানগম্য বলিয়া আরোপ-দৃষ্টিতে কথঞ্চিৎ বর্ণনীয় এবং অপরটি সর্বপ্রকারে নির্বিকল্প ও ধ্যানসমাধির অগোচর। প্রথমাবস্থাতে স্বশক্তি পরিস্ফুট, দ্বিতীয়াবস্থাতে উহা অস্ফুট বা অব্যক্ত, কিন্তু উহা নাই বলা চলে না। বস্তুতঃ এই দুইটি দিক্‌ও অভিন্ন। সেখানে নিষ্কল ও স-কলেও ভেদকল্পনার অবকাশ থাকে না। ইহাই পরমাদ্বৈত রহস্য। একই অখণ্ড স্বরূপে বিশ্ব ও বিশ্বাতীত, "অমাত্র" ও "অনন্তমাত্র" (মাণ্ডূক্যকারিকা ১·২৯), নিষ্কল ও স-কল, নিষ্ক্রিয় ও অনন্তক্রিয়, অক্ষর ও ক্ষর স্বয়ংপ্রকাশ অদ্বয়রূপে বিরাজ করিতেছে। কাল সেখানে কালাতীতের সঙ্গে এক হইয়া প্রকাশ পাইতেছে।

৩

পরম পদে প্রবিষ্ট হইয়া স্বভাবের ধারা প্রাপ্ত হইবার পক্ষে জপ অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। জপের নানাপ্রকার ভেদ আছে, তন্মধ্যে বাহ্য ও আভ্যন্তর, এই দুইটি প্রধান। যাহাকে শাস্ত্রে বৈখরী জপ বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহাই বাহ্য জপ, ইহা প্রারম্ভিক ক্রিয়া। আন্তর জপ ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্ম। বাহ্য পূজা হইতে যেমন আন্তর পূজা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ বাহ্য জপ হইতে আন্তর জপ শ্রেষ্ঠ। বিধিপূর্বক নানাপ্রকার বর্ণের উচ্চারণই বাহ্য জপের লক্ষণ—ইহাকে আচার্যগণ বিকল্পাত্মক সংজল্প বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যিনি পরম পথের ও পরম পদের অভিলাষী, তাঁহার পক্ষে ক্রমশঃ বাহ্য জপে বিমুখ হইয়া আন্তর জপে নিবিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

প্রথম আরম্ভ অবশ্য বৈখরী হইতেই হইয়া থাকে। কর্তৃত্বাভিমান লইয়াই সঙ্কল্পপূর্বক কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়। কণ্ঠজপই বৈখরী জপের স্থূল লক্ষণ। বাচিক, উপাংশু ও মানসিক—এই তিনপ্রকার জপই বৈখরীর অবান্তর ভেদ। এই তিনটি ভেদেই 'জপ করা' ভাবটি থাকে। মানস কর্মও যেমন কর্ম, সেই প্রকার মানস জপও বস্তুতঃ বৈখরী জপ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। মানস জপ করার মূলেও কর্তারূপে অহং ভাবটি অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থাৎ 'আমি জপ করিতেছি' এই ভাবটি

স্ফুট অথবা অস্ফুট ভাবে বিদ্যমান থাকে ইহার পর ধীরে ধীরে অবস্থান্তরের উদয় হয়। তখন কণ্ঠরোধ হইয়া যায়—প্রযত্ন দ্বারা জপ করা আর চলে না। কর্মকারিণী নাড়ী সকল কিয়দংশে স্তব্ধ হইয়া যায়, তখন জপ আপনা আপনি ভিতরে ভিতরে চলিতে থাকে। ইহার নাম 'জপ হওয়া'। ইহা স্বভাবের জপ। ইহার তিনটি ভেদ আছে। প্রথমে হৃদয়ে জপ হয়, তাহার পর দ্বিতীয়াবস্থায় নাভিতে হয় এবং অন্তে মূলাধারে হইয়া থাকে। হৃদয়-জপকেই মধ্যমামার্গে প্রবেশ বলিয়া জানিতে হইবে। সেই অবস্থায় নাদ আপনা আপনি চলিতে থাকে। মধ্যমাতে প্রবেশ না হওয়া পর্যন্ত শুধু বাহ্য জপে নাদ-শ্রুতি হয় না। বাহ্য জপে মন্ত্রাক্ষরের পৃথক পৃথক উচ্চারণ থাকে বলিয়া উহা বিকল্পময়, তাই উহা প্রকৃত মন্ত্র নহে। মধ্যমা ভূমিতে যখন নাদের সহিত মন্ত্র স্বভাবতঃ ধ্বনিত হইয়া উঠে তখনই উহা আন্তর জপ বলিয়া জানিতে হইবে। আপন-আপন বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলের সঞ্চার নিরুদ্ধ করিয়া আভ্যন্তর নাদের উচ্চারণ করিতে হয়।

সংনিযম্যেন্দ্রিয়গ্রামং প্রোচ্চরেন্নাদমান্তরম্।
এষ এব জপঃ প্রোক্তো ন তু বাহ্যজপো জপঃ॥

পরম ভাবের দিকে যে পুনঃ পুনঃ ভাবনা তাহাই আন্তর জপ—নাদের প্রকটাবস্থা।

হৃদয়-কমল মধ্যে যে আকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাকে উপনিষদে হৃদয়াকাশ বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, তাহাতে অর্থাৎ সেই অনাহত প্রদেশে সর্বদাই ভগবতীর আনন্দময় স্বরূপ নাদরূপে পরিণত হইয়া চারিদিকে সংসর্পিত হইতে থাকে। আমাদের মন সাধারণতঃ বহির্মুখ থাকে বলিয়া এই নাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন গুরুকৃপায় মন অন্তর্মুখ হয়, তখন পরিস্ফুট-ভাবে ইহার পরিচয় উপলব্ধি করা যায়। তাহার প্রভাবে নেত্রে অশ্রুর উদ্গম হয়, সমস্ত শরীরে পুলক বা রোমাঞ্চের সঞ্চার হয় এবং অন্যান্য সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাব হয়।

শুদ্ধ-বিদ্যা-ভূমিতে স্থিত বিদ্যেশ্বররূপী শ্রীগুরুর মুখ-নিঃসৃত বাণী মধ্যমা বাক্-রূপে আত্মপ্রকাশ করে, সহস্রদল কমলের দল হইতে হৃদয় পর্যন্ত এই বাণীর বিস্তার অনুভূত হইয়া থাকে। এই বাণীর প্রভাবে মায়ার আবরণ ক্রমশঃ উন্মুক্ত হইতে থাকে ও সাধকের নিজ স্বরূপ সদ্বিদ্যাযুক্ত হইয়া পুরুষ ও প্রকৃতিকে

এক অভিন্ন জ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া বোধ করিতে থাকে। নবনাদের ইহা প্রথম নাদ জানিতে হইবে।

বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া আলোচনা করিতে চেষ্টা করিতেছি। মহর্ষি পতঞ্জলির নির্দেশানুসারে মন্ত্রজপের সহিত মন্ত্রার্থের ভাবনার আবশ্যকতা আছে, ভাবনা ও জপ পরস্পর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত। আগমের রহস্যবিদ্‌গণ বলেন যে জপের সঙ্গে মন্ত্রের অবয়ব-সমূহে ছয়টি শূন্য, পাঁচটি অবস্থা ও সাতটি বিষুব ভাবনা করিতে হয়। ছয়টি শূন্যের মধ্যে পাঁচটির বর্ণবৈচিত্র্যময় আপন আপন পৃথক্ মণ্ডলাকার রূপ আছে। কিন্তু ষষ্ঠটি অনুত্তর বা মহাশূন্য। প্রথম পাঁচটি শূন্যকে ঠিক নিরাকার বলা চলে না, কারণ মনের স্পন্দন যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন না কোনপ্রকার অতি সূক্ষ্ম আকারের সংস্রব থাকিয়াই যায়। কিন্তু ষষ্ঠশূন্যটি মনের অতীত বলিয়া বাস্তবিক পক্ষেই নিরাকার, মহাশূন্য। প্রণব অথবা বীজমন্ত্রের প্রথম তিনটি অবয়ব জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির দ্যোতক, তাহার পর যে সকল সূক্ষ্মতর অবয়ব আছে, তাহাদের সবগুলি বস্তুতঃ তুরীয় ও তুরীয়াতীত অবস্থারই অন্তর্গত। ঐ সকল অবয়বের নাম এইপ্রকার—বিন্দু, অর্দ্ধচন্দ্র, রোধিনী, নাদ, নাদান্ত, শক্তি, ব্যাপিনী, সমনা ও উন্মনা। প্রথম তিনটি অবয়বের সহিত এই নয়টি অবয়ব সম্মিলিত হইয়া দ্বাদশটি অবয়ব হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে প্রতি দ্বিতীয় অবয়বকেই শূন্যরূপে ভাবনা করিতে হয়। ইহার অতি গভীর রহস্য আছে, কিন্তু এই স্থানে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক। এইভাবে দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ—এই ছয়টি অবয়ব শূন্যপদ-বাচ্য ; তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটি অবান্তরশূন্য এবং ষষ্ঠটি মহাশূন্য। পাঁচটি নিম্নবর্তী শূন্যের মধ্যে একটি ক্রমবিকাশ ও ক্রমলয়ের ভাব অনুভব করা যায়, যাহা সাধনমার্গে প্রবিষ্ট ব্যক্তি মাত্রই গুরুকৃপায় অল্পাধিক ধারণা করিতে পারেন।

যে অবস্থায় দশ ইন্দ্রিয় দ্বারা জাগতিক ব্যাপার নিষ্পন্ন হয় তাহাকে জাগ্রৎ অবস্থা বলে। বস্তুতঃ প্রকাশ ইহার করণ বলিয়া প্রকাশকেই জাগ্রৎরূপে ভাবনা করার বিধান আছে। যে অবস্থায় আন্তর চতুর্বিধ করণ দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, তাহার নাম স্বপ্নাবস্থা। স্বপ্নে বিদ্যমান অন্তঃকরণ-বৃত্তির লয় হইলে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের উপরমরূপ যে অবস্থার উদয় হয়, তাহার সুষুপ্তি। সুষুপ্তি ভাবনার স্থান ভ্রূমধ্যস্থিত বিন্দুতে। এই বিন্দু হৃল্লেখার ঊর্দ্ধ-বিন্দু জানিতে হইবে। স্বাত্ম-চৈতন্যের অভিব্যক্তির হেতু নাদের আবির্ভাবই তুরীয়ের স্বরূপ। অর্দ্ধচন্দ্র,

রোধিনী ও নাদ এই তিন মন্ত্রাবয়বে ইহার ভাবনা করা উচিত। তুরীয়াতীত অবস্থা পরমানন্দ-স্বরূপ। ইহা মন ও বাকের অতীত হইলেও মন ও বাকের আভাস দেহাবস্থান কালে অধিকারানুসারে কাহারও কাহারও থাকিয়াই যায়। নাদান্ত হইতে শক্তি, ব্যাপিনী ও সমনার পর উন্মনা পর্যন্ত তুরীয়াতীত অবস্থা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। উন্মনার পরে আর কোনপ্রকার অবস্থা নাই।

মাত্রাহীন বা অমাত্র শিব-স্বরূপ আত্মা হইতে চিৎকলার আভাস বিন্দু বা বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-রূপ দর্পণে পতিত হইয়া উহাতে অবস্থিত স্থিরীকৃত মাত্রাকে আঘাত করে। মাত্রা ঐ আভাস ধারণ করিতে পারিলে উহা সাধকের বা যোগীর যোগানুভূতির ভূমিরূপে পরিগণিত হয়—এক মাত্রা বিভক্ত হইয়া অর্দ্ধ মাত্রাতে পরিণত হয়। এক মাত্রা ও অর্দ্ধ মাত্রার সন্ধিস্থানটি অত্যন্ত গুহ্য। স্থূল বিশ্বের অনুভূতি মনের যে মাত্রাতে হয় উহাকে এক মাত্রা বলিয়া স্বীকার করা হয়। স্থূল লৌকিক অনুভূতির আরম্ভ ঐ এক মাত্রাতে—মাত্রার আধিক্য জাড্যবৃদ্ধির কারণ। মনের ক্ষেত্র সমস্তটা চেতন বা বোধময় নহে, উহার মধ্যে অবচেতন অংশও আছে। আমাদের স্মৃতিতে যে নাম বা শব্দরাশি সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা আমাদের অনুভবেরই পরিণাম। এই অনুভব স্থলবিশেষে মনের একাগ্রতার (অন্ততঃ আংশিক) ফলে উদিত হয়। সেইজন্য ঐ শব্দকে স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে শব্দের অর্থ বা রূপ চিত্তক্ষেত্রে জাগিয়া উঠে। বাচকের স্মরণ হইতে বাচ্যের স্ফূর্তি হইয়া থাকে। সাধকের কর্তব্য—সাধনার উদ্দেশ্য—নিজের মনকে একাগ্র করা বা কেন্দ্রে স্থাপিত করা অর্থাৎ এক মাত্রাতে অবস্থিত রাখা। সমাধি প্রভৃতির অভ্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্যও ইহাই। সাধারণতঃ মন এক মাত্রাতে থাকে না। বিক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্তাবস্থায় চঞ্চলতার ফলে মাত্রার বাহুল্য ঘটিয়া থাকে। মূঢ়াবস্থার কথা এখানে আলোচনার প্রয়োজন নাই। মন উত্থিত হইয়া এক মাত্রাতে স্থিত হইলে উপর হইতে উহাতে গুরুকৃপারূপী চিদ্‌রশ্মির সম্পাত হয়। তাহার ফলে এক মাত্রা স্বস্থানে এক মাত্রারূপে অক্ষুণ্ণ থাকিয়াও 'অতীতে' অর্দ্ধমাত্রা প্রভৃতি রূপে পরিণত হয়।

এইখান হইতে সীমাহীন অনন্তের দিকে গতির সূচনা হয়—দিব্য অনুভূতির আরম্ভ হয়। চিৎকিরণ-সম্পাতের বৃদ্ধি অনুসারে মাত্রার ভগ্নাংশ বাড়িতে থাকে, অর্থাৎ মাত্রাংশ ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে থাকে এবং প্রতিফলিত চৈতন্য ক্রমশঃ অধিকতর উজ্জ্বল ও পরিস্ফুট হইতে থাকে।

যে স্থানে চিদ্রশ্মির সম্পাত হয় তাহাকে এক মাত্রা ও অর্দ্ধমাত্রার সন্ধি মনে করা যায়—উর্দ্ধ্ব হইতে এক মাত্রাতে ঐ রশ্মি আসাতে উপর দিকে এক মাত্রা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে, অথচ নীচের দিকে এক মাত্রা অক্ষুণ্ণই থাকে।

এই এক মাত্রাই সমগ্র স্থূল বিশ্বের মধ্যবিন্দু। লৌকিক বিশাল জগৎ এই এক মাত্রাতে উপসংহৃত হয় এবং এইখান হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া দশ দিকে স্তরে স্তরে ছড়াইয়া পড়ে। এই মাত্রাকে এক দৃষ্টিতে সুষুপ্তির সমধর্মা বলা চলে। ঐ দৃষ্টিতেই অর্দ্ধমাত্রাদি তুরীয় ও অতিতুর্য অবস্থার আভাসের জ্ঞাপক মনে করা যায়।

মনের মাত্রা যতই প্রসারিত হয় ততই মনের অংশ ক্ষুদ্রতর হয়, ততই চিদালোক উজ্জ্বলতর হয়। অর্দ্ধমাত্রাদিতে যে প্রতিফলিত চৈতন্য আছে তাহাই মন্ত্র। যে চিত্ত তাহার আধার তাহাকেও মন্ত্র বলে।

পূর্বে যে বিন্দুর কথা বলিয়াছি তাহাই মাত্রা হইতে মাত্রাহীনে যাইবার দ্বার। এখানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান একাকার হয় ও নিরালম্বভাব আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে মাত্রাভঙ্গের ফলে অর্দ্ধমাত্রার উদয় হয়। এই ভূমি হইতেই ঈশ্বর ভাবের পূর্বসূচনা হয় বলা যাইতে পারে। এই জ্যোতির্ময় একাকারতাই শূন্য। এখানে ভেদবোধ একেবারে যায় না, ক্রমশঃ অপগত হয়। ইহা বাস্তবিক পক্ষে দ্বিতীয় শূন্য হইলেও জাগতিক অবস্থার ঊর্দ্ধে ইহাই প্রথম শূন্য। বিন্দু হইতে সহস্রারে উঠার পথে কপালপ্রদেশে যে সোমরস দৃষ্ট হয় তাহাই অর্দ্ধচন্দ্র, যাহার ভিতরে ত্রিবিধ বর্ণমালা (সৌম্য, সৌর ও আগ্নেয়) চিদ্‌বীজরূপে সহস্রারের দলে দলে প্রকাশ পাইতেছে। কপালের ঊর্দ্ধে, অথচ ব্রহ্মরন্ধ্রের নীচে, ত্রিকোণ মধ্যে রোধিনীর অবস্থিতি। ব্রহ্মাদি কারণ-পঞ্চককে, অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব নামক পাঁচটি জগৎপতিকে, ঊর্দ্ধ গতি হইতে নিবৃত্ত করে বলিয়া ইহার নাম রোধিনী। কেহ কেহ ইহাকে নিরোধিকাও বলেন। রোধিনী পর্যন্তই বিন্দুর আবরণ। ইহাকেও শূন্যরূপে চিন্তা করিতে হয়। এখানে দিক্ ও কালের পার্থক্য মনে থাকে না। তা ছাড়া নিম্নবর্তী মন ও প্রাণকণার অনুভবও এখানে থাকে না। ইহার পর ব্রহ্মরন্ধ্রের মুখে নাদস্থান। মন্ত্রমহেশ্বররূপী মহাপুরুষগণ দ্বারা ইহা পরিবৃত। নাদের অন্তর্গত ভুবনপঞ্চকের মধ্যবর্তী শক্তি ঊর্দ্ধগা নামে প্রসিদ্ধা। এইখান হইতেই শুদ্ধ চিদ্‌বোধের সূত্রপাত হয়। ব্রহ্মরন্ধ্রে নাদান্ত। ইহাও শূন্যরূপে ভাবনীয়। নাদ বা চিৎ

এখানে সদ্‌ভাবে প্ররূঢ় বলা চলে। ব্রহ্মরন্ধ্রটি সুষুম্নার উপরে। ব্রহ্মরন্ধ্রের উপরে শক্তি স্থান। ইনিই ঊর্দ্ধ কুণ্ডলী, প্রসুপ্ত ভুজগাকার ও ঊর্ণাচঞ্চ সমপ্রভ। অনুস্মিষিত সমগ্র বিশ্ব ইহারই গর্ভে অবস্থিত—তাই ইনি বিশ্বাধার। যাবতীয় তত্ত্ব ও ভুবন ইহাকেই আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে। এইস্থানে একটি অব্যক্ত আনন্দের অনুভব হয়।

ইহার পর ব্যাপিনীর অধিকার। বস্তুতঃ শক্তির কেন্দ্রস্থিতা কলাই ব্যাপিনী নামে পরিচিত। কিন্তু শক্তি হইতে ব্যাপিনী পৃথক্‌। পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত শক্তি-তত্ত্বেরই প্রবঞ্চ। শক্তিতত্ত্বই এক হিসাবে দেখিতে গেলে অনাশ্রিত ভুবন, যাহাতে ব্যাপিনীর মধ্যে শিবতত্ত্ব অবস্থিত। অনাশ্রিত ভুবনের চারিদিকে ব্যাপিনী, ব্যোমাত্মিকা, অনন্তা ও অনাথা নামক শক্তির অবস্থান—মধ্যে অনাশ্রিতা শক্তি বিরাজমান। ব্যাপিনীও যে শূন্যরূপে কল্পনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য। কেহ কেহ ব্যাপিনীকেই মহাশূন্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা মহাশূন্য নহে, ইহার পরেও শূন্য আছে। এখানে সাকার ও নিরাকারের ভেদ তিরোহিত। এখানকার অনুভূতি এক অদ্বয় আত্মানুভূতির অঙ্গীভূত। ব্যাপিনীর পরে ব্যাপিনীপদাবস্থিত অনাশ্রিত ভুবনের উপরে সমনা। ইহা ব্রহ্মবিলের বাহিরে ও অতীত মনের স্থান। এখানে মন নাই, অথচ মন আছে। নাদান্ত হইতেই এই অতীত মনের সূচনা পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম সমষ্টি মন নাদেই পরিসমাপ্ত হয়—তাহার পরই অতিমানস। সমনাই সকল কারণের কর্তৃভূতা মহেশ্বরের পরাশক্তি। পূর্ণ ব্রহ্মের ঈক্ষণশক্তি অবতরণমুখে সমনারূপে নামিয়া সমষ্টি মনে সঞ্চারিত হয়। পরমেশ্বর, সৃষ্ট্যাদি পাঁচপ্রকার কৃত্য, সমনাতে আরূঢ় হইয়াই সম্পাদন করেন। সমনার অপর দিক্‌টি উন্মনা—ইহা অতীত মনেরও অতীত। আত্মার বিকল্পরহিত কেবল স্বরূপে অবস্থানের বোধ এইখানে হয়। ইহা অমেয় ও অনির্দেশ্য। নবনাদের মধ্যে ইহাই নবম নাদ। বিন্দুতে যে নাদসমূহের সূচনা, উন্মনাতে তাহাদের শেষ। ইহাই প্রকৃত মহাশূন্য। শ্রীমাতার মহাকরুণা ব্যতিরেকে ইহা ভেদ করা যায় না। ইহার পর আর শব্দব্রহ্ম নাই—অথবা শব্দব্রহ্মই পরব্রহ্ম বা অদ্বৈত আত্মস্বরূপে স্বয়ং প্রকাশ।

জপের আনুষঙ্গিক ভাবনার সহিত সংসৃষ্ট ছয় শূন্য ও পাঁচ অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইল। এখন সাতটি বিষুবের কথা যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখিতে চেষ্টা করিতেছি। বিষুবসপ্তকের প্রচলিত নাম এইপ্রকার—প্রাণবিষুব, মন্ত্র-

বিষুব, নাড়ীবিষুব, প্রশান্তবিষুব, শক্তিবিষুব, কালবিষুব ও তত্ত্ববিষুব। প্রাণ, আত্মা ও মনের পরস্পর যোগকে প্রাণবিষুব বলে। অভিব্যজ্যমান নাদকে জাপকের নিজ আত্মা বলিয়া ভাবনা করা মন্ত্রবিষুবের তাৎপর্য। মূলমন্ত্রের দ্বারা ছয় চক্র ও দ্বাদশ গ্রন্থির ক্রমশঃ ভেদ হইলে মধ্যনাড়ীতে নাদস্পর্শ হয়। মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত বীজশিখরবর্তী নাদ উচ্চারিত হইলে নাড়ীবিষুবরূপ স্পর্শ উদ্‌ভূত হয়। নাদান্ত পর্যন্ত মন্ত্রাবয়বের শক্তিতে লয়-ভাবনা প্রশান্তবিষুব নামে অভিহিত। শক্তিমধ্যগত নাদের সমনা পর্যন্ত চিন্তনকে শক্তিবিষুব বলা হয়। এ পর্যন্ত কালের খেলা আছে। কারণ, সমনা পর্যন্তই কালের গণ্ডী। বস্তুতঃ নাদ কালের সীমার পরেও আছে। কালাতীত উন্মনা পর্যন্ত নাদের চিন্তনকে কালবিষুব বলে। উন্মনাতে কাল নাই, কিন্তু উহাও পরমতত্ত্ব নহে। কাল-বিষুবের পর তত্ত্ববিষুব অঙ্গীকৃত হয়। নাদই তত্ত্বের অভিব্যঞ্জক, তবে যতক্ষণ নাদের প্রকৃত অন্ত না হয় ততক্ষণ তত্ত্ববোধ হয় না। নাদান্ত ত দূরের কথা, শক্তিতে বা সমনাতেও নাদের অন্ত হয় না। শাক্ত যোগিগণ উন্মনাকেও নাদের অন্ত স্বীকার করেন না। উন্মনার উর্দ্ধে—উন্মনা ভেদ করার সঙ্গে সঙ্গে—নাদ লীন হয়। তখন তত্ত্ববোধ বা স্বাত্মসাক্ষাৎকার স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। সেই-জন্য তত্ত্ববিষুবকেই চৈতন্যের অভিব্যক্তিস্থান বলা সঙ্গত।

ইহার পরই পরম পদ। ইহা ছয় শূন্য, পাঁচ অবস্থা ও সাত বিষুবের কোলাহলের অতীত, বিশ্বের পরম বিশ্রান্তি ভূমি ও পরমানন্দস্বরূপ। ইহাই পরম-শিবের অবস্থা। তান্ত্রিক যোগে নিষ্ণাত পরম যোগিগণ বলেন যে উন্মনা পর্যন্ত মন্ত্রাবয়ব সকল ১০৮১৭ বার উচ্চারিত হইলে নাদের অন্ত ও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া পরম পদের প্রাপ্তি ঘটে। মন্ত্রজপের সঙ্গে মন্ত্রার্থভাবনা আবশ্যক, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। অর্থজ্ঞান ব্যতীত অর্থভাবনা হইতে পারে না। শাস্ত্রে বহুপ্রকার মন্ত্রার্থের বিবরণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ভাবার্থ, সম্প্রদায়ার্থ, নিগর্ভার্থ, কৌলিকার্থ, রহস্যার্থ ও মহাতত্ত্বার্থ, এই কয়েকটি প্রধান। কোন কোন মতে ১৬ প্রকার অর্থের বর্ণনাও দৃষ্ট হয়। মন্ত্রের অবয়বভূত অক্ষরের অর্থই ভাবার্থ। সর্বকারণকারণ পূর্ণ পরমেশ্বরই সকল মন্ত্রের মূল গুরু। তন্মুখ হইতে স্বীয় মন্ত্রের উদ্‌ভব ও উহার অবতরণক্রম বা পরম্পরার জ্ঞানই মন্ত্রের সম্প্রদায়ার্থ জ্ঞান। পরমেশ্বর, গুরু ও নিজ আত্মার ঐক্যানুসন্ধান নিগর্ভার্থ। পরমেশ্বর নিষ্কল, নিরবয়ব—গুরুও তাই। নিষ্কল পরমেশ্বরকে যিনি নিজ

স্বাত্মরূপে সাক্ষাৎকার করেন তিনিই গুরু। তাই গুরু ও পরমেশ্বর অভিন্ন। চক্র, দেবতা, বিদ্যা, গুরু ও সাধকের ঐক্যানুসন্ধানই কৌলিকার্থ। মূলাধারস্থ কুণ্ডলীরূপা বিদ্যাই সাধকের স্বাত্মা, এরূপ ভাবনার নাম রহস্যার্থ। নিষ্কল, অণু হইতে অণুতর ও মহান্ হইতে মহত্তর, নির্লক্ষ্য, ভাবাতীত, ব্যোমাতীত, পরম তত্ত্বের সহিত প্রকাশানন্দরূপে বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় নিজগুরু-প্রবোধিত নির্মল-স্বভাব স্বকীয় আত্মার ঐক্যানুপ্রবেশ মহাতত্ত্বার্থ। এই সব অর্থের বিজ্ঞানের ফলে পাশাত্মক বিকল্পজাল সম্যক্‌প্রকারে নিবৃত্ত হয়।

এই দেহরূপ বিশ্বে অধঃ-উর্দ্ধভাবে তিনটি স্তর আছে। প্রথমটি স্থূল বা স-কল, দ্বিতীয়টি সূক্ষ্ম বা স-কল-নিষ্কল এবং তৃতীয়টি কারণ বা নিষ্কল। প্রথম স্তরটি অকুল হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত বিস্তৃত। সুষুম্না নাড়ীর মূলস্থ উর্দ্ধমুক্ত রক্তবর্ণ সহস্রদলকমলই অকুলপদবাচ্য। সুষুম্নার শিখরস্থ অধোমুখ শ্বেতবর্ণ সহস্র-দলও একপ্রকার তাহাই। উভয়ের অন্তরালে সুষুম্নামধ্যে বিভিন্ন প্রকার আধার-কমল গ্রথিত রহিয়াছে।

দ্বিতীয়টির বিস্তার, আজ্ঞার উর্দ্ধে বিন্দু হইতে উন্মনা পর্যন্ত।

তৃতীয়টি মহাবিন্দু, যাহা উন্মনার অতীত ও দেশকাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। এই ত্রিভূমিক দেহরূপ বিশ্বে যিনি অধিষ্ঠাতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন তিনি পূর্ণব্রহ্মরূপী আত্মা। তিনি বিশ্বাত্মক হইয়াও বিশ্বাতীত এবং বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বাত্মক। জপ-সাধনার পরম সিদ্ধি এই আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভ ব্যতীত অপর কিছু নহে।

অজপা-সাধন রহস্য

১

অতি প্রাচীনকাল হইতেই আধ্যাত্মিক সাধনের মধ্যে জপের মহিমা সাধক সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক কর্মের মধ্যে জপের স্থান অত্যন্ত উচ্চ। যজ্ঞ নানাপ্রকার আছে এবং প্রতি যজ্ঞেরই এক একটি বিশেষ ফলের নির্দেশও আছে। কিন্তু জপ-যজ্ঞের মাহাত্ম্য অন্যান্য যজ্ঞ অপেক্ষা অনেক অধিক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ইহা স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে। জপের তত্ত্ব এবং ফলাফল বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনার বিষয় নহে, কিন্তু জপ-সাধনার যাহা চরম লক্ষ্য সেই অজপা-সাধন সম্বন্ধে প্রাচীন মহাজনদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিজের অনুভব ও বুদ্ধি অনুসারে যথাসম্ভব সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলিতে চেষ্টা করিব। জপের প্রকৃত বিজ্ঞান না জানিলেও জপ সম্বন্ধে অল্প বিস্তর সামান্য জ্ঞান অনেক সাধকেরই আছে। কিন্তু অজপা সম্বন্ধে সাধারণতঃ অনেকেই বিশেষ কিছু জানেন না। স্ত্রী ও পুরুষ, বালক ও বৃদ্ধ, ভাবুক ও ভাবহীন সকল অধিকারীর পক্ষেই অজপা-সাধনের উপযোগিতা রহিয়াছে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে এই সাধনা বিভিন্ন নামে পরিচিত। ইহা আধ্যাত্মিক সাধনার ক্রমিক ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

একদিক্ হইতে দেখিতে গেলে ইহা যে অত্যন্ত সরল সাধনা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ কোন সাধনাই ইহা হইতে সরল হইতে পারে না। মানুষের দেহ-ধারণের পর হইতেই, অর্থাৎ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হইতে প্রয়াণকাল পর্যন্ত, সমগ্র জীবনের মধ্যে যে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলিয়া থাকে তাহাকে মূল ভিত্তি করিয়া অজপা-সাধন অনুষ্ঠিত হয়। ইহার জন্য কোন বিশেষ উপকরণ, কোন কৃত্রিম প্রক্রিয়া, কোন বিশেষ অনুশাসন আবশ্যক হয় না। শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে সকল সময়েই প্রবাহিত হইতেছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত সংশ্লিষ্ট অজপা ক্রিয়াও

তেমনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সর্বকালেই সমরূপে চলিতে থাকে। এই ক্রিয়া আরব্ধ হইলে ইহা চেষ্টা অথবা মনোযোগের অপেক্ষা না রাখিয়া আপনা হইতেই নিরন্তর চলিতে থাকে। সুতরাং এক হিসাবে ইহা যে অত্যন্ত সরল সাধন তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু সরল হইলেও এই সাধনটি অত্যন্ত নিগূঢ় এবং ইহার বিজ্ঞান একটি গভীর রহস্য। ইহার ফল অন্য কৃত্রিম সাধনার অনুরূপ নহে। নিষ্ক্রিয় পরমসত্তার হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া যে ক্রিয়া বিশ্বমধ্যে নিরন্তর চলিতেছে, অজপা মনুষ্য-দেহে তাহারই প্রতিচ্ছায়া মাত্র। ইহা স্বভাবের সাধনা। প্রকৃতির মধ্যে ব্যষ্টি ভূমিতে এবং সমষ্টিতে সমরূপে ইহার প্রভাব লক্ষিত হয়। অজপা-বিজ্ঞান ঠিকভাবে বুঝিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণ উদয় অবশ্যম্ভাবী। এই সাধনা যেমন স্বাভাবিক, ইহার ফলও তেমনি স্বাভাবিক, অর্থাৎ স্বভাবে স্থিতিলাভ।

ভগবান্ বুদ্ধদেব অতি প্রাচীনকালে 'আনাপানসতি' নামে যে সাধনা তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে প্রচারিত করিয়াছিলেন তাহা অজপা-সাধনেরই একটি অঙ্গমাত্র বলিয়া মনে হয়। পরবর্তী বৌদ্ধাচার্যগণ বহুস্থানে ইহার আলোচনা করিয়াছেন এবং বিস্তারপূর্বক ইহার বিশ্লেষণও করিয়াছেন। গোরক্ষ-নাথ ও অন্যান্য নাথ-যোগিগণ অজপা-সাধনের মহিমা জানিতেন—তাঁহারা এই সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া মুক্তকণ্ঠে ইহার মহিমা উদ্‌ঘোষিত করিয়াছেন। নাথসম্প্রদায়ের সাহিত্যে বহুস্থানে অজপা-সাধনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। কিংবদন্তী আছে যে মহাযোগী নানক সাহেব রাজা শিবনাথকে তাঁহার অধিকার অনুরূপ পর পর কয়েকটি উপদেশ দিয়াছিলেন। এই উপদেশ-পরম্পরার মধ্যে প্রথমে রাম নাম, তাহার পর প্রণব এবং সর্বশেষে হংসরূপ অজপা মন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অজপা-গায়ত্রী, হংস-বিদ্যা, আত্মমন্ত্র, প্রাণযজ্ঞ* প্রভৃতি বিবিধ নামে বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সাহিত্যে এই সাধন নির্দিষ্ট হইয়াছে।

কেহ কেহ মনে করেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, শিখি মাইতী ও তাঁহার ভগিনী মাধবীকে, অর্থাৎ তাঁহার সারে তিনজন

---

* গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে 'অপানে জুহ্বতি প্রাণম্' ইত্যাদি বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই প্রাণযজ্ঞের স্বরূপ। শ্রীধর স্বামী তাঁহার টীকাতে ইহাকে অজপ-সাধন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে তৎ পদার্থ ও ত্বং পদার্থের ঐক্যভাবনাই অজপা-সাধনের রহস্য।

অন্তরঙ্গ ভক্তকে, এই সাধনার গুহ্য উপদেশ দান করিয়াছিলেন। সন্ত কবীর, মহাত্মা তুলসীদাস প্রভৃতি মহাজনগণের সিদ্ধির মূলে এই সাধনার অনুষ্ঠান বিদ্যমান রহিয়াছে, সাধক সম্প্রদায়ে ইহা সুপ্রসিদ্ধ। বর্তমান যুগেও যোগী গম্ভীর নাথ, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মহাত্মা রামঠাকুর প্রভৃতি বিশিষ্ট সাধকগণ এই সাধনের মহিমা খ্যাপন করিয়াছেন। শ্বাসে-প্রশ্বাসে সাধন করিতে পারিলে যে সহজ উপায়ে অতি দুর্লভ মহাতত্ত্বের উন্মীলন হয় তাহা ইঁহারা বহুস্থানে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের ভক্ত ও শিষ্যগণও অজপা-সাধনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহু কথা প্রচার করিয়াছেন। সিদ্ধজীবনীকার স্বামী ব্রহ্মানন্দ বারদীর ব্রহ্মচারী মহাযোগী লোকনাথ হইতে এই সাধনেরই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্য।

এই সাধন অনাদিকাল হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে। সদাশিব, ব্রহ্মা, নারদ, বশিষ্ট, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতিও এই সাধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সাধক-সমাজে এইরূপ প্রবাদ আছে। বাস্তবিক পক্ষে অন্যান্য সকল প্রকার সাধনের ন্যায় এই সাধনেরও আদিগুরু শ্রীভগবান্ স্বয়ং, এই সম্বন্ধে সন্দেহের লেশমাত্রও নাই।

২

শিশু যখন মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় এবং যখন তাহার নাড়ীচ্ছেদ হয় তখন হইতেই তাহার দেহে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া লক্ষিত হইতে থাকে। মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে গর্ভধারিণী জননী হইতে পৃথক্‌ভাবে শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাস থাকে না। গর্ভস্থ শিশু মায়ের আহৃত খাদ্যেই পুষ্টিলাভ করে, এবং মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাসেই তাহার দেহের বিকাশ হয়। কিন্তু প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবী মায়া তাহাকে আক্রমণ করে এবং তখন হইতেই সে বস্তুতঃ কালরাজ্যে বাস করিতে আরম্ভ করে। শিশুর যেটি প্রথম শ্বাস গ্রহণ তাহার নাম জন্ম এবং ঐ শ্বাসের শেষ ত্যাগই মৃত্যু নামে প্রসিদ্ধ। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মধ্যবর্তী অবস্থা তাহার জীবন। এইজন্য মনুষ্যের সমগ্র জীবনটিই শ্বাস-প্রশ্বাসময়। মনুষ্য আত্মবিস্মৃত অবস্থায় শ্বাস-প্রশ্বাসের অধীন থাকে এবং নিরন্তর কালের প্রেরণায় ইড়া ও পিঙ্গলা নামক বাম ও দক্ষিণ মার্গে সঞ্চরণ করিতে থাকে। মূলে অবিদ্যার আবরণরূপ পর্দা না থাকিলে বিক্ষেপরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া থাকিত

না। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্বাস-প্রশ্বাস কালেরই খেলা, এবং আমরা যাহাকে জীবন বলি তাহা কাল বা মৃত্যুরই আপন প্রকাশের মহিমা মাত্র।

যোগিগণ বলেন, যোগপথে নয়টি মুখ্য অন্তরায় রহিয়াছে—এইগুলি চিত্তের বিক্ষেপস্বরূপ। চিত্তের বিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে এইগুলি বিদ্যমান থাকে। নয়টি মুখ্য অন্তরায়ের নাম—ব্যাধি, স্ত্যান বা চিত্তের অকর্মণ্যতা, সংশয়, প্রমাদ বা সমাধি-সাধনের অনুষ্ঠানের অভাব, দেহ ও চিত্তের অলসভাব, অবিরতি বা বিষয়-তৃষ্ণা, ভ্রান্তিজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান, সমাধির ভূমিলাভ না হওয়া এবং ভূমিলাভ হইলেও তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারা। দুঃখ, ইচ্ছার অপূর্ণতা-বশতঃ চিত্তের ক্ষোভ, দেহের কম্পন ও শ্বাস-প্রশ্বাস, এইগুলি পূর্ব-বর্ণিত মুখ্য অন্তরায়ের আনুষঙ্গিক সহকারী।

এই বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে শ্বাস-প্রশ্বাস মূল রোগ নহে, রোগের উপসর্গ মাত্র। মূল রোগের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসও আয়ত্ত হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের মূল চিত্তের বিক্ষেপ এবং বিক্ষেপের মূল প্রত্যক্ চৈতন্যের অনুপলব্ধি অর্থাৎ সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞানের অভাব। যে উপায়ের দ্বারা প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎকার হয় তাহারই প্রভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ কালের খেলাও শান্ত হইয়া যায়। প্রণব-জপ এবং প্রণব-বাচ্য ঈশ্বরের ভাবনাকে যোগিগণ আত্মজ্ঞান লাভের মুখ্য হেতু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। প্রণব-জপের রহস্য অবগত হইলে বুঝিতে পারা যায় যে অজপা-জপই শ্রেষ্ঠ জপ এবং অন্য সকল জপই চরম অবস্থায় অজপাতে পর্যবসিত হয়। ইহাই মানুষের স্বাভাবিক জপ।

৩

এক অহোরাত্রে মানুষের স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা ২১৬০০ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। অবস্থাভেদে ইহার কিঞ্চিৎ তারতম্য হইলেও ইহাই সাধারণ নিয়ম। শ্বাসটি বাহির হইয়া যায় 'হং' ধ্বনি করিতে করিতে—ইহার নাম প্রশ্বাস, এবং এটা আবার ভিতরে আসে 'সঃ' ধ্বনি করিতে করিতে—ইহার নাম নিঃশ্বাস।*

---

*"হংকারেন বহির্যাতি সঃকারেন বিশেৎ পুনঃ"—ইহাই সাধারণ মত। কিন্তু রামপ্রসাদের গানে আছে—

'হং' বর্ণ পূরকে হয় 'সঃ' বর্ণ রেচকে বয়,
অহর্নিশি করে জপ হংস হংস বলিয়া।

যোগিগণ বলেন, জীব নিরন্তর শ্বাস-প্রশ্বাসচ্ছলে এই হংসমন্ত্র বা অজপা-গায়ত্রী জপ করিতেছে। জীবমাত্রই ইহা করিতেছে, সুতরাং মনুষ্যও করিতেছে, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ইতর জীব হইতে মানুষের পার্থক্য এই যে মনুষ্য তাহার পুরুষকার দ্বারা এমন সামর্থ্য অর্জন করিতে পারে যাহার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের এই স্বাভাবিক গতিতে বিপর্যয় সম্ভব হয়। অর্থাৎ মানুষ সাধনবলে 'হংসঃ' গতিকে 'সোহং' গতিতে পরিবর্তিত করিতে পারে। তখন আত্মজ্ঞানের পথ খুলিয়া যায় এবং ইড়া-পিঙ্গলাতে প্রবাহশীল বায়ুর বক্রগতি সুষুম্নাতে সরল গতিরূপে পরিণত হয়। সুষুম্না ব্রহ্ম মার্গ। বায়ু ইড়া-পিঙ্গলার মার্গ হইতে আকৃষ্ট হইয়া যে পরিমাণে সুষুম্নাতে প্রবিষ্ট হয় সেই পরিমাণে বিকল্পের উপশম ঘটে ও নির্বিকল্প আত্মজ্ঞানের অবরুদ্ধ দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইতে আরম্ভ হয়। সুষুম্নাতে প্রবেশ না করিলে বায়ু ও মনের ঊর্দ্ধগতি সম্ভবপর হয় না এবং ঊর্দ্ধগতি ব্যতিরেকে বিকার ত্যাগ করিয়া চিত্ত সাম্যভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারে না। যোগিগণ যাহাকে কুম্ভক বলেন তাহা এই ঊর্দ্ধগতির ফলে ক্রমশঃ সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ কুম্ভকের মধ্যে যে গতি থাকে না তাহা নহে। কিন্তু বক্রগতি পরিত্যক্ত হইয়া অন্তর্মুখী সরল গতির সূচনা হয়। এই সরল গতি হইতে অন্তে গতিহীন অবস্থার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহাকে আমরা জাগতিক ভাষায় প্রাণ-অপানের ব্যাপার বলি তাহাই যোগীর ভাষায় হংস মন্ত্রের উচ্চারণ বুঝিতে হইবে।

এই প্রকার বিষম গতির কারণ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে প্রকৃতির ভিতরেই এই বৈষম্যের বীজ নিহিত রহিয়াছে। প্রাণ অপানকে এবং অপান প্রাণকে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছে—কিন্তু উভয়ের স্বাভাবিক গতি পরস্পর বিরুদ্ধ। প্রাণ যে দিকে সঞ্চারিত হয় অপান তাহার বিপরীত দিকে সঞ্চারিত হয়। যদি তাহারা অন্য-নিরপেক্ষ হইত তাহা হইলে বিরোধের কোন সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু তাহা নহে। অপানকে না হইলে প্রাণের

ইহা কিন্তু বিরুদ্ধ কথা, কিন্তু অশাস্ত্রীয় নহে। কারণ শ্রীধর স্বামীর গীতা-টীকাতে (৪-৩০) উদ্ধৃত যোগশাস্ত্রের বচনে ও যোগবীজে (১৩১) আছে যে 'সঃ' ধ্বনির সহিত নির্গম ও 'হং' ধ্বনির সহিত প্রবেশ হয়। জীব সর্বদা হংসঃ মন্ত্র জপ করিতেছে। ইহার পর যোগবীজে আছে—

'গুরুবাক্যাৎ সুষুম্নায়াং বিপরীতো ভবেৎ জপঃ।
সোহং সোহং ইতি প্রাপ্তো মন্ত্রযোগঃ স উচ্যতে ॥' (১৩২)

চলে না, তাই প্রাণ অপানকে চায়, তাঁহাকে আকর্ষণ করে, যদিও অপান বিরুদ্ধবাহী। তদ্রূপ প্রাণকে না হইলে অপানেরও চলে না, তাই অপান প্রাণকে টানে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে প্রকৃত সাম্য অবস্থা হইতে চ্যুত হইয়াই উভয়ের মধ্যে বিরুদ্ধ গতির উদয় হইয়াছে। তাই প্রাণ ও অপান বিরুদ্ধ সঞ্চারী হইয়াও অবিরুদ্ধ সাম্যভাবেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে চায়। যতক্ষণ তাহা না ঘটিবে ততক্ষণ শান্তির সম্ভাবনা নাই। বদ্ধ জীব এই দো-টানার মধ্যে পড়িয়া একবার উঠিতেছে ও একবার নামিতেছে, বাম ও দক্ষিণ পথে সঞ্চরণ করিতেছে, ইহার বিশ্রাম নাই। যোগীর লক্ষ্য এই দুইটি বিরুদ্ধ গতির সমন্বয় সাধন করা। সকল প্রকার অধ্যাত্ম সাধনার ইহাই উদ্দেশ্য।

এই বৈষম্যময়ী গতির দুইটি দিক্ আছে। —একটি দেহগত ও অপরটি কালগত। নাসাপুট হইতে শ্বাস বাহিরের দিকে প্রবাহিত হয় এবং বাহির হইতে উহা ভিতরের দিকে প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই বহির্গতির একটি সীমা আছে। সাধারণ অবস্থায় নাসাপুট হইতে বাহিরে দ্বাদশ আঙ্গুল পর্যন্ত এই বাহ্যগতি লক্ষিত হয়। আগন্তুক *কারণবিশেষে কখনও একই ব্যক্তির শ্বাস-গতিতে গতির কিঞ্চিৎ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। তদ্রূপ প্রকৃতির বৈচিত্র্যবশতঃ বিভিন্ন ব্যক্তির শ্বাসের গতিতেও কিছু কিছু ভেদ থাকে। গতির বিস্তার যত অধিক, বহির্মুখতা ও কালের প্রভাবও তত অধিক জানিতে হইবে। সংযত জীবন অভ্যাসের ফলে ক্রমশঃ এই বহির্গতির হ্রাস হইতে থাকে। এইটি দেহগত বিষম গতির বিবরণ।

কালগত বৈষম্য অন্য প্রকার। একটি নির্দিষ্ট কালের শ্বাস-সংখ্যা দ্বারা এই বৈষম্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্বাস বলিতে বর্তমান প্রসঙ্গে পূরক ও রেচক উভয়ই বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ এক মিনিটে সংসারী সুস্থ মনুষ্যের পনেরটি শ্বাসোচ্ছ্বাস হয়, এইরূপ ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও আগন্তুক কারণবশতঃ ও প্রকৃতিভেদে ইহার কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। তাহা নগণ্য। সংযম ও অভ্যাসের প্রভাবে এই সংখ্যাও ধীরে ধীরে হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

---

*কথিত আছে, ভোজন ও বাক্যালাপে বহির্গতির বৃদ্ধি হয় ছয় হইতে বার আঙ্গুল, গমনে বৃদ্ধি হয় বার হইতে চব্বিশ আঙ্গুল। দ্রুতবেগে ধাবনে ত্রিশ হইতে বিয়াল্লিশ আঙ্গুল পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়। সর্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি হয় স্ত্রী-সঙ্গে—তিপান্ন হইতে পঁয়ষট্টি আঙ্গুল।

এইটি হইল শ্বাসগতির কালের দিক্। বলা বাহুল্য, শ্বাসের বাহ্যমুখতা ও সংখ্যার মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে। সাধারণতঃ বাহ্যগতি বার আঙ্গুল হইলে সংখ্যা পনের হইয়া থাকে, এইরূপ মানা হয়। যোগাভ্যাস অথবা বিশিষ্ট শক্তির প্রভাবে বাহ্যগতি কম হইলে সংখ্যাও তদনুপাতে কম হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্বাসের দেশসম্বন্ধ ও কালসম্বন্ধ সমভাবে একই সঙ্গে শিথিলতা প্রাপ্ত হয়। বাহ্যগতি এক আঙ্গুল কমিলে সংখ্যা কমে সোওয়া, দুই আঙ্গুল কমিলে সংখ্যা কমে আড়াই। অন্তে যখন বাহ্যগতির বার আঙ্গুলই শূন্যে পরিণত হয় তখন সংখ্যাও পনের হইতে শূন্যে পর্যবসিত হয়। অর্থাৎ শ্বাসের দেশগত ও কালগত সম্বন্ধ একই সময়ে বিচ্ছিন্ন হয়। এই অবস্থায় শ্বাসের স্থূল সঞ্চার রুদ্ধ হয় এবং রেচক-পূরকরূপ ব্যাপার শান্ত হয়। ইহারই নাম কুম্ভক, যাহা হইতে পূর্ণ সমাধানের মার্গ উন্মুক্ত হয়। এই সমাধানই স্থিতি। তখনই পূর্ব-বর্ণিত বিক্ষেপের উপশম হয়, তৎপূর্বে নহে।

প্রাণের বাহ্যগতি বা সংখ্যা ন্যূন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তির বিকাশ হয়। প্রথমে কামনা ত্যাগ হয়। প্রাণের চঞ্চলতা হইতেই বাসনার উদ্ভব হয়। প্রাণ শান্ত হইতে আরম্ভ করিলে চিত্তে ক্রমশঃ নিষ্কামভাব স্থান লাভ করে। নিষ্কাম ভাবের অভিব্যক্তির পর আনন্দের অভিব্যক্তি স্বভাব-সিদ্ধ। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'অশান্তস্য কুতঃ সুখম্'। শান্তির উদয় ভিন্ন প্রকৃত সুখের আবির্ভাব হয় না। ইহার পর বাক্‌সিদ্ধি, দূরদৃষ্টি, আকাশ গমন, ছায়ানাশ, এমন কি নির্বাণ পর্যন্ত আয়ত্ত হয়। ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

প্রাণের বাহ্যগতির উপশম সাধনার উদ্দেশ্য। যে প্রকার চিন্তা ও আচরণ দ্বারা এই বাহ্যগতির বৃদ্ধি হয় তাহা সাধন-ক্ষেত্রে বর্জনীয়। অন্ততঃ এইসব বিষয়ে সংযমের অভ্যাস আবশ্যক।

৪

অজপা-সাধনের তত্ত্ব ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে মহাজনগণ গুরু-পরম্পরা অনুসৃত পদ্ধতির বশবর্তী হইয়া বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিভিন্ন প্রকার বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। সাধকের যোগ্যতা ও অধিকারগত বৈশিষ্ট্য হইতে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ইহাদের প্রত্যেকের সার্থকতা আছে।

অজপা কুণ্ডলিনী হইতে উদ্ভূত প্রাণধারিণী প্রাণবিদ্যারূপে যোগি-সমাজে

পরিচিত। শ্যেনপক্ষী যেমন ঊর্দ্ধ আকাশে উড্ডীন হইলেও গুণবদ্ধ থাকিলে নিম্নে পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয় তদ্রূপ প্রাণ ও অপানের ক্রিয়ার বশীভূত জীব ঊর্দ্ধদিকে ও অধোদিকে গতিলাভ করিয়া থাকে। কোন কোন আচার্য বলেন, 'তৎ' পদবাচ্য পরমাত্মা হংসবিদ্যার প্রথম অবয়ব 'হ'-কার দ্বারা বর্ণিত হন এবং 'ত্বং' পদবাচ্য প্রত্যক্ চৈতন্য অথবা খেচরী বীজ দ্বিতীয় অবয়ব 'সঃ'-কার দ্বারা দ্যোতিত হয়। প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে যে অব্যাকৃত আকাশ আছে তাহাতে লিঙ্গ-শরীর বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার প্রতিলোমভাবে হংসের গতি হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আছে—'সঃকারো ধ্যায়তে জন্তুর্হংকারো জায়তে ধ্রুবম্'। 'সঃ' অথবা জীব নিজের জীবত্ব পরিহার করিলে সোহং শব্দের লক্ষ্য প্রত্যক্ আত্মার সহিত অভিন্ন পরমাত্মা ভিন্ন অপর কিছু নহে। যে সাধক নিজের আত্মাকে ধ্যান করিয়া থাকে, তাহার পক্ষে 'হ'-কারাত্মক পরমাত্ম-ভাবের প্রাপ্তি সুলভ হয়।

দ্বিতীয় মতে, হংস বলিতে প্রত্যক্ আত্মা অথবা ব্যষ্টি-তুরীয় বুঝিতে হইবে এবং পরমহংস শব্দে পরমাত্মা অথবা সমষ্টি-তুরীয়কে বুঝাইয়া থাকে। ব্যষ্টি-তুরীয় ও সমষ্টি-তুরীয় পরস্পর যুক্ত হইলে হংসযোগ নিষ্পন্ন হয়। ইহাই অজপার তত্ত্ব।

তৃতীয় মতে, সাধকের প্রজ্ঞা ও সাধনশক্তির তারতম্য অনুসারে অজপা তত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টি অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। মন্দপ্রজ্ঞ, মধ্যপ্রজ্ঞ এবং উত্তমপ্রজ্ঞ সাধকের দৃষ্টি যে ভিন্ন তাহা অধোলিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে। যাহার জ্ঞানশক্তি উজ্জ্বল নহে, যে অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব গ্রহণ করিতে পারে না, তাহার নাম মন্দপ্রজ্ঞ। এইপ্রকার সাধক 'হ'-কার দ্বারা পুরুষ এবং 'স'-কার দ্বারা প্রকৃতি এই দুইটি ধারণা করিয়া থাকে। সুতরাং তাহার দৃষ্টিতে হংসযোগ বলিতে পুরুষ ও প্রকৃতির যোগ বুঝায়। কিন্তু যাহার প্রজ্ঞা অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ, অর্থাৎ যে মধ্যপ্রজ্ঞ, তাহার দৃষ্টি অনুসারে 'হ'-কার অপানের সঞ্চার এবং 'স'-কার প্রাণের সঞ্চার বুঝাইয়া থাকে। মুখ্য প্রাণ যখন পরাঙ্মুখ-ভাবে আবর্তিত হয় তখন তাহাকে প্রাণ না বলিয়া অপান বলা হয়। সুতরাং হংস-বিদ্যার রহস্য মধ্যম সাধকের দৃষ্টি অনুসারে প্রাণ ও অপানের সংযোগ ভিন্ন অপর কিছু নহে। কিন্তু যে সাধক উত্তম প্রজ্ঞাসম্পন্ন তাহার দৃষ্টি আরও সূক্ষ্ম। সে প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ অথবা প্রাণ ও অপানের সম্বন্ধ পরিহার করিয়া আত্ম-

স্বরূপের দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকে। এই সাধক অজপা মন্ত্রের পূর্বভাগ 'অহং'কে জীবাত্মার বাচক এবং উত্তরভাগ 'সঃ'কে শক্তিবাচক বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে।

অধিকার ভিন্ন বলিয়া অজপা-জপের বিধানও ভিন্ন। নিম্নাধিকারী তালু, ওষ্ঠ প্রভৃতি দৈহিক উচ্চারণ-যন্ত্রের ব্যাপারের দ্বারা অজপা-জপ সম্পাদন করে। এইসকল সাধকের চিত্ত সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত বা শোধিত নহে। তাই ইহারা দেহগত ক্রিয়াকে আশ্রয় না করিয়া জপ-সাধন করিতে পারে না। কিন্তু যাহারা মধ্যম অধিকারী তাহাদের চিত্ত-সংস্কার অধিক। এইজন্য তাহাদের পক্ষে অজপা-জপ করিবার জন্য তালু প্রভৃতির কোনপ্রকার ক্রিয়া আবশ্যক হয় না। তাহাদের অধিকার উচ্চ বলিয়া তাহাদের বিধানও ভিন্ন। তাহাদের পক্ষে দৈহিক উচ্চারণের প্রয়োজন না থাকিলেও অন্যপ্রকার অনুসন্ধানের আবশ্যকতা রহিয়াছে। তাহাদিগকে ভাবনা করিতে হয় যে অজপা মন্ত্রের 'সঃ' অংশ প্রাণরূপে এবং 'হং' অংশ অপান-বৃত্তিরূপে নিজ দেহে সর্বদা অনুস্যূত রহিয়াছে। 'হং' শব্দের সহিত অপান বৃত্তির সাম্যমূলক সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাই 'হং'-কার অপান বৃত্তির সূচনা করে। তদ্রূপ 'সঃ'-কার প্রাণকে বুঝাইয়া থাকে। 'সঃ' এবং 'হং', মন্ত্রের এই দুইটি ভাগ, প্রাণ ও অপান বৃত্তিরূপে নিজের দেহে সর্বদাই ক্রিয়া করিতেছে—এইপ্রকার নিরন্তর চিন্তাই অজপা-জপ। প্রাণাপানরূপে বিদ্যমান এই মন্ত্র যে সাধক গুরুমুখ হইতে অধিগত হয় সে 'অজপমপি' অর্থাৎ তালু আদির ব্যাপার না করিলেও তাহাতে প্রাণাপানরূপ মন্ত্র অনুস্যূত থাকে। সেইজন্য সর্বদাই তাহার জপ হইয়া থাকে। তাই এই হংসমন্ত্রকে অজপা বিদ্যা বলে। বাচিক জপ অপেক্ষা এই অনুসন্ধানরূপ জপ অধিক প্রবল এবং অধিক ফলপ্রদ। তথাপি এই জপের সঙ্গে আস্তিক্যভাব, গুরুভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সমাবেশ থাকিলে বলের আধিক্য হয়। এই হইল মধ্যম অধিকারীর কথা। কিন্তু উত্তম অধিকারীর জন্য অজপার বিধান অন্যপ্রকার। বলা বাহুল্য, উচ্চ অধিকারীর চিত্ত শ্রবণ, মনন প্রভৃতির অভ্যাস-বশতঃ অত্যন্ত বিশুদ্ধ। এই জাতীয় সাধক ধারণা করে যে-অজপা-মন্ত্রের পূর্বভাগ 'অহং' জীবকে বুঝায়, যে জাগ্রৎ প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার সাক্ষী। নিজেকে সুখী অথবা দুঃখী অনুভব করা যায়, তাই বুঝা যায় যে 'অহং' পদার্থ জীবের বাচক। কিন্তু মন্ত্রের উত্তরভাগে যে 'সঃ' পদ আছে তাহা ইহাদিগের মতে শক্তির বাচক।

এই শক্তি বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র বিশ্বের কারণ পরমেশ্বরের নামান্তর। সুতরাং সংসারিরূপে প্রতীয়মান 'অহং'ই প্রকৃত প্রস্তাবে 'সঃ' অথবা পরমাত্মা। ইহাই অজপা-জপের তাৎপর্য।

৫

যোগিসমাজে অজপা-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আরও বহু বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কোন কোনটি শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে নিবদ্ধ রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

এই মতে সর্বপ্রথম কেবল-কুম্ভক দ্বারা এমন একটি অবস্থা লাভ করিতে হয় যখন রেচক ও পূরক কিছুই থাকে না। এই সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের বেগ শান্ত থাকে। এই অবস্থায় নাভিকন্দে প্রাণ ও অপানের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিকে সহস্রদল কমল হইতে নিরন্তর যে অমৃতধারা ক্ষরিত হইতেছে উহা ঐ সময়ে পান করিবার অবসর জন্মে। প্রাণের চঞ্চল অবস্থায় ঐ অমৃত পান করিবার সম্ভাবনা নাই। যখন যোগী প্রাণ ও অপানের সমতা লাভ করিয়া শান্তিতে অবস্থিত হয় ও পূর্বোল্লিখিত অমৃত প্রাপ্ত হয় তখন তাহার কর্তব্য ঐ অমৃত স্বয়ং পান না করিয়া উহার দ্বারা নাভিস্থিত জলন্ত মহাদেবের অভিষেক করা ও সঙ্গে সঙ্গে হংস হংস বলিয়া হংস মন্ত্রের আবর্তন করা। এই উপলক্ষ্যে দেহে প্রত্যক্ষ যজ্ঞ করার প্রয়োজন হইয়া থাকে। এইটি আধ্যাত্মিক সূর্যগ্রহণ। দেহ-তত্ত্ববিদ্ যোগী যখন দেহে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন নামক দুইটি অয়ন ও বিষুব দর্শন করেন তখন তিনি দেহে থাকিয়াই সকল ও নিষ্কল বিন্দুর সাক্ষাৎকার লাভ করেন। প্রাণ ইড়া হইতে পিঙ্গলাতে সঞ্চরণ করে এবং পিঙ্গলা হইতে ইড়াতে প্রত্যাবর্তন করে। এই দুইটি উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন নামে প্রসিদ্ধ। প্রাণের মূলাধারে প্রবেশ একটি বিষুব এবং উহার মস্তকে প্রবেশ আর একটি বিষুব। বিষুব বলিতে ঠিক সেই অবস্থা বুঝায় যাহাতে দিন ও রাত্রির সাম্য প্রকাশিত হয়। দেহের মধ্যেও এই দুইটি বিন্দুতে সাম্য প্রকাশিত হয়। তাই ইহাদিগকে বিষুব বলা হয়। যোগীর কর্তব্য, সহিত (মন্ত্রযুক্ত) অথবা কেবল (মন্ত্রহীন) প্রাণায়ামের দ্বারা অর্থানুসন্ধান সহকারে প্রণব ও হংস মন্ত্র উচ্চারণ করা, প্রণবার্থ যে হংস তাহাকে সোহংরূপে অনুসন্ধান করা। এই ঐক্যানুসন্ধানই নমস্কার-যোগের রহস্য। অজপার তাৎপর্য ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে। ইহার

পর মূত্রাধারণ আপনিই হইয়া থাকে। এই মুদ্রাটিকে চিন্মুদ্রা বলে। প্রচলিত ভাষায় ইহারই নাম শাম্ভবী বা খেচরী মুদ্রা। এই মুদ্রার তাৎপর্য এই যে নিজ হইতে ভিন্ন অপর কিছুই নাই এই বোধে স্থিতি। আত্মার অর্চনের প্রশস্ত পদ্ধতি সর্বদা 'সোঽহমস্মি' রূপে ধ্যানে মগ্ন থাকা। ইহার নাম প্রত্যক্ষ যাগ। এই সময়ে প্রাণ পিঙ্গলা মার্গে কুণ্ডলিনী স্থানে প্রবেশ করে। ইহাই আধ্যাত্মিক সূর্যগ্রহণ।

উপনিষদে হংস-যোগের বা অজপা-সাধনের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই যোগের প্রভাবে প্রত্যগাত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞান জন্মে। ইহাই হংস-জ্ঞান। যে সকল যোগী এই পদ্ধতি অনুসারে অজপা-সাধনে অগ্রসর হয় তাহাদিগকে প্রথমে সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া বাম গুল্ফ দ্বারা গুদস্থান আবেষ্টনপূর্বক পূরক ক্রিয়া করিতে হয়। এইভাবে মূলাধারে বায়ু সঞ্চিত হইয়া থাকে। ইহার পর নিজের শক্তি অনুসারে আকুঞ্চন-ক্রিয়া দ্বারা মূলাধার হইতে ঐ বায়ুকে উঠাইতে হয়। এই পর্যন্ত ক্রিয়া সিদ্ধ হইলে প্রাণ ও অপানের সাম্য স্থাপন আবশ্যক হয়। প্রাণ ও অপান সাম্যভাবাপন্ন হইলে মূলাধারস্থিত ত্রিকোণে যে অগ্নি আছে তাহাকে উঠাইয়া প্রাণ ও অপানের সহিত যুক্ত করিলেই কুণ্ডলিনী শক্তি জাগিয়া উঠে। কুণ্ডলিনীর জাগিবার পর ঐ জাগ্রৎ-কুণ্ডলিনী দ্বারা ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিতে হয়। এই গ্রন্থিভেদ না হওয়া পর্যন্ত ষট্‌চক্রের প্রথম চক্র মূলাধারে অর্থাৎ চতুর্দলে প্রবেশ করিবার সামর্থ্যই জন্মে না। কমলে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ কমলের যে একটি বিন্দু অথবা তুরীয় ভূমি আছে তাহাকে ধ্যান করিতে হয়। ইহার নাম বিরাটের ধ্যান। এই ধ্যানের ফলে উর্দ্ধগতি জন্মে। তখন ষড়্‌দল স্বাধিষ্ঠান চক্রকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া দশদল মণিপুরে গমন করিতে হয়। তখন আবার গ্রন্থিভেদের আবশ্যকতা হয়। এই গ্রন্থির নাম বিষ্ণুগ্রন্থি। ইহা অনাহত চক্রের নীচে অবস্থিত। ইহাকে ভেদ করিতে না পারিলে হৃদয়-চক্রে প্রবেশ করিতে পারা যায় না। হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া পূর্বের ন্যায় ঐ চক্রস্থ মধ্য-বিন্দুতে তুরীয় ধ্যান আবশ্যক হয়। ইহা সূত্রাত্মার ধ্যান। এই সময় সবিকল্প সমাধির উদয় হয়। অনাহত অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ চক্রে প্রবেশ করিবার মার্গে স্তনবৎ লম্বমান দুইটি মাংস খণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। তখন পার্শ্বস্থ দুইটি পথ ত্যাগ করিয়া মধ্যপথ আশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধে প্রবেশ করিতে হয়। সেখানে প্রাণ নিরুদ্ধ হয়। ইহার পর তৃতীয় বা অন্তিম গ্রন্থি ভেদ করিয়া আজ্ঞা-চক্রে উঠিতে

হয়। এই গ্রন্থিটির নাম রুদ্রগ্রন্থি। ইহা আজ্ঞা-চক্রের নীচে অবস্থিত। আজ্ঞাতে প্রবেশ করিবার পর ওখানকার বীজ বা তুরীয়ের ধ্যান আবশ্যক হয়। যোগী এই পর্যন্ত মার্গ অতিবাহিত করিতে পারিলে চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি এই তিনটি তেজকে অথবা তিনটি বিন্দুকে মিলিত করিতে সমর্থ হয়। তখন এই তিনটি তেজের পার্থক্য থাকে না। তিনটি মিলিয়া একটি মহাতেজের বিকাশ হয়। ইহার ফলে সহস্রার হইতে ক্ষরিত অমৃতের আস্বাদন করিবার অধিকার জন্মে। তখন যোগী অজর ও অমর পিণ্ড লাভ করিয়া সহস্রারশোভী ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া থাকে। সেখানে তুর্য বা তুর্য-তুর্যের অপরোক্ষ দর্শন ঘটে। তুর্য বলিতে চতুর্থকে বুঝায়। যাহার উপর তিন মাত্রা আরোপিত হয় তাহারই নাম তুর্য। যখন এই অবস্থার অনুভব হয় তখন নিজেকে ত্রিমাত্র বলিয়া প্রতীতি জন্মে। কিন্তু তুর্য-তুর্যে মাত্রা লুপ্ত হইয়া যায়। ইহাই অমাত্র পরিস্থিতি। এই সাক্ষাৎকারটি ক্ষণিকের জন্য না হইয়া সদাকালীন হওয়া আবশ্যক। তুর্যে কিঞ্চিৎ সাকার ভাব থাকে। কিন্তু তুর্য-তুর্যে সাকার ভাব মোটেই থাকে না। ইহা প্রতিদ্বন্দ্বিহীন এক ও অদ্বয়। পরমহংস অবস্থা ইহারই নামান্তর। তুর্য-তুর্যের স্বগত অংশ হইতে তুর্য উদ্ভূত হয়। ইহাকে যোগিগণ কোটি সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহার বর্ণনা চলে না। তুর্যের সহিত অভিন্ন ধরিয়া লইয়া এইরূপ বর্ণনা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহা বর্ণনার অতীত।

৬

অজপা যে আত্ম-মন্ত্র ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় জীবাত্মা বস্তুতঃ পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, এই মহাতত্ত্বই এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য। এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা আত্মা, শক্তি 'স' ও বীজ 'হ'। এই মন্ত্রের দুইটি ভাগ—একটি শক্তি ও অপরটি বীজ। তাই ইহা শিবশক্তি-ঘটিত।

বিদ্যা বা সংবিদ্রূপিনী শক্তিই মন্ত্রাত্মা 'স'-কারের বাচ্যার্থ। সেইরূপ উক্ত শক্তির প্রতিপাদ্য নিষ্কল পরশিবই 'হ'-কারের প্রতিপাদ্য। শব্দাত্মক শক্তি ও বীজ অর্থাৎ 'স' ও 'হ' এই সকল ও নিষ্কল স্বরূপেরই প্রতিপাদন করে। সত্য-জ্ঞানাদি লক্ষণ নিরুপাধিক স্বপ্রতিষ্ঠ অন্তরাত্মরূপী চৈতন্যই পরশিব। 'অহং'

শব্দ অন্তরাত্মা অথবা প্রত্যগাত্মাকে বুঝায় বলিয়া উহার দ্বারা পরশিবেরই প্রকাশ হইয়া থাকে। এই শিবস্বরূপ নিজের মায়ার দ্বারা যখন নিজেই নিজের প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী উদ্‌ভাবন করেন তখন ঐ প্রতিযোগীটি তাঁহার দ্বিতীয় হয় ও উহাকে শক্তি বলা হইয়া থাকে। অজপা মন্ত্রে যে 'সঃ'-কার আছে তাহা এই শক্তিকেই বুঝাইয়া থাকে। এই মন্ত্র সেইজন্য শিব ও শক্তি উভয়াত্মক, কারণ 'হ' পুরুষের এবং 'স' প্রকৃতির বাচক। প্রপঞ্চসারে ভগবান্ শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—

হকারঃ পুরুষঃ প্রোক্ত স ইতি প্রকৃতির্মতা।
পুং-প্রকৃত্যাত্মকো হংসঃ তদাত্মকমিদং জগৎ॥

শিব-শক্ত্যাত্মক অর্দ্ধনারীশ্বর অর্থাৎ শক্তিযুক্ত পরমেশ্বর নিরন্তর ঐ পরশিব-স্বরূপকে ধ্যান করেন ও ঐ মন্ত্র জপ করেন।

৭

দ্বাদশ দল হৃৎ-কমলের মধ্যে চারিটি দলের সহিত শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন সম্বন্ধ হয় না—হংস ঐ চারিটি দলকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রাণ-অপান উপাধিযুক্ত জীবকেই এই স্থলে হংস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই হংস যদিও উক্ত চারিটি দলকে স্পর্শ করে না তথাপি ইহা বাকী আটটি দলে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া থাকে। জীবের চিত্তে যে প্রতিক্ষণে নানাপ্রকার ভাবের উদয় হয় তাহা সকলেই জানেন। আপাততঃ বিনা কারণে এই সকল ভাব চিত্তে কেন যে নিরন্তর উদিত হয় অজ্ঞান-সমাচ্ছন্ন জীব তাহার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করিতে পারে না। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে এইসকল ভাব বা বিকল্পরাশি সংখ্যায় অনন্ত হইলেও স্থূল দৃষ্টিতে আট শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। যোগিগণ বলেন যে জীব ভ্রমণকালে যখন যে দল স্পর্শ করে বা যখন যে দলে প্রবিষ্ট হয় তখন তাহার অনুরূপ ভাবই তাহার চিত্তে উদিত হয়। পূর্বদিকের দল হইতে ঈশান কোণের দল পর্যন্ত মোট আটটি দল আছে জানিতে হইবে। শাস্ত্রকারগণ ও অনুভব সিদ্ধ মহাজনগণ দলবিশেষের সহিত ভাববিশেষের সম্বন্ধ সূক্ষ্মভাবে নিরূপণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে কাহারও কাহারও সহিত কিঞ্চিৎ মতভেদের অবসর রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাব ও রসের সাধকগণ এই বিজ্ঞান অনুসরণ করিয়া আপন আপন সাধন

পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন। কমলের মধ্যে দল ও কর্ণিকা এই দুইটি প্রধান অংশ। বায়ু যখন দলে সঞ্চরণ করে তখন চিত্ত চঞ্চল এবং বহির্মুখ থাকে। ঐ সময়ে বাসনা প্রভৃতির প্রভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয়, কিন্তু যদি বায়ু দল ত্যাগ করিয়া মধ্য বিন্দু বা কর্ণিকাতে প্রবেশ করে তাহা হইলে নিজের অতিরিক্ত বিষয়ে অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ে বৈরাগ্যের আবির্ভাব হয়। কেশরে বায়ু-সম্বন্ধবশতঃ জাগ্রৎ দশার বিকাশ হয়। তখন অহঙ্কার কার্য করে পূর্ণ মাত্রাতে। বায়ু কর্ণিকাতে প্রবিষ্ট হইলে অহঙ্কার অর্দ্ধ-বিকশিত অবস্থাতে পরিণত হয়। এইটিই স্বপ্ন দশা। বিন্দু বা কর্ণিকার অন্তঃস্থিত শূন্যে বায়ুর প্রবেশ হইলে সুষুপ্তি দশার উদয় হয়। তখন অহঙ্কার থাকে না। ইহাকেও অর্থাৎ এই শূন্যকেও অতিক্রম করিতে হয়। তখন আর কমলের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না। তখনকার অবস্থার নাম তুরীয়। ইহাই সাক্ষাৎকারের অবস্থা। তখন হংস প্রত্যাগাত্মার সহিত অভিন্ন পরমাত্মার স্বরূপে প্রকাশিত হয়। হংসের উপর নাদের ক্রিয়া থাকে। তাহার ফলে মন ধীরে ধীরে নিজেকে হারাইতে থাকে। চরম অবস্থাতে উন্মনী ভাবের উদয় হয়। এইটি তুরীয়াতীত অবস্থা। এই তুরীয়াতীত স্থিতিও সাধিষ্ঠান ও নিরধিষ্ঠান ভেদে দুইপ্রকার। সাধিষ্ঠান স্থিতিতে দেহ থাকে, কিন্তু ত্রিতাপের পীড়া থাকে না। এই অবস্থায় নাদ বা অর্দ্ধমাত্রা থাকে। কিন্তু যখন দেহ থাকে না তখন নাদও থাকে না—তখন নাদ প্রত্যগাত্মার সহিত অভিন্ন পরমাত্মাতে অথবা হংসেতে লীন হয়। এইটি প্রতিযোগিহীন অদ্বৈত ব্রহ্ম অবস্থা।

শ্বাস-প্রশ্বাসই আত্মমন্ত্র। নিশ্বাস 'সঃ'-কার বা ত্বং পদার্থ এবং উচ্ছ্বাস বিন্দুর সহিত আকাশ বীজ 'হং'-কার। ইহা তৎ পদার্থ। পুনঃ পুনঃ এই উভয়ের যোগই আমি। ইহারই নাম তত্ত্বমসি। অজপার ইহাই স্বরূপ-রহস্য।

৮

অজপা-সাধন সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইল, কিন্তু এই সাধনায় ব্রতী না হইলে, ইহার রহস্য সহজে বোধগম্য হয় না। জপের সংখ্যা না রাখিলেই যে অজপা হয় ঠিক তাহা নহে, অথবা সংখ্যা না রাখিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে জপ করিলেই যে অজপা হয় তাহাও নহে। বাচিক, উপাংশু অথবা মানসিক যে কোন ক্রমে বদ্ধ থাকিলেও অজপা হয় না। অথচ প্রত্যেক সাধন ক্রিয়ারই

একটা না একটা ফল আবশ্যই হইয়া থাকে। শাস্ত্রানুসারে মহাজনগণ নামকে 'চৈতন্য-রসবিগ্রহ' ও 'চিন্তামণি' রূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহা খুবই সত্য কথা। নাম শুধু লৌকিক আকাশ-ধর্ম শব্দ মাত্র নহে। উহা চেতন এবং পূর্ণ জীবনীশক্তি সম্পন্ন। উহা ভগবানের অনুগ্রহে বা গুরুকৃপাতে নিজের বলই চলিতে থাকে। উহা শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় বাক্ যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়াও নিজ শক্তিতেই কার্য করে। অহংকারবিমূঢ় জীব নিজের চেষ্টাতে অথবা নিজের ইচ্ছাতে ভগবানের জাগ্রৎ নাম জপ করিতে পারে না, কারণ চিন্ময় নাম স্বতন্ত্র। সদ্গুরুর অনুগ্রহপ্রাপ্ত সাধক শুধু দ্রষ্টা হইয়া এইপ্রকার নামের খেলা দেখিতে থাকে এবং শ্রোতা হইয়া নিরন্তর ইহার অনুগমন করিতে থাকে। অজপার ইহাই রহস্য যে স্বভাব হইতেই জপের ক্রিয়া হয়—নিজেকে কিছুই করিতে হয় না। নিজে ক্রিয়ার পৃষ্ঠভূমিতে থাকিয়া শুধু ঐ খেলার দ্রষ্টারূপে অবস্থান করে।

এইজন্যই সদ্গুরু কর্তৃক শক্তি-সঞ্চার সর্বপ্রথমেই আবশ্যক হয়। অবশ্য ইহা বাহির হইতেও হইতে পারে এবং সৌভাগ্য থাকিলে ভিতর হইতেও হইতে পারে। তা ছাড়া, যতটা সম্ভব মন হইতে পৃথক্ভাবে থাকিয়া প্রকৃতির খেলা দেখিতে হয়। কল্পনা মনের ধর্ম বলিয়া উহা সর্বপ্রকারে বর্জন করিতে হয়। সত্য স্বয়ংপ্রকাশ—উহা নিজের আলোকে নিজেই প্রকাশিত হয়। মন অথবা কল্পনা-শক্তি উহাকে আবৃতবৎ অথবা খণ্ডিতবৎ করিয়া রাখে মাত্র। শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন স্বাভাবিক, তেমনই উহার সঙ্গে নাম গ্রথিত হইয়া গেলে উহার ক্রিয়াও স্বাভাবিক হয়। কেহ কেহ জপসহকারে প্রাণের নিয়ন্ত্রণ ক্রিয়াও অভ্যাস করিয়া থাকেন। প্রাণকে নিয়ন্ত্রিত করিলেই বদ্ধ প্রাণকে মুক্ত প্রাণরূপে পরিণত করা সম্ভবপর হয়। কণ্টকের দ্বারা যেমন কণ্টকের উদ্ধার হয়, তেমনই প্রাণকে বদ্ধ করিলেই অবাধিত মুক্ত প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়। এই যে প্রাণায়ামের ক্রিয়া ইহাতে দেহাত্মবোধ সহজেই কাটিয়া যায় এবং বাহ্য-স্মৃতি ও দেহ-সংস্কার লুপ্ত হয়। ঐ সময়ে চৈতন্যময় প্রবাহশীল একমাত্র নামের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। ঐ প্রাণের নিয়ন্ত্রণের অন্তর্গতভাবে নবদ্বার রুদ্ধ করিতে হয়। একবার প্রাণবায়ুর অন্তর্মুখ আকর্ষণের পর সাধারণ বায়ুর অন্তঃপ্রবেশ বন্ধ করিতে হয়। নামের জীবন্ত প্রবাহে মনকে সংলগ্ন করিতে হয়, এবং নিজের সামর্থ্য অনুসারে ঐ অন্তরাকৃষ্ট বায়ুকে ধারণ করিতে হয়। বাহ্যজগতের

সংস্কার ও দেহাত্মবোধ লুপ্ত হইয়া গেলে আধ্যাত্মিক মার্গের প্রধান প্রতিবন্ধক দূর হইয়া যায়।

প্রশ্ন হইতে পারে: শ্বাস-প্রশ্বাস যখন বিক্ষেপরূপে পরিগণিত হয় তখন শ্বাস-প্রশ্বাসকে আশ্রয় করিয়া নাম-সাধনার সার্থকতা কি? ইহার উত্তর এই—শ্বাস-প্রশ্বাস যে বিক্ষেপ তাহা সত্য এবং যে স্থানে যাইয়া স্থিতি নিতে হইবে উহা শ্বাস-প্রশ্বাসহীন, মনের চাঞ্চল্যহীন, সুশান্ত, পরমস্থান। কুম্ভকের অবস্থাতে ঐ পরমস্থানে প্রবেশলাভ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসকে অবলম্বন না করিয়া সে স্থানে স্থিতিলাভ করা যায় না। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিতে না পারিলে প্রকৃত কুম্ভক হইতেই পারে না; কারণ, ইন্দ্রিয়দ্বার খোলা থাকিলে মনের চঞ্চলতা অবশ্যম্ভাবী এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের চঞ্চলতাও স্বাভাবিক। জ্ঞানের দ্বার নিরুদ্ধ হইলে বাহ্য-স্মৃতি লুপ্ত হয় ও স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসও অস্বাভাবিক ও অশান্তিকর বলিয়া মনে হয়।

কোন কোন মহাত্মা অজপা সম্বন্ধে বলেন যে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ হইলে তালুমূল হইতে নাভি পর্যন্ত একটি আকর্ষণ-বিকর্ষণাত্মক ক্রিয়ার অনুভব হয়। ঐ অবস্থা না হইলে প্রকৃত অজপা ক্রিয়া হইতে পারে না।

৯

আমরা সাধারণতঃ মনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছি। বস্তুতঃ আমি যে মন হইতে পৃথক্‌, মনের সাক্ষী ও মনের নিয়ামক তাহা আমরা সর্বদাই ভুলিয়া থাকি। ইহার ফলে মনের সঙ্গে নিজের তাদাত্ম্য অর্থাৎ অভেদভাব অত্যন্ত গাঢ় হইয়া পড়ে। সেইজন্য অনেক সময় কার্যক্ষেত্রে মনই আমি হইয়া বসে। এইরূপ অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের কার্যের সহিত মন লিপ্ত হইয়া যায়—মন ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। তখন অভিমান জাগিয়া উঠে অর্থাৎ কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বভাব উদিত হয়। নিজে কর্মের কর্তা সাজি বলিয়া সুখ-দুঃখের ভোগরূপ বোঝা নিজেকেই বহন করিতে হয়। সাংসারিক বদ্ধ জীবনের ইহাই স্বরূপ।

কিন্তু মন হইতে নিজেকে কতকটা বিবিক্ত করিতে পারিলে মনও ইন্দ্রিয়-ব্যাপার হইতে বিবিক্ত হইতে পারে। ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের সঙ্গে প্রাণের খেলার সম্বন্ধ রহিয়াছে। জ্ঞানের ব্যাপারও প্রাণের খেলা, কর্মের ব্যাপারও প্রাণের

খেলা। প্রাণই বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে খেলা করিতেছে—ইহাই প্রকৃতির খেলা। মন যদি তটস্থ হইয়া এই খেলা দেখে তাহা হইলে ঠিক হয়। কিন্তু সাধারণতঃ তাহা হয় না। মন খেলা দেখিয়া নিজেই খেলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু অজ্ঞানের প্রভাবে খেলা-ভাব ঢাকা পড়ে অর্থাৎ নিজে কর্তা সাজিয়া অভিনয় করে, সাক্ষিভাবে অভিনয় দর্শন করে না। তাই রসও পায় না। প্রাণ খেলিতেছে, তার সংসর্গে মনও খেলিতেছে। মনের অশান্তি বা চঞ্চলতার ইহাই রহস্য।

সকল অশান্তির মূল কারণ এই যে আমি দ্রষ্টা নহি। আমি দ্রষ্টা হইলেই বিনা চেষ্টাতেই মন নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইবে। মন তখন স্বচ্ছ ও নির্মল। তখন উহাতে প্রাণের খেলা আরোপিত হয়। মন ঐ খেলাতে ভাবের আরোপ করে, আমি দ্রষ্টা হইয়া তাহা দেখি। মন সত্ত্বস্বরূপ—তাহার মধ্য দিয়া দেখিলে আত্মার তটস্থ ভাব অক্ষুণ্ণ থাকিয়াও আত্মা অভিনেতা-অভিনেত্রী হইতে নিজের ভেদ ভুলিয়া যায়, অর্থাৎ উহাদিগকে আপন করিয়া লয়। অথচ নিজে প্রেক্ষকই থাকে। মন মধ্যস্থ না থাকিলে এইপ্রকার স্থিতি হইতে পারে না।

এই যে মনের কথা বলা হইল ইহা শুদ্ধ মন বা শক্তি। পরমাত্মার পক্ষে যাহা শক্তি, জীবাত্মার পক্ষে তাহাই মন। শুদ্ধ মন যোগমায়ার পরিণতি এবং অশুদ্ধ মন মলিন মায়ার পরিণতি। করা, করান, দেখা ও দেখান সর্বত্রই ইহার আবশ্যকতা আছে।

খেলা করে প্রাণ, প্রকৃতি (শুদ্ধ ও অশুদ্ধ)। এখন ইহাই আবশ্যক যে মন যেন ঐ খেলা দেখে, অর্থাৎ আমি নিজে সাক্ষী থাকিয়াও শুদ্ধ মনের যোগে যেন উহা দেখি। সাক্ষী না থাকিলে শুদ্ধ মনকে পাওয়ার কোন উপায় নাই। তখন যাহা পাওয়া যায় তাহা মলিন মন, যাহা খেলায় জড়িত হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও জড়িত করে। মনকে বাদ দিলেও আত্মা দ্রষ্টাই থাকে, কিন্তু সেই অবস্থায় আত্মা যা কিছু দেখে নিজের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন দেখে। তাহাতে লীলা দর্শন হয় না। যদিও মূলে সেই নিজেকে-নিজে-দেখা অবশ্যই থাকে, তথাপি লীলা-দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ ভেদ থাকা আবশ্যক। তাই রসাস্বাদনের জন্য স্বচ্ছ মন অপরিহার্য। এই মন হয় তখন দর্পণ, যাহাতে স্বভাবের খেলা প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারই নাম ভাবের খেলা। শুদ্ধ মনকে

বাদ দিলে ভাবাতীত স্থিতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে রসাস্বাদ থাকে না—থাকে শুধু অনন্ত ও অবাধিত আত্মদৃষ্টি।

মনোময় বা সত্ত্বময় স্তরেই খেলা হয়, দেখে আত্মা। এই খেলা অনন্ত—দেখিতে দেখিতে দেখার শেষ পাওয়া যায় না। আবার দেখিতে দেখিতে বিশ্রামও আসে। তখন ভাবাতীতে স্থিতি হয়। সাক্ষী যিনি আছেন তিনি থাকেন বিশ্রামের সাক্ষী। বিশ্রামের সাক্ষী যে, খেলার সাক্ষীও সেই। বিশ্রামের সাক্ষী নিকুঞ্জ-বিহারের দ্রষ্টা এবং খেলার সাক্ষী কুঞ্জ-লীলার দ্রষ্টা। সাক্ষী কিন্তু একই।

আত্মা ভাব-রঞ্জিত হইয়া প্রাণের খেলা দেখে। অর্থাৎ সহৃদয় না হইলে খেলা দেখিয়া রসের অনুভব হয় না। তার নিজের কাছে কোন খেলাই খেলা নয়। আত্মা ভাব-রঞ্জিত না হইয়া বিশুদ্ধ দ্রষ্টাভাবে মনকে দেখিলে মন নিষ্ক্রিয় হইবে বলিয়া প্রাণের খেলা আর তখন থাকিবে না।

আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রবাহ এই প্রাণের খেলা। নিরন্তর অধঃ-ঊর্দ্ধে এই খেলা চলিতেছে। শিব হইতে শক্তি পর্যন্ত এবং পুনরায় শক্তি হইতে শিব পর্যন্ত এই প্রবাহ চলিতেছে। শিব-শক্তির বিচ্ছেদ বা বিরহকালে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান থাকে। তখনই এই প্রবাহ চলে। শ্বাসের ক্রিয়া ইহারই নামান্তর। যখন শিব-শক্তির মিলন সংঘটিত হয় তখন এই প্রবাহ থাকে না—শ্বাসের ক্রিয়াও থাকে না, একটি পরম শান্তভাবে স্থিতি হয়।

শিব-শক্তির বিচ্ছেদ অবস্থাতে আত্মা মনে এবং মন প্রকৃতিতে বা প্রাণে জড়িত থাকে। আত্মা স্ব-বলে দ্রষ্টা হইয়া যদি মনকে দৃশ্য করে তাহা হইলে মনও তটস্থ হইয়া প্রাণের খেলা দেখিতে পারে। এইজন্য মনকে শ্বাসের গতির নিরীক্ষণ কার্যে সংলগ্ন করিতে হয়, এবং নিজে মনের পৃষ্ঠভূমিতে নীরবে অবস্থান করিতে হয়। সাধারণতঃ মন শ্বাসের সঙ্গে ও প্রাণের সঙ্গে সঞ্চালিত হয়: তাই শ্বাস চলে। কিন্তু মন যখন শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে না চলিয়া উহার গতি নিরীক্ষণ করিতে থাকে তখন আমিও উদাসীন হই এবং ঐ সঙ্গেই শ্বাসের গতিতেও মন্দতা আসিয়া পড়ে।

ইহারও একটি পরাবস্থা আছে। উহা অদ্ভুত রহস্য। যখন শিব-শক্তির মিলন হয়, যখন প্রাণ ও অপানের যোগ হয়, যখন বায়ু স্তম্ভিত হয়, মন স্তম্ভিত হয়, সমগ্র বিশ্ব স্থগিত হয়, কালের গতি নিরুদ্ধ হয়, পরম শান্তির উদয়

হয়, তখন সেই মহা-স্থিতিতেও ভিতরে ভিতরে একটি ব্যাপার চলিতে থাকে। হংস অবস্থা হইতে ইহা পরমহংস অবস্থায় উন্নয়ন। ইহাকেই আত্মরমণ বলে। ইহা নিজের সঙ্গেই নিজের বিহার। দ্বিতীয় ত তখন কিছু নাই—শিব-শক্তি তখন মিলিত। মিলিত হইলেও তাহাতে অন্তঃক্রিয়া আছে। শিব ও শক্তির এইটি পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট স্বরূপ। ইহা অতি গুপ্ত। আগম বলেন, এই অনুত্তর অক্ষররূপী পরমেশ্বর নিজের অন্তভূত ও নিখিল প্রপঞ্চলয়াত্মক বিমর্শশক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট বা প্রতিবিম্বিত হয়, তারপর ঐ বিমর্শশক্তি নিজের অন্তঃস্থিত প্রকাশময় প্রতিবিম্বে অনুপ্রবিষ্ট হয়। আত্মারাম অবস্থার ইহাই পূর্বাভাস।

জপ-বিজ্ঞান

অনেকেই জানিতে ইচ্ছা করেন যে জপ করিতে করিতে ক্রমশঃ অন্তর্মুখী গতি লাভ হয় না কেন এবং যখন অন্তর্মুখী গতির উদয় হয় তখন ঐ গতির চরম লক্ষ্যই বা কি? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে জপের বিজ্ঞানটি ভালরূপে বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ জপ তিনপ্রকারের হইয়া থাকে, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। একটি বাচিক জপ, একটি উপাংশু জপ এবং একটি মানস জপ —এই তিনপ্রকার জপের মধ্যে বাচিক জপ নিষিদ্ধ এবং মানসিক জপ শ্রেষ্ঠ হইলেও সাধারণতঃ অগম্য। এইজন্য উপাংশু জপের বিধান অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই তিন জপেরই বৈশিষ্ট্য একইপ্রকার। বৈখরী জপে সর্বত্রই বাহ্য বায়ুর আবশ্যকতা আছে। কারণ উহাতে কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বায়ুর আঘাত আবশ্যক হয়। বাস্তবিক পক্ষে উপাংশু জপেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে বাহ্য বায়ুর ক্রিয়া বর্তমান থাকে। মানসিক জপে বাহ্য বায়ুর প্রভাব না থাকিবারই কথা, কিন্তু সাধারণ মনুষ্য বাহ্য বায়ুর সঙ্গে যোগ রক্ষা না করিয়া মানসিক জপ করিতে পারে না, কারণ যদি তাহা পারিত তাহা হইলে শ্বাসের গতিতে বৈলক্ষণ্য উৎপন্ন হইত। এইজন্য বুঝিতে হইবে প্রথমাবস্থায় যে কোন প্রকার জপ করা হউক্ না কেন তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ বাহ্য বায়ুর প্রভাব না থাকিয়া পারে না।

বৈখরী জপ মাতৃকা অথবা বর্ণমালার দ্বারা সম্পন্ন হয়। বর্ণমালা বায়ুর সংহতি হইতে উৎপন্ন হয়; সুতরাং মনে মনে বর্ণাত্মক শব্দ চিন্তা করিলেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে বাহ্য বায়ুর ক্রিয়া না হইয়া পারে না। বাহ্য বায়ুর ক্রিয়া হইতে গেলেই কণ্ঠাদি উচ্চারণ স্থানে আঘাত অবশ্যম্ভাবী।

জপ করিতে করিতে যখন জাপকের আপেক্ষিক উৎকর্ষ সম্পাদিত হয় তখন স্বভাবতঃই কণ্ঠরোধ হইয়া যায়। ইচ্ছা করিয়া অথবা চেষ্টা করিয়া কণ্ঠরোধ করিতে হয় না।

বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া প্রবাহশীল নাদরূপে পরিণত হয় এবং নাদ বায়ুর সংঘর্ষ-বশতঃ বর্ণমালা রূপে প্রকাশিত হয়। অতএব বর্ণমালাকে আশ্রয় করিয়া যে

কোনপ্রকার জপ অথবা শব্দের আবৃত্তি করা হউক্ না কেন তাহাতে বাহ্য বায়ুর স্পর্শ থাকিবেই এবং বাহ্য বায়ুর স্পর্শনিবন্ধন অন্তর্মুখ গতিতে অবশ্য বাধা পড়িবে।

এইজন্য অন্তর্মুখ গতি প্রাপ্ত হইতে হইলে ক্রমশঃ বাহ্য বায়ু হইতে আভ্যন্তরীণ বায়ুতে প্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক এবং সর্বাগ্রে বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া আকাশমণ্ডলে প্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক। আকাশের নানা স্তর আছে। বায়ুরও নানা স্তর আছে। আকাশের সর্বোচ্চ স্তর ভেদ করিতে পারিলেই বিশুদ্ধ চৈতন্য-রাজ্যে প্রবেশের অধিকার জন্মে।

গুরুদত্ত শক্তি সহায় থাকিলে এবং সাধক উদ্যমশীল হইলে অন্তর্মুখ গতি স্বভাবতঃই ঘটিয়া থাকে। কালের রাজ্যে পরিণতি স্বাভাবিক। বালককে যেমন যুবক হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হয় না এবং যুবককেও বৃদ্ধত্বলাভের জন্য চেষ্টা করিতে হয় না, তদ্রূপ বৈখরী হইতে পরা পর্যন্ত গতিলাভের জন্য যোগীর পক্ষে পৃথক্ চেষ্টা অনাবশ্যক। বৈখরী হইতে মধ্যমাতে সঞ্চার স্বভাবতঃই ঘটিয়া থাকে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। পুনঃ পুনঃ বৈখরীর অভ্যাস করিতে করিতে কণ্ঠদ্বার রুদ্ধ হইয়া যায় এবং হৃদয়দ্বার খুলিয়া যায়। গুরুশক্তি-সংযুক্ত জপের প্রভাবে বৈখরী অভ্যাস করিতে করিতে বৈখরী সমাপ্ত হয় এবং মধ্যমাতে প্রবেশ হয়।

যতক্ষণ সাধক বৈখরী ভূমিতে নিবিষ্ট থাকে ততক্ষণ সে বিকল্প ভূমিতে বর্তমান থাকে। বৈখরী ভূমি ইন্দ্রিয়রাজ্যের ব্যাপার। তাহার সঙ্গে মনের ক্রিয়া না থাকিয়া পারে না, তবে বৈখরী ভূমিতে বাহ্য প্রমেয়ের প্রাধান্য থাকে। কিন্তু যখন বৈখরী হইতে মধ্যমাতে সঞ্চার হয় তখন বাহ্য প্রমেয় থাকে না, ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও থাকে না। কিন্তু বিকল্পাত্মক মনের ক্রিয়া থাকে। বৈখরী অবস্থাতে দেহাত্মবোধ স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয় এবং সাধকের কর্তৃত্ব অভিমান জাগিয়া থাকে। মধ্যমাতে ঐ অভিমান অনেকটা ক্ষীণ হইয়া যায়। কিন্তু বিকল্পের উদয় তখনও থাকিয়া যায়। বৈখরীতে জপ করিতে করিতে আপনা আপনি মধ্যমাতে প্রবেশ হয়। সাধারণতঃ জপের মাত্রা দ্রুত অথবা বিলম্বিত না হইয়া মধ্যম অবস্থাতে থাকা উচিত। এইভাবে নিয়ম রক্ষা করিয়া জপ করিতে পারিলে জপ হইতে ধ্যানের অবস্থা আপনি উপস্থিত হয়। কিন্তু এই ধ্যান স্থায়ী হয় না। তখন ধ্যান হইতে জপে ফিরিয়া আসিতে হয়।

এইভাবে পুনঃ পুনঃ জপ ও ধ্যানের আবর্তন হইতে ধ্যান অবস্থাটা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হইয়া যায়। যোগীর দৃষ্টিতে জপক্রিয়া যোগের অঙ্গ এবং ধ্যান, সমাধিও যোগের অঙ্গ। উভয়েরই অনুশীলন আবশ্যক। এদিকে ধ্যানের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যমার ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যায়। তখন বৈখরী বাক্ নিরুদ্ধ, দেহাত্মবোধ অতি ক্ষীণ এবং বহির্মুখভাব নিরুদ্ধ হইয়া অন্তর্মুখভাবের সূচনা হইয়াছে। এই অবস্থায় নাদের প্রসার আরম্ভ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ণাত্মক মাতৃকা বিলীন হইয়া ধ্বনিরূপে পরিণত হয়। এই অবস্থায় কণ্ঠ নিষ্ক্রিয় থাকে ও হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া যায়। বায়ুর ক্রিয়া তখনও থাকে, কিন্তু ভিতরে। বাহ্য বায়ুর ক্রিয়া থাকে না। এই অবস্থায় নিরন্তর অনাদি অনন্ত নাদধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এই নাদধ্বনি অতি বিশাল। ইহাতে বর্ণাত্মক মাতৃকা-সকল লীন হইয়া যায়। জলের তরঙ্গ লীন হইয়া গেলে যেমন জলমাত্রই অবশিষ্ট থাকে, তরঙ্গ থাকে না, তেমনি বর্ণাত্মক তরঙ্গ নিবৃত্ত হইলে ধ্যানাত্মক শব্দ আপন প্রভাব নিয়া নাদরূপে প্রকাশিত হয়। প্রথমতঃ এই নাদে বর্ণাত্মক নাম অথবা মন্ত্রের তরঙ্গটা থাকে, কিন্তু সাধকের কর্তৃত্বাভিমান বিগলিত হওয়াতে উহা নাদ মধ্যে আপনিই উচ্চারিত হয়, উহাকে উচ্চারণ করিতে হয় না। ইহাই একপ্রকার ব্রহ্মনির্ঘোষ। এই নাদধ্বনি বস্তুতঃ বর্ণাত্মক না হইলেও প্রথমতঃ ইহা বর্ণাত্মক শব্দের মত শুনিতে পাওয়া যায়। যেমন "বউ কথা ক'ও" পাখীর ডাক, উহা বর্ণাত্মক না হইলেও বর্ণাত্মকরূপে বুঝিতে হয়। উহা বস্তুতঃ ধ্বনিমাত্র, উহাতে বর্ণ-সংঘাত কিছুই নাই। তথাপি সংস্কারবশতঃ ঐরূপ প্রতীতি হয়। সাধক এই সময়ে শ্রোতা হইয়া নিজের অভ্যন্তর হইতে উচ্চারিত নিজ মন্ত্র অথবা নামের ধ্বন্যাত্মক রূপ মনোযোগ সহকারে শুনিতে থাকে। বস্তুতঃ উপনিষদে যে শ্রবণ-মননের কথা আছে ইহাই সে শ্রবণ।

নিরন্তর হৃদয়-উত্থিত নাদধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে ঐ ধ্বনি হইতে বর্ণের আভাস কাটিয়া যায়। তখন নিরাভাস নাদধ্বনি উঠিতে থাকে। এইরূপে দীর্ঘকাল অতীত হইলে ক্রমশঃ অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় এবং চিদাকাশ নির্মল হইয়া প্রকাশ পায়। সাধারণ প্রত্যেক মানুষই চক্ষু মুদ্রিত করিলে যে অন্ধকার দেখিতে পায় উহাই বস্তুতঃ হৃদয়ের অন্ধকার। মধ্যমা বাকের ক্রমিক অভ্যাস দ্বারা ঐ অন্ধকার অপগত হয় এবং চিদাকাশ নির্মল হইয়া দৃষ্টিগোচর হয়, সঙ্গে সঙ্গে নাদধ্বনি ক্ষীণ হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থার উদয় হইলে বুঝিতে হইবে

মধ্যমা বৃত্তির অবসান সন্নিহিত। এইটি চিত্তশুদ্ধির অবস্থা। চিত্ত অত্যন্ত শুদ্ধ হইলে তাহাতে একদিকে যেমন অন্ধকার থাকে না, অপরদিকে তেমনি ধ্বন্যাত্মক শব্দও প্রায় নিবৃত্ত হইয়া যায়। ইহা "আধ্যাত্মিক ঊষা" রূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য। এই অবস্থায় মন ক্রমশঃ নিবৃত্ত হইয়া চিদাকাশের দিকে উন্মুখ হইয়া পড়ে। তখন প্রকাশের উদয় হয় নাই, অথচ অন্ধকারও নিবৃত্ত হইয়াছে, এই অবস্থা। সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং রাত্রি অপগমের পর যে অবস্থার উদয় হয়, ইহা তাহারই অনুরূপ। যে শব্দ এতক্ষণ শ্রুতিগোচর হইতেছিল—অবশ্য আভ্যন্তরীণ—এখন তাহা আর শ্রুত হয় না। এই অবস্থায় চিদাকাশমধ্যে একটি জ্যোতির্মণ্ডল প্রকাশিত হয় এবং সাধক অথবা যোগীর দৃষ্টি ঐ মণ্ডলে আকৃষ্ট হয়। তখন দেহের স্মৃতি থাকে না এবং মনের ক্রিয়া অস্তমিতপ্রায়। এই অবস্থায় আত্মাসমন্বী চিৎশক্তিরই ক্রিয়া হইয়া থাকে। সাধকের নিষ্ঠা নিরাকার ও নির্গুণ সত্তার উপরে থাকিলে ঐ জ্যোতির্মণ্ডলটি ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয়া সত্তার সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে। তারপর জ্যোতিঃ ভেদ হইয়া পরাবাকে প্রবেশ লাভ হয়। কিন্তু সাধক সাকারের উপাসক হইলে ঐ জ্যোতির্মণ্ডল মধ্যে ইষ্ট-দেবতার মূর্তি প্রকাশিত হয় এবং ক্রমশঃ ঐ ইষ্ট-সত্তা নিজ সত্তার সহিত অথবা নিজ ইষ্ট-সত্তার সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। নিরাকার উপাসকের পক্ষে জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে নিজ স্বরূপও পরিদৃষ্ট হইতে পারে। এইসকল বৈচিত্র্য সাধকের ভাবসাপেক্ষ। যে কোন রূপের প্রকাশ হউক না কেন তাহা জ্যোতির মধ্যেই প্রকাশিত হয় এবং ধীরে ধীরে জ্যোতিঃ অপগত হয় এবং শুধু রূপটিই স্বয়ং প্রকাশরূপে বিদ্যমান থাকে, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ তখন থাকে না। যেরূপেই প্রকাশ হউক্ না কেন উহা আত্মারই স্বরূপ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং এই সাক্ষাৎকার অভিন্নতার সূচক। এইটি পশ্যন্তী বাকের অবস্থা, মন্ত্রসিদ্ধি অথবা ইষ্ট-সাক্ষাৎকার ইহারই নামান্তর। প্রাচীন যুগে কোন যোগী অথবা সাধক এই অবস্থায় উপনীত হইলে তাহাকে "ঋষি" বলিয়া গণ্য করা হইত। এই অবস্থায় মন থাকে না, ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও থাকে না, বিশ্বজগতের ভানও থাকে না, থাকে শুধু চৈতন্যময় স্বরূপের সত্তা। ইহা যে রূপেই প্রকাশিত হউক্ না কেন তাহা যে নিজের স্বরূপ তাহা তখন বুঝা যায়। কিন্তু ইহা খণ্ড অবস্থা। ইহারও পূর্ণ পরিণতি আছে। তখন খণ্ড সত্তা অখণ্ড সত্তাতে আত্মপ্রকাশ করে। এইটি উন্মনী অবস্থা এবং আত্মার

নিষ্কল সাক্ষাৎকার, ইহাকেই সিদ্ধগণ পরাবাক্ বলিয়া গণনা করেন। ইহা পরাশক্তিরই স্বরূপের অন্তর্গত। মন্ত্র-সাধনা অথবা জ্ঞান-সাধনার ইহাই চরম লক্ষ্য।

জপ-ক্রিয়ার প্রভাবে এই চরম স্থিতি উপনীত হয়। তখন বক্রগতি ত আসেই না, সরল গতিও স্থিতি-বিন্দুর মধ্যে একাকার হইয়া যায়। শিব-শক্তি-সামরস্য তখন আপনি সংঘটিত হয়, আগমবিদ্‌গণ ইহাকেই আত্মার পূর্ণ বিকাশ বলিয়া বর্ণনা করেন। ইহারও পরাবস্থা আছে। পরাবস্থারও পরাবস্থা আছে। বিশুদ্ধ চৈতন্যের পূর্ণ বিকাশ হইলেই সেই অবস্থায় স্থিতিলাভ হয়। জপের পূর্ণ পরিণতির ফলে এই আত্মবিকাশ অবস্থা প্রকট হইয়া থাকে। জপ-ক্রিয়ার পূর্ণ পরিণতি এইখানেই জানিতে হইবে। ইহা ক্রিয়াযোগ নহে, কিন্তু ক্রিয়াযোগের পরিণতিরূপ ফল।

আত্মার পূর্ণ জাগরণ ও তাহার পরিণতি

১

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতাতে বলা হইয়াছে যে এই জগতে সকল আত্মা প্রকৃত জাগ্রৎ অবস্থায় নাই। তাহারা মায়িক জগতে অজ্ঞানের আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া মোহনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছে। তাহারা যতদিন পর্যন্ত ঐ মোহনিদ্রা হইতে উত্থিত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত মায়াতীত চিন্ময় সত্তা অনুভব করিতে পারিবে না—চিন্ময় দিব্য জগতে সঞ্চরণ করা ত দূরের কথা। ঠিক সেইপ্রকার এই জগতে এমনও মহাপুরুষরূপী আত্মা আছেন যাঁহারা সংযমী বলিয়া এই মোহময় জগৎকে দেখিতে পান না। তাঁহাদের দৃষ্টি নিরন্তর চিদ্ভূমিতে পতিত রহিয়াছে। তাঁহারা চিদ্ আকাশ এবং তদ্ উর্দ্ধবর্তী চিন্ময়রাজ্য নিরন্তর দর্শন করিয়া থাকেন।

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

এই শ্লোকটিতে সংযমী অথবা প্রবুদ্ধ এবং মূঢ় অথবা নিদ্রিত আত্মা সকলের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে জগতের অধিকাংশ জীবই ঘুমাইয়া রহিয়াছে। আমাদের প্রচলিত জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ঘুমেরই প্রকারভেদ মাত্র। অর্থাৎ আমরা ব্যবহার ভূমিতে যেটিকে জাগ্রৎ অবস্থা বলিয়া মনে করি তাহাও প্রকৃত জাগ্রৎ নহে। তাহা বিজ্ঞান দৃষ্টিতে নিদ্রারই অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে মনুষ্যমাত্রেরই জীবনের লক্ষ্য এই মোহনিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠা এবং পূর্ণভাবে জাগ্রৎ হইয়া উর্দ্ধমুখে ক্রমবিকাশের ফলে জীবভাব হইতে শিবভাবে উন্নীত হওয়া এবং আত্মার পূর্ণত্ব লাভ করা। আচার্য শঙ্কর তাঁহার দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রে স্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, এই মোহনিদ্রা হইতে যিনি জীবকে জাগাইয়া দেন, তিনিই প্রকৃত সদ্গুরু। জীব যখন পূর্ণভাবে জাগিয়া উঠে তখন সর্বপ্রথমেই অনুভব করে যে এই জগৎ তাহার বাহিরে নহে, কিন্তু তাহার অন্তরে

রহিয়াছে। স্বচ্ছ দর্পণে যেমন বিরাট্ নগর প্রতিবিম্বিত হয় এবং ঐ প্রতিবিম্বিত নগর যেমন দর্পণেরই অন্তর্গত, দর্পণ হইতে বহির্ভূক্ত নহে, ঠিক সেইপ্রকার সমগ্র বিশ্বই আত্মারূপ স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বিত বুঝিতে হয়। বস্তুতঃ এই বিশ্ব দ্রষ্টা আত্মারই নিজের অন্তর্গত এবং তাহার বহিঃস্থিত নহে। মায়াবশতঃ যাহা অন্তরের বস্তু তাহাকে অন্তরে না দেখিয়া বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায়। সদ্‌গুরু যখন শুদ্ধবিদ্যা সঞ্চার করিয়া জীবকে মোহনিদ্রা হইতে জাগাইয়া তোলেন তখন জীব নিজের আত্মস্বরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া সমগ্র বিশ্বকে নিজের অন্তর্গত বলিয়া প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে, এই তথাকথিত বাহ্যজগৎ হইতে আন্তর জগতে প্রবেশ করাই সাধনার উদ্দেশ্য এবং গুরু-কৃপারও তাহাই একমাত্র লক্ষ্য।

এই যে আন্তর জগতে প্রবেশের কথা বলা হইল, ইহার মধ্যে ক্রম রহিয়াছে। প্রথমতঃ অজ্ঞান জগৎ হইতে জ্ঞান জগতে প্রবিষ্ট হইতে হয়। তাহার পর পরাসংবিতে নিত্যধামের প্রাপ্তি ঘটে। অজ্ঞানের জগতে অবস্থানকালে অনুভব হয় যে এই জগৎটি ভেদজ্ঞান দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু যখন গুরু-কৃপাতে জ্ঞানের উদয় হয় তখন বুঝিতে পারা যায় যে বাস্তবিক পক্ষে জ্ঞেয় বস্তু বাহিরে কিছু নাই। জ্ঞেয় বস্তু বাহিরে আছে, এই জ্ঞান ভ্রম। এই মার্গে প্রবিষ্ট হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে জ্ঞেয় পদার্থ বস্তুতঃ সাকার জ্ঞানই—ইহাই বাহ্যরূপে অথবা স্থূলরূপে কল্পিত হইয়াছে। যাহাকে আমরা মায়া বলিয়া বর্ণনা করি তাহা ক্রিয়াশক্তিরই নামান্তর। ইহারই প্রভাবে সাকার জ্ঞান বাহ্য পদার্থরূপে প্রতীয়মান হয়। জ্ঞানরাজ্যে জ্ঞানই এক প্রান্তে সাকার জ্ঞান বা জ্ঞেয়রূপে ভাসমান হয় এবং অন্য প্রান্তে ঐ জ্ঞানই জ্ঞাতারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। জ্ঞানরাজ্য অতিক্রম করিতে হইলে জ্ঞানের এই জ্ঞেয়ভাব ও জ্ঞাতৃভাব দূর করা আবশ্যক। ইহা করিতে পারিলে জ্ঞান বিশুদ্ধ হয়।

এই বিশুদ্ধ জ্ঞান অবলম্বন করিয়া জ্ঞানরাজ্য হইতে সংবিদ্‌রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। মায়া বা অজ্ঞানরাজ্যে ভেদজ্ঞান প্রবল। জ্ঞানরাজ্যে ভেদাভেদ জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। কিন্তু সংবিদ্‌রাজ্যে ভেদের লেশমাত্রও নাই। ইহা অভেদ জ্ঞানের অদ্বৈতভূমি। ইহা তুরীয়রাজ্যরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য। ইহার পর অখণ্ড প্রকাশ, যাহাকে তুরীয়াতীত বলিয়াও উল্লেখ করা চলে না।

মনুষ্য জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য রূপান্তরলাভ করা—এই ব্যাপারটি গুপ্তরূপে

সম্পাদিত হইয়া থাকে। এইজন্য গুপ্তপথে প্রবেশ করিতে হয়। গুপ্তধামের ব্যাপার বস্তুতঃই রহস্য।

এই যে রূপান্তরের কথা বলিলাম, ইহারই নাম জাগরণ। পূর্ণ জাগরণই পূর্ণ রূপান্তর অথবা অখণ্ড মহাপ্রকাশরূপে বিশ্রাম। মায়ারাজ্যে আত্মা ভেদজ্ঞান হইতে মুক্ত হইতে পারে না, কারণ এখানকার বিদ্যা অশুদ্ধ বিদ্যা—ইহা মায়ার কঞ্চুক। ইহার পর কলার নিয়ন্ত্রণও আছে এবং অন্যান্য কঞ্চুকের আবরণও রহিয়াছে। অন্তর্জগতে প্রবেশের প্রথম উপায় শুদ্ধবিদ্যার উন্মেষ। ইহার ফলে পশুত্বনিবৃত্ত হয়। পশুভাবে অবস্থিত পুরুষ সংবিৎ মার্গে প্রবেশের অধিকার প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ শুদ্ধবিদ্যা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মহাশক্তি মার্গে প্রবেশ অসম্ভব।

২

আত্মার বিভিন্ন প্রকার অবস্থা বুঝিতে হইলে প্রতীতির ভেদ বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। প্রতীতি অনুসারেই কোন প্রমাতা আত্মাকে অপ্রবুদ্ধ অথবা নিদ্রিত বলা হইয়া থাকে এবং অন্য কোন প্রমাতাকে অপ্রবুদ্ধ না বলিয়া প্রবুদ্ধকল্প বলা হয়।

এই বিশ্ব-ভুবন (যাহা মহামায়া ও মায়ার অন্তর্গত) অনাশ্রিত শিব হইতে কালাগ্নি রুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের উর্দ্ধ শিখরে অনাশ্রিত শিব বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং সকলের নীচে কালাগ্নি রুদ্র খেলা করিতেছেন। এই বিশ্ব প্রকাশাত্মক বলিয়া যদিও ইহা প্রকাশের ভিত্তিতে লগ্ন রহিয়াছে তথাপি "ভবী" আত্মা অর্থাৎ অপ্রবুদ্ধ আত্মা মনে করে যে সব কিছু তাহার বাহিরে। "ভব" বলিতে এখানে ভেদজ্ঞান বুঝিতে হইবে। ভেদজ্ঞান সম্পন্ন সিদ্ধ আত্মাও "ভবী" নামে অভিহিত হয়। ইহারা মায়া দ্বারা অভিভূত থাকে বলিয়া অভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন জ্ঞান আশ্রয় করিয়া থাকে।

ভবিগণের উর্দ্ধে আর একপ্রকার আত্মা আছে—ইহাদের ভেদজ্ঞান নাই। কিন্তু ভেদজ্ঞান না থাকিলেও তাহার সংস্কার আছে। ইহাদিগকে "ভবপদী" বলিয়া কেহ কেহ নির্দেশ করিয়া থাকেন। এইসকল আত্মা শুদ্ধবিদ্যা পদে অনুপ্রবিষ্ট এবং কেহ কেহ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির স্তরে বিদ্যমান থাকে। এইসকল আত্মা শুদ্ধবিদ্যার প্রভাবে আন্তরিক সংস্কারাদি ভিন্নবৎ অনুভব করিয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে দুইটি শ্রেণী রহিয়াছে। কেহ কেহ বাহ্যজ্ঞান শূন্য এবং কাহারও কাহারও বাহ্যজ্ঞান থাকে। যাহাদের বাহ্যজ্ঞান থাকে তাহদিগকে পরাসংবিৎ তত্ত্বের উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে। ইহারা পশু হইলেও যোগ্য পশু, কারণ ইহারা অধিকারী। এইসকল চিদ্-অণু মনে করে যে গ্রাহক ও গ্রাহ্যরূপে বিশ্বের দুইটি বিভাগ আছে। যে অংশ গ্রাহক তাহা অজড় ও চিন্ময় এবং যে অংশ গ্রাহ্য তাহা জড় ও অচিৎ। এই জাতীয় পশু মায়া দ্বারা মোহিত হয় না, কারণ এই যে গ্রাহ্য বস্তুকে জড ও নিজ হইতে ভিন্ন মনে করা, ইহাই মায়া। এইসকল পশু নিজের স্বরূপকে চিনিতে পারে না। ইহারাও পূর্ববর্ণিত "ভবী" আত্মার অন্তর্গত।

দুইপ্রকার প্রমাতার কথা বলা হইল। ইহাদের মধ্যে কেহই প্রবুদ্ধ নহে। ইহার পর প্রবুদ্ধ নামক তৃতীয়প্রকার প্রমাতা আলোচনার বিষয়। এইসকল আত্মাকে "দ্বিপদী" বলা চলে, কারণ একদিকে যেমন ইহাদের ভব সংস্কার আছে তেমনি অন্যদিকে ইহাদের উদ্ভব সংস্কারও আছে। এইসকল প্রমাতা ভেদাভেদ দশাতে অবস্থিত। ইহারা একদিকে যেমন জড়-ভাবাত্মক ইদন্তা আশ্রয় করে, অন্যদিকে তেমনি চিদ্ভাবাত্মক অহন্তা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ইহাদের অনুভূতি "ইহা ও আমি" এই উভয়ের সামানাধিকরণ্য। অর্থাৎ ইহারা অহংভাব আরোপণ করিয়া অনুভবের ভেদাংশ ডুবাইয়া 'ইদং-অহং'রূপে বোধ প্রাপ্ত হয়। ইহারা নিজের শরীরসদৃশ বিশ্বকে দেখিয়া থাকে, যাহাতে ভেদ থাকে, অভেদও থাকে। যোগিগণ এইটিকে ঈশ্বরের অবস্থা বলিয়া থাকেন। এই হইল প্রবুদ্ধ আত্মার বিবরণ।

প্রবুদ্ধ অবস্থা হইতে সুপ্রবুদ্ধ অবস্থা পর্যন্ত আত্মার উন্নতি আবশ্যক। কিন্তু প্রবুদ্ধ দশা হইতে সুপ্রবুদ্ধ দশাতে যাইতে হইলে একটি মধ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এবং তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রগতি লাভ করিতে হয়। অভেদ জ্ঞান অথবা কৈবল্য "উদ্ভব" নামে পরিচিত। যাঁহারা এই অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন তাঁহাদের নিকট ইদংরূপী প্রকৃতির বিষয়ীভূত জ্ঞেয় পদার্থ অহংরূপী আন্তরিক পদে নিমগ্ন হইয়া থাকে। এই নিমগ্ন ভাবের প্রকৃতিকে "নিমেষ" বলা হয়। বিমর্শশক্তি দ্বারা ইহা ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থাটি সদাশিবের স্থিতির অনুরূপ— ইহাতে অহংভাবের দ্বারা আচ্ছাদিত অস্ফুট ইদং ভাব বিদ্যমান থাকে। এই অবস্থাটি স্থায়ী নহে। যখন ইহা আবির্ভূত হয় তখন নিজের স্বরূপভূত প্রকাশে একবার মগ্ন এবং তাহার পর উন্মগ্ন, এই দুইটি রূপেরই অনুভব হইয়া থাকে।

মগ্ন রূপটিকে বলা হয় নিমেষ এবং উন্মগ্ন রূপটিকে বলা হয় উন্মেষ। যেমন সমুদ্রে কখন তরঙ্গাদি উত্থিত হয় আবার কখন উহারা লীন হইয়া যায়, কিন্তু উভয় অবস্থাতে সমুদ্র সমুদ্রই থাকে, ঠিক সেইপ্রকার শিবাদি বিশ্ব প্রকাশাত্মকরূপেই প্রকাশরূপে উন্মীলিত হয়, আবার প্রকাশের মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। এই অবস্থাটি প্রবুদ্ধ ও সুপ্রবুদ্ধ এই উভয় অবস্থার অন্তরালবর্তী। ইহাকে সমনা অবস্থা বলা হইয়া থাকে।

উন্মনা দ্বারা যখন স্বরূপে অবস্থিতি হয় তখন ঐ স্থিতিকেই উন্মনা নামে নির্দেশ করা হয়। যখন উন্মনা দ্বারা পূর্ণত্ব-সিদ্ধি অবিচলিত হয়, তখন যোগী সিদ্ধ ও সুপ্রবুদ্ধ অবস্থা লাভ করে। এই অবস্থায় স্থিত হইলে মনের কোন ক্রিয়া থাকে না অর্থাৎ মনের চাঞ্চল্য ইহাকে কদাপি স্পর্শ করে না।

যোগী যখন সুপ্রবুদ্ধ অবস্থা লাভ করেন তখন তাঁহার ইচ্ছামাত্র অভীষ্ট বিভূতির আবির্ভাব হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহাকেই ইচ্ছাশক্তি বলা হইয়া থাকে।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে যোগী ইচ্ছা করিলেই উহা ইচ্ছাশক্তি রূপ ধারণ করে না। কারণ, মনকে অতিক্রম না করিতে পারিলে আত্মার জাগরণ পূর্ণ হয় না এবং আত্মা পূর্ণভাবে জাগিয়া না উঠিলে অর্থাৎ মন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত না হইলে তাহার ইচ্ছা ইচ্ছাশক্তি রূপ ধারণ করে না।

এই যে সিদ্ধির কথা বলা হইল ইহা নানাপ্রকার এবং ইহার আবির্ভাবও বিভিন্ন উপায়ে হইয়া থাকে। এই সকল সিদ্ধিকে অপরসিদ্ধি ও পরসিদ্ধি এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা সম্ভবপর। অপরসিদ্ধি নিম্নস্তরের সিদ্ধি এবং পরসিদ্ধি উর্দ্ধস্তরের সিদ্ধি।

আদ্য সিদ্ধি গুরুলাভের নামান্তর এবং দ্বিতীয় সিদ্ধি শিবত্বের স্বরূপ। এই দুইটিকে মহাসিদ্ধি বলা যাইতে পারে। সূর্য প্রভৃতি যে কোন বস্তুকে আত্মারূপে দৃঢ় ভাবনা করিতে পারিলে উহার জগৎ-প্রকাশনাদি কর্ম যাহা নিত্যসিদ্ধ তাহা চিনিতে পারা যায়। ইহাই প্রত্যভিজ্ঞা (recognition)। যখন এই প্রত্যভিজ্ঞা অত্যন্ত দৃঢ় হয় তখন ইহা অর্থকারিরূপে প্রতীত হয় অর্থাৎ ইহা কার্যে পরিণত হয়। তখন যোগী সূর্যাদি রূপ না হইয়াও স্বয়ং সূর্যাদি বস্তুর রূপ ধারণ করে। বিমর্শ অথবা জ্ঞান দুর্বল হইলে ভিন্নরূপে স্থিতি হয়। কিন্তু ঐ বিমর্শজ্ঞান প্রবল হইলে ভেদ ও ভ্রমের সংস্কার থাকে না। যোগী তখন স্বয়ং বিশ্বাত্মক হইয়া যায়

বলিয়া যাবতীয় সিদ্ধি নিত্যসিদ্ধিরূপে প্রকাশ পায় এবং ইহা দৃঢ় হইলে কেবল ভাবমাত্র থাকে না কিন্তু আপন আপন কার্যসাধনে সামর্থ্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যোগীকে সর্ব অবস্থাতেই নিজের পরিপূর্ণ প্রকাশাত্মক যে বিশ্বরূপী স্বরূপ তাহা হইতে অবিচলিত থাকা আবশ্যক।

যে দেবতা যে কার্যসাধন করে সেই কার্যসাধন যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে সেই দেবতার অহংকার ধারণ করিতে পারিলে ক্ষণমাত্রে সেই কার্যসাধন সম্ভবপর হয়।

পৃথিবীর লক্ষণ ধারণ, জলের লক্ষণ সংগ্রহ, তেজের লক্ষণ পাক, বায়ুর লক্ষণ ব্যূহ এবং আকাশের লক্ষণ অপ্রতিঘাত। যোগী পৃথিব্যাদি যে ভূতকে আত্মরূপে অনুসন্ধান করে সেই ভূতের কর্মসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। ঠিক এইপ্রকার তন্মাত্রা, কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, অস্মিতা, বুদ্ধি, অব্যক্ত ও পুরুষ—ইহাতে স্বতিশক্তি ধারণ করিতে পারিলে অনুরূপ কর্মসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এইপ্রকার রাগ, নিয়তি, কাল, বিদ্যা, কলা ও মায়াতে চিৎশক্তি ধারণা সম্ভবপর। পক্ষান্তরে শুদ্ধবিদ্যা বা সরস্বতী, ঈশ্বর, সদাশিব, শক্তি ও শিব, ইহাদের উপরও চিৎশক্তি ধারণা সম্ভবপর। ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই তদনুরূপ সিদ্ধি আবির্ভূত হয়।

আচার্যগণ বলেন যে শুকদেব, বামদেব, কৃষ্ণ, দধীচি, বৈন্য, ইহাদিগের যে বিশ্বাত্মক ভাব পুরাণ ও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে, তাহা পূর্বোক্ত উপায়ে আবির্ভূত হয়। ইহার পর মহাসিদ্ধির কথা মনে রাখিতে হইবে। মহাশক্তির বা পরাশক্তির বিষয় স্মরণ করা আবশ্যক। এই শক্তি কোটী কোটী কালাগ্নির দীপ্তি লইয়া ষড়ধ্বাকে দগ্ধ করিতেছেন। নিরন্তর ইহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। যখন তৃপ্তি অথবা আপ্লাবন রূপ সিদ্ধির উদয় হয় তখন অমৃতের লহরী বৃষ্টির ন্যায় সমস্ত অধ্বাকে প্লাবিত করে। এই অনবচ্ছিন্ন সুধা-সমুদ্রের কথাও স্মরণ করা আবশ্যক। এই দাহ ও প্লাবনের দ্বারা "সকলীকরণ" রূপ ক্রিয়ার সিদ্ধি হয়। যতটা অধ্বা পূর্বোক্ত প্রণালীতে শোধিত হয় নিঃশেষে ততটা জগৎ অনুগ্রহের ভাজন হইয়া থাকে। এই যে শুদ্ধির কথা বলা হইল ইহা দেহাত্মকরূপে সংক্ষিপ্ত ষড়ধ্বার শুদ্ধি নহে, কিন্তু সমগ্র বিশ্বের শুদ্ধি। সকল আচার্যই বিশ্বশরীর। কোন নির্দিষ্ট দেহে দেহীরূপে যে অভিমান তাহা আচার্যত্ব নহে। সেইজন্য বিশ্বকে নিজের শরীর রূপে পরিণত করিয়া বিশ্বের সাধন করা আবশ্যক। অতএব প্রকাশের সঙ্গে এই দেহের অভেদ দর্শনকারী

যে স্বরূপ অবস্থিতি তাহাই যাবতীয় অধ্বার দাহ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহা অপর কিছু নহে, বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপী প্রকাশের সঙ্গে তাদাত্ম্য। পূর্বে যে আপ্লাবনের কথা বলা হইয়াছে তাহা এই বিমর্শের নামান্তর। এইজন্যই শাস্ত্রে আছে "প্রকাশস্য বিমর্শঘনতাপ্রত্যভিজ্ঞান দার্ঢ্যাৎ" পরমানন্দ আবির্ভাব। এই ব্যাপারটিকে প্রাচীন শাক্তগণ "সকলীকরণ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা পরম আনন্দের আবির্ভাবের নামান্তর। বাস্তবিক পক্ষে প্রকাশরূপী চৈতন্য যখন বিমর্শ-শক্তির প্রভাবে ঘনীভূত হয় তখন দৃঢ় প্রত্যভিজ্ঞার উদয়বশতঃ এই আনন্দ প্রকট হইয়া থাকে। ইহারই নাম আজ্ঞা সিদ্ধি। ইহা গুরুপ্রাপ্তির নামান্তর।

মনে রাখিতে হইবে এই অবস্থাতেও পূর্ণ খ্যাতির উদয় হয় না। তাই ইহাও অপূর্ণ খ্যাতির অন্তর্গত। অপূর্ণ খ্যাতি স্থায়ী হয় না। কিন্তু যখন স্থায়িত্বের উদয় হয় তখন ইহাকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া অপূর্ণ খ্যাতিকে ক্ষয় করিতে হয়। প্রতিক্ষণে অনুসন্ধানকে দৃঢ় করিয়া এই ক্ষয়ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। যোগী এইরূপে পূর্ণ খ্যাতি উন্মীলন করিতে করিতে ইচ্ছা অনুসারে ভুবনসকল সৃষ্টি করিতে থাকেন এবং রক্ষা প্রভৃতি সকল কৃত্যই সম্পাদন করেন, অর্থাৎ যোগী তখন পঞ্চকৃত্য করিতে সমর্থ হন।

পূর্ণত্ব লাভ ও নিত্যলীলা আলোচনা করিতে হইলে তিনটি দিক হইতে বিচার করা আবশ্যক। একদিকে মহাপ্রকাশ যিনি আপনাতে আপনি থাকিয়া পঞ্চকৃত্যময়রূপে সর্বদা নিত্যলীলা পরায়ণ। অন্যদিকে চিদাকাশ রহিয়াছে, সেখানে আত্মা চিতি শক্তি দ্বারা অভিনয় করেন। অপরদিকে প্রেক্ষকরূপে ইন্দ্রিয় সকল বিরাজ করেন। এই স্থানে আমরা কর্তা, দ্রষ্টা ও নাট্য-গৃহের সন্ধান পাইলাম। এই লীলার মূল হ্লাদিনী শক্তি। রসাস্বাদন করেন ইনি এবং করানও ইনি।

৩

গুহ্যরাজ্যে জাগরণের ক্রম নানা দিকে নানা প্রস্থানে দেখান হইয়াছে। এইখানে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

পূর্ণ জাগরণের ফলই পূর্ণত্বলাভ। যাহাকে অদ্বৈত শৈবগণ পরমশিব বলিয়া বর্ণনা করেন ইহা সেই অবস্থারই নামান্তর। ইহাই পরাসংবিৎ, ইহা একই সময়ে বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বাত্মক। স্বরূপ সর্বদাই নিত্য প্রাপ্ত, শক্তিও

তাহাই। যে দিকে বিশ্বের ভান নাই সেই দিকটাতে শক্তির এক কলা ব্যতীত পূর্ণ সংকোচ অবস্থা রহিয়াছে। এক কলা শক্তি বিশ্বাতীত অবস্থাতেও থাকে, না থাকিলে বিশ্বাতীত অক্ষরস্বরূপ জগতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেন না। কিন্তু এই কলা থাকা সত্ত্বেও আত্মাকে নিষ্কল বলা হয়। উহা না থাকিলে শিবের শিবত্ব থাকিতে পারে না। এই এক কলাই অমাকলার নামান্তর। ইহাকে ঋষিগণ অমৃত কলা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাকী পনর কলার সংকোচ ও প্রসার হইয়া থাকে। বিশ্বাত্মক অবস্থাতে প্রসার বা বিকাশ ঘটিয়া থাকে।

ইহার বিস্তৃত বিবরণ এখানে অনাবশ্যক। শক্তি বা কলা চিতিশক্তিরই নামান্তর। ইহার বিকাশ কি প্রকারে হয় তাহা আলোচ্য। শক্তির তিনটি অবস্থার কথা মনে করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে একটি সুপ্তাবস্থা। একটি ক্রমিক জাগরণের অবস্থা, এবং একটি নিত্য পূর্ণ জাগ্রত অবস্থা। পূর্ণ জাগ্রতেরও ক্রম আছে। তদ্রূপ শক্তির জাগরণ বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে ইহা অচিৎ অবস্থা হইতে চিন্ময় রূপে উত্থিত হয়। শক্তির যেটি কৃশ দশা তাহাতে আচার্যগণ বিশ্বের আস্বাদন করেন না। যদিও বিশ্ব অভেদ সম্বন্ধে তাহাতেই আছে ইহা সত্য, তথাপি যাহা বলা হইল তাহাও সত্য। বিশ্ব তাঁহাতে তিনি হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজে নিজেকে আস্বাদন করিতেছেন না। তবে ত অণুভাব বা সংকোচের উদয় হইয়াছে। তাই সুপ্ত অবস্থা একটি ঘেরের অবস্থা। এই ঘের বা আবরণটি মহামায়ার স্বরূপ। অণুভাবের সঙ্গে সঙ্গে উহা ব্যাপ্ত হয়। এইজন্য উহা শূন্য, উহাকেই শাস্ত্রে তিরোধান বলিয়া থাকে। এইজন্য অস্ফুট বিগ্রহ তাহাতেও থাকে। স্ফুট বিগ্রহ অবস্থায় কঞ্চুকের সহিত যোগ হয়। পরে কলা হইতে প্রকৃতির আবির্ভাব হয়। এদিকে পুরুষ কর্মমলযুক্ত হইয়া পড়িল। ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তির উদয় হইল, চিত্তের আবির্ভাব হইল, তাহার ফলে দেহ প্রকট হইল। তখন পুরুষ কর্তা ও ভোক্তা সাজিলেন। জগৎও ভোগ্যরূপে পরিণত হইল। এইপ্রকার সংকোচের ক্রম-বৃদ্ধির ফলে প্রমেয়, প্রমাণ ও প্রমাতারূপ বিভক্ত দশার উদয় হইল।

সাধারণ মানুষের স্তরে আসিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এটা ভেদময় জ্ঞানের রাজ্য। শাক্তগণ বিশ্বকে বিশ্লেষণ করিয়া ইহার কয়েকটি অঙ্গ দেখিতে

পাইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমটি গ্রাহ্য, দ্বিতীয়টি গ্রহণ ও তৃতীয়টি গ্রাহক। কিন্তু তাঁহারা এমন একপ্রকার গ্রাহকের সন্ধান পাইয়াছেন, যাহাতে গ্রাহ্য ও গ্রহণ-জনিত ক্ষোভ নাই, অথচ যিনি গ্রহণ ফলের অধিকারী। ইহা সত্য। এই জগতের প্রথম অঙ্কুর ইহাই এবং বলিতে গেলে ইহাই সংবিৎ বা প্রমা অবস্থা। সমস্ত জগৎ ইহারই গর্ভে বিদ্যমান রহিয়াছে। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সবই ইহার অন্তর্গত। সৃষ্টি-প্রসঙ্গে প্রথমে জ্ঞাতার আবির্ভাব হয়, তাহার পরে জ্ঞানের এবং সকলের শেষে জ্ঞেয়ের। এইগুলি শক্তির দশা জানিতে হইবে। এখানে শিব শক্তিমানরূপে বিদ্যমান নহেন, কিন্তু শক্তিরূপে। এই শক্তির তিনটি রূপ আছে। তদনুসারে একটি পরাশক্তি, দ্বিতীয়টি পরাপরাশক্তি ও তৃতীয়টি অপরাশক্তি। এই তিনটি ব্যতীত মাতৃসদ্ভাব নামে একটি সত্তা রহিয়াছে। এইটি চতুর্দল চক্রের রহস্য।

পূর্ণতার তিরোধান হইলে এই দশার উদয় হয়। ইহা শক্তি দশা নামে পরিচিত। ইহা হইতে সংসার অবস্থার উদয় হয়। শক্তির দশাটি অবিভক্ত। ইহাতে পরা, পরাপরা ও অপরা তিন শক্তিই এক সঙ্গে রহিয়াছে। এখনও এই সকল শক্তি দেবীরূপ ধারণ করে নাই। ইহাই পূর্বোক্ত মাতৃ-সদ্ভাবের তাৎপর্য। এইখানে এই অবস্থায় সকলপ্রকার অনুভূতি বিদ্যমান রহিয়াছে, অথচ তাহাদের মূলে ক্ষোভ নাই, তবে এখানেও অপূর্ণতা আছে, এটি একটি অদ্ভুত রাজ্য।

পূর্ণ সত্তা হইতে অবতরণ—ইহারই নাম তিরোধান। শাক্তগণ এই পরম প্রকাশময় পূর্ণ সত্তাকে "ভাসা" নামে বর্ণনা করেন এবং এই শক্তিময় অবস্থাকে "অনাখ্যা" নাম দিয়া ব্যাখ্যা করেন। ভাসা হইতে অনাখ্যায় অবতরণ, ইহাই নিগ্রহ বা তিরোধান এবং অনাখ্যা হইতে ভাসাতে আরোহণ, ইহারই নাম অনুগ্রহ। তিরোধানের ফলে চতুর্দল কমলের আবির্ভাব হয় ও তাহা হইতে ক্রমশঃ ষোড়শদল পর্যন্ত বিকসিত হয়, পক্ষান্তরে অনুগ্রহের ফলে ষোড়শদল হইতে চতুর্দল পর্যন্ত গতি হয় এবং তাহার পর অনাখ্যা আশ্রয়ে "ভাসা"তে স্থিতি হয়।

ভাসাতে আত্মা অবিভক্ত ও অবিভাজ্য অব্যয় স্বরূপ। ইহাই পুরুষ। অনাখ্যে চতুর্দল প্রকৃতিতে স্থিতি। ইহা অবিভক্ত হইলেও বিভাজ্য। প্রমাতা স্থানে অষ্টদল কমল ও আমিতারূপের প্রকাশ। ইহা বিভাজ্য ও সত্ত্বপ্রধান। প্রমাণভূমিতে দ্বাদশদল কমল। ইহা মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি-ক্ষেত্র।

ইহা রজঃপ্রধান। প্রমেয় ভূমিতে ষোড়শদল কমল, ইহা তন্মাত্রা ও ভূতের ক্ষেত্র, ইহা তমঃপ্রধান।

অনুগ্রহশক্তির প্রভাবে ক্রমশঃ প্রমেয় হইতে প্রমাণ, প্রমাণ হইতে প্রমাতা, প্রমাতা হইতে অনাখ্যা এবং অনাখ্যা হইতে পূর্ণ বা ভাসাতে প্রবেশ হয়।

পূর্ণ ও ভাসাতে সমগ্র বিশ্ব অভেদে বিদ্যমান থাকে। তিরোধানকালে তাহা পৃথক্‌ভাবে স্ফুরিত হয়। ইহারই নামান্তর প্রকৃতি অথবা "শক্তি-চক্র"। ইহাই একপ্রকার পুরুষ হইতে প্রকৃতির আবির্ভাব অথবা ব্রহ্ম হইতে মায়ার আবির্ভাব বলা যাইতে পারে। তিরোধান শব্দের অর্থ আত্ম-সংকোচ অথবা কালচক্রের আবির্ভাব। ইহার মধ্যে প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত কৃষ্ণপক্ষ। অমাবস্যাটি পূর্ণ সংকোচের প্রতীক। এই অবস্থায় চিৎকলা সকলের সম্পূর্ণ আকুঞ্চন ঘটিয়া থাকে—একটি মাত্র কলা অবশিষ্ট থাকে, ইহারই নাম "অমা"।

এইখানে একটি কথা বিবেচনার যোগ্য মনে হয়। পূর্ণ হইতে যে অনাখ্যাব আবির্ভাব হয়, ইহার প্রণালীটি বিবর্ত, অনাখ্যা হইতে যে ত্রিপুটীর আবির্ভাব ইহার প্রণালীটি পরিণাম। ইহার পর আরম্ভ ক্রিয়ার অবসর হয়। জাগরণ হইতেই অনুগ্রহের উদয় হয়। ইহার পর শাক্ত স্রোতের বর্ষণ হয়। এই প্রক্রিয়াটি চলে অনাখ্যা পর্যন্ত। তাহার পর অনাখ্যা হইতে পূর্ণ অথবা ভাসায় প্রবেশ পরম অনুগ্রহের স্বরূপ। যেমন আরম্ভবাদ অবরোহ অবস্থায় ঘটিয়া থাকে, তেমনি আণব ব্যাপার আরোহের পর বুঝিতে হইবে। আরোহক্রমে প্রথমে থাকে নিজের চেষ্টা। ইহার নাম "আণব উপায়", তাহার পর শাক্তস্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায়, লক্ষ্য হইল শক্তি অথবা অনাখ্যা। অনাখ্যায় গমন করিয়া প্রতীক্ষা করিতে হয়। কারণ, নিজ হইতে পূর্ণে বা ভাসাতে যাওয়া যায় না। তখন পূর্ণ টানিয়া লন, তাহার ফলে হয় পূর্ণত্ব লাভ। অনাখ্যা হইতে ভাসায় তখনি যাওয়া সম্ভব হয় যখন আত্মা নিজে হইতে ধরা দেন। অনাখ্যা পর্যন্ত যায় অনুগ্রহের ফলে ঊর্দ্ধ স্রোতের টানে। কিন্তু ঊর্দ্ধ স্রোতেও শেষ পর্যন্ত যাওয়া যায় না। সেই তুঙ্গ শিখরে যাইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, তখন তিনি টানিয়া লন।

মহাশক্তি মা সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া লইয়া যান এবং এই উপলক্ষ্যে আত্মার রূপান্তর সাধন করেন। তিনি শিখর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন। ইহা বিশ্বের

উর্দ্ধতম স্থান। তবে ইহা বিষয়ী বিশ্ব। ইহার পর পূর্ণের মহাকৃপায় বিশ্বাতীত অবস্থার প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ পূর্ণত্ব লাভ হয়।

অতএব অনুগ্রহের ধারা হইল শুক্লপক্ষ। পূর্ণিমা হইল পঞ্চদশী। আরোহ-ক্রমে উহাই অনাখ্যা। অবরোহকালে শিব ছিলেন শক্তিরূপ, আরোহকালে শক্তি হন শিবরূপ। ঐখানেই শক্তি শিবরূপ ধারণ করেন। এইজন্য শক্তিযুক্ত শিবের প্রকাশ, ইহাই যুগলপদ্ম। তাই পঞ্চদশী যুক্ত। তারপর ষোড়শী অর্থাৎ "অমা", এটি যুক্ত নহে, একা। ইহার পর অবস্থা হইল পরা।

অনাখ্যার পরে ভাসা। ইহার মধ্যে আছে অনন্ত ব্যবধান। তিরোভাব-বশতঃ এই ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার অনুগ্রহের উদয় হইলে এই ব্যবধান কাটিয়া যাইবে। তিরোভাবের ফলে কালরাজ্যে প্রবেশ হয়, সুতরাং এই ফাঁকটি যমুনা অথবা কালনদী কিম্বা বিরজা। বৈষ্ণবীয় পরিভাষায় বলিতে গেলে পূর্ণটি হইল নিত্য বৃন্দাবন বা নিত্যলীলা ভূমি, যমুনা অথবা কালনদী পার হওয়াই পারে যাওয়া, নাবিক একজন মাত্র, তিনিই পূর্ণ।

আত্মার জাগরণের একটি ক্রম আছে। আত্মা এখন মায়ার আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ ঘুমাইয়া রহিয়াছে। এইজন্য তাহার আত্মবিমর্শ নাই, ইহারই প্রভাবে পিণ্ডমাত্রে তাহার অহন্তা রক্ষিত হয়। ইহারই নাম দেহাভিমান। ইহা সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সেইজন্য সে বিশ্বশরীর বলিয়া নিজেকে বুঝিতে পারে না, সুতরাং তাহার জাগরণও ঘটিতে পারে না।

প্রকৃত প্রস্তাবে বিশুদ্ধ আত্মা অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যস্বরূপ এবং অশুদ্ধ আত্মা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য, যাহাকে আমরা গ্রাহক বলিয়া বর্ণনা করি। বিশুদ্ধ আত্মাই বস্তুতঃ পরমশিব, সমগ্র বিশ্ব তাঁহারই শরীর। অনাশ্রিত শিব হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী তত্ত্ব পর্যন্ত সবই তাঁহার শরীর। অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও গ্রাহক চৈতন্য একপ্রকার নহে। শুদ্ধ চৈতন্যরূপী আত্মা কোন নির্দিষ্টরূপে বিশিষ্ট গ্রাহ্যের প্রতি উন্মুখ হ'ন না। যে ঐ প্রকারে উন্মুখ হয় তাহারই নাম গ্রাহক। উহা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য। ঐ গ্রাহ্য দ্বারাই তাহার চৈতন্য বা প্রকাশ অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যের ভান কি প্রকার? নির্দিষ্ট বিশেষরূপে ভান উহাতে হয় না। পরন্তু ভান হয় সামান্য সত্তার। এই সামান্যের অনুসন্ধানই তাহার স্বভাব। সর্বত্র অনুগত এক অখণ্ড সত্তার অনুসন্ধানই তাহার স্বভাব। যে কোন আত্মা নিজের গ্রাহকত্ব নিবন্ধন নিয়ত দর্শনাদি হইতে মুক্ত হইতে

পারিলে চৈতন্যরূপে নিজেকে প্রকাশ করে। সমস্ত বিশ্ব তখন তাহার শরীররূপে গণ্য হয়।

শুদ্ধ আত্মা বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন আত্মার অস্মিতা বিষয় লইয়া খেলা করে, কাহারও দেহকে আশ্রয় করিয়া, অপর কাহারও ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণ প্রাণ অথবা শূন্যকে আশ্রয় করিয়া কার্য করে। শূন্যই সুষুপ্তিরূপী মায়া। অহং অভিমান হইতে হইলে যে দেহেই হইতে হইবে অথবা দৃশ্যেই হইতে হইবে তেমন কোন কথা নাই। দেহবাহ্য বিষয়ে অস্মিতা হয়, পক্ষান্তরে অদৃশ্য হইলে তাহাতেও অহং অভিমান হইতে পারে। আসল কথা এই, অহং অভিমানও মায়া। এই অহং অভিমান চিতিরই অথবা সংবিৎ-এরই হয়, গ্রাহকের হয় না। উহা কোন কোন পদে ধারণ করা হয়। যদি উহা ছয় অধ্বাতেই ধারণ করা যায় তাহা হইলে শিবাদি পৃথিবী পর্যন্ত সকল বস্তুকে নিত্যশুদ্ধ প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা অনুসন্ধান করা যায়। তাহা হইলে সাধারণ আত্মাও নিজেকে বিশ্বরূপ বলিয়া বোধ করিতে পারে।

আর এক কথা। যাহাতে চিতির দৃঢ় অভিনিবেশ অথবা অস্মিতা থাকে, ইচ্ছামাত্র তাহাতে ক্রিয়া উৎপাদন করা যায়। অস্মিতা অহং আকার অভিনিবেশ মাত্র। একমাত্র শিবের অস্মিতা বিশ্বের সর্বত্র বিদ্যমান থাকে, কারণ শিব গ্রাহক নহেন, অর্থাৎ অবচ্ছিন্ন প্রকাশ নহেন।

এই যে অহন্তা ইহা বিন্দু হইতে শরীর পর্যন্ত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বিন্দু হইল স্বরসবাহিনী সামান্যভূতা সূক্ষ্মা অহং প্রতীতি, যাহা গ্রাহক, গ্রহণ ও গ্রাহ্যাদি প্রতীতিবিশেষের পূর্ববর্তী। প্রাণ হইল সেই সত্তা বা অণুর নাম যাহা অভিমান, অধ্যবসায় প্রভৃতি অন্তঃকরণের ক্ষোভক। শক্তি হইল বুদ্ধি, অহংকার, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীররূপে প্রসিদ্ধ। বিন্দু হইতে শরীর পর্যন্ত ছয়টিকে আবেষ্টন করিয়া কম্পিত করে যে অহন্তা তাহারই ধারণা চাই। ভাবনা দ্বারা এই অহন্তার বিকাশ হয়। ইহারই নাম কর্তৃত্ব, ঈশ্বরত্ব, স্বাতন্ত্র্য, চিৎস্বরূপতা ইত্যাদি। সিদ্ধিমাত্রই অহন্তাময়, সেইজন্য দৃঢ় প্রত্যয় হওয়া আবশ্যক।

৪

সুপ্ত প্রমাতার প্রতীতি কিরূপ? এ মায়ামোহিত। গ্রাহক চিদাত্মক এবং গ্রাহ্য অচিদাত্মক ও উহা হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত। যদিও সমগ্র বিশ্বভুবনাবলী

পূর্ণের বা প্রকাশের অন্তরে স্থিত, তথাপি সুপ্ত আত্মা মনে করে যে ইহা তাহা হইতে বাহ্য। এইসকল আত্মা "ভবী" নামে বর্ণিত হইয়া থাকে।

জাগ্রৎকল্প প্রমাতার প্রতীতি কি প্রকার? ইহার নামান্তর "ভবপদী"। শুদ্ধ বিদ্যারূপী প্রমাতা এবং সম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রাপ্ত প্রমাতা ইহারই অন্তর্গত। ইহারা ঠিক সুপ্ত নহে অথচ ঠিক জাগ্রতও নহে। সুপ্ত নহে, কারণ ইহাদের ভব বা সংসার নাই, যেহেতু ইহাদের ভেদজ্ঞান নাই, অর্থাৎ অভিন্ন বস্তুতে ভিন্নপ্রতীতি নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইহাদের অবস্থা "উদ্‌ভব"। তবে ভব অর্থাৎ ভেদজ্ঞান না থাকিলেও উহার সংস্কার ইহাদের চিত্তে বিদ্যমান রহিয়াছে, কারণ অন্তঃসংকল্প প্রভৃতি আকারে ভিন্নবৎ প্রতীতি শুদ্ধ বিদ্যার প্রভাবে অথবা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ফলে হইতে পারে। এই অবস্থায় অবিবেক থাকে। ইহার পর বিবেকখ্যাতির উদয় হয় ও পরে শুদ্ধ সত্তার আবির্ভাব হয়। এই অবস্থাটি ঠিক স্বপ্নের ন্যায়। সুপ্তি নাই বটে, কিন্তু ঠিক ঠিক জাগরণও হয় নাই। ঠিক ঠিক জাগরণ হইলে ভেদের সংস্কার থাকা সম্ভবপর হইত না। এই সব আত্মা ধর্মাধর্মের ক্ষয়বশতঃ কোন কোন দৃষ্টি অনুসারে মুক্ত পুরুষরূপে পরিগণিত হইলেও ইহারা প্রকৃত মুক্ত পুরুষ নহে। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহাদিগকে রুদ্রাণু রূপে বর্ণনা করা হয়। বাস্তবিক পক্ষে ইহারাও পশু। কর্মসংস্কার রহিত হইলেও সংবিৎ শ্রবণে ইহাদের অধিকার নাই।

ইহার পর জাগ্রত অথবা প্রবুদ্ধ প্রমাতার অনুভূতির কথা বলা যাইতেছে। এইসকল আত্মাতে ভেদের এবং অভেদের সংস্কার বিদ্যমান থাকে। এই-সকল আত্মা জড় বস্তুকে ইদংরূপে অনুভব করে এবং পক্ষান্তরে অহং বস্তুর প্রতীতিও অহংরূপে থাকে। সামানাধিকরণ্যবশতঃ অভেদের আরোপ হয় বলিয়া ভেদাংশ ঢাকা পড়িয়া যায় এবং 'ইদং-অহং' রূপ অনুভবের উদয় হয়। ইহাদের অনুভবে সমগ্র বিশ্ব নিজের শরীররূপে প্রতীয়মান হয়। এই অবস্থায় দুইটি অনুভব যুগপৎ বিদ্যমান থাকে। এইটিকে "ঈশ্বর" অবস্থা বলে।

সুপ্রবুদ্ধকল্প ও সুপ্রবুদ্ধ প্রমাতার অনুভব বলা যাইতেছে। এই অবস্থায় ইদং-প্রতীতির বিষয়ীভূত জ্ঞেয় পদার্থ অহংরূপী স্বরূপে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ পায়। এইটি নিমেষরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য। এইসকল আত্মা অভেদ জ্ঞান অথবা কৈবল্য প্রাপ্তিবশতঃ "উদ্‌ভবী"রূপে বর্ণিত হয়। ইহারা অহংরূপ স্বরূপে মগ্ন থাকে। এই অবস্থাটি অহংভাবের দ্বারা আচ্ছাদিত অস্ফুট

ইদংভাবের দশা, এইটিকে "সদাশিব" অবস্থা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ইহাও আত্মার পূর্ণস্থিতি নহে। ইহার পর পূর্ণস্থিতির উদয় হয়, কিন্তু তাহা অস্থায়ী। এই অবস্থায় "নিমেষ ও উন্মেষ" উভয়ই থাকে। সমুদ্রে তরঙ্গাদির যেমন নিমেষ-উন্মেষ দুইই থাকে, ইহাও কতকটা সেইপ্রকার। প্রকাশ সর্বদাই থাকে, তবে শিবাদি বিশ্বের ভান কখন থাকে, কখন থাকে না। যখন ভান থাকে তখন প্রকাশাত্মকরূপেই তাহার উন্মেষ হয়। যখন ভান থাকে না তখনও প্রকাশস্বরূপেই তাহার নিমেষ হয়।

ইহার পর প্রকৃত পূর্ণত্বের আবির্ভাব হয়। ইহাই স্থায়ী অবস্থা। পূর্বে যে পূর্ণত্বের অভিব্যক্তি হইয়াছিল তাহাতে প্রকাশ ও নিমেষের সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু এখন তাহা নাই। ইহার কারণ এই যে পূর্বে মন ছিল বলিয়া নিমেষ ও উন্মেষ ঘটিত। এখনকার অবস্থা ঠিক "উন্মনা"। উন্মনা বলিয়া পূর্ণাত্মার সিদ্ধি অচল। ইহারই নাম সিদ্ধ "সুপ্রবুদ্ধ" অবস্থা। এইপ্রকার যোগীর ইচ্ছামাত্রে অভিমত বিভূতির আবির্ভাব হয়। ইহাই আত্মার পূর্ণ জাগরণের অবস্থা।

৫

এবার বিভূতি অথবা সিদ্ধির বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলিব।

সিদ্ধি নানাপ্রকার হইতে পারে। কোন কোন সিদ্ধি অর্থমূলক। এইগুলি নিম্নস্তরের সিদ্ধি অথবা অপরা সিদ্ধি। কোন কোন সিদ্ধি তত্ত্বমূলক। এইগুলি উচ্চস্তরের সিদ্ধি বা পরাসিদ্ধি। প্রত্যেকটি অর্থের এক একটি কর্ম আছে। ইহাকে cosmic function বলা যাইতে পারে। নিত্যসিদ্ধ যোগী যখন যে অর্থে আত্মভাবনা করে তখন সে সেই অর্থরূপে স্বয়ংই অবস্থিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তৎকর্ম নির্বাহ ঘটিয়া থাকে। সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, মেঘ, বজ্র, সমুদ্র, পর্বত ইত্যাদি প্রত্যেকের যে অর্থক্রিয়াকারিত্ব আছে যোগী তাহা এইক্ষণে প্রাপ্ত হইতে পারে। যে দেবতা যে অর্থ বা প্রয়োজন সম্পাদন করে, ইচ্ছা করিলে সেই অর্থ সেই দেবতাতে অহং অভিমান ধারণ করিতে পারিলে ক্ষণমধ্যে স্বয়ংই ফুটিয়া উঠে। এইপ্রকার পৃথিবী হইতে শিবত্ব পর্যন্ত অহংভাবে অভিনিবেশ-নিবন্ধন যোগী তৎ তৎ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মায়া পর্যন্ত যে যে সিদ্ধির উদয় হয়, তাহার নাম গুহান্ত সিদ্ধি। এইগুলি অপরাসিদ্ধি অর্থাৎ নিম্নস্তরের সিদ্ধি। সরস্বতী বা শুদ্ধবিদ্যাদি সিদ্ধি পরাসিদ্ধি। ইহা উচ্চস্তরের সিদ্ধি। ইহার পর সর্বসিদ্ধির ঊর্ধ্বে দুইটি মহাসিদ্ধি রহিয়াছে।

প্রথম মহাসিদ্ধিটি হইল "সকলীকরণ"। কালাগ্নিসদৃশ তীব্র জ্বালা দ্বারা ছয়টি অধ্বরূপী পাশ দগ্ধ হয়। তাহার পর অমৃত দ্বারা আপ্লাবন ঘটে। তখন ইষ্টদেবতার দর্শন হয়। এই অবস্থায় শোধিত সমগ্র অধ্বার অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বের গুরুপদে বরণ হয়। তিনি জগদ্‌গুরু, তিনি সমস্ত বিশ্বের অনুগ্রাহক। ইহাও কিন্তু অপূর্ণ খ্যাতি। ইহার পর যেটি দ্বিতীয় মহাসিদ্ধি তাহাই পূর্ণ খ্যাতি অর্থাৎ পরমশিবত্বলাভ। এই অবস্থায় তাঁহার স্বীয় ইচ্ছানুসারে ভুবনাদির সৃষ্টির অধিকার জন্মে। পরমশিবের পঞ্চকৃত্যকারিত্ব সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। মনে রাখিতে হইবে, মুক্ত শিব মাত্রই পরমশিবের সহিত অভিন্ন বলিয়া পঞ্চকৃত্য সম্পাদনের অধিকারী। কিন্তু অধিকারী হইলেও তাঁহারা কৃত্য সম্পাদন করেন না।

এই স্থানে একটি রহস্যের কথা ইঙ্গিতমাত্রে নিবেদন করিব। সিদ্ধ অবস্থায় এমন একটি স্থিতি আছে যখন যোগী ইচ্ছাশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া ভক্তির দিকে উন্মুখ হন। যতদিন ইচ্ছারূপে ইচ্ছাশক্তি বর্তমান থাকে ততদিন লক্ষ্য থাকে বাহিরের দিকে। কিন্তু ইচ্ছা অন্তর্মুখ হইলেই ভক্তিরূপে পরিণত হয়, তখন যোগী ভক্ত কিছুই চান না। একমাত্র তাঁহাকেই চান। কোন প্রয়োজনসিদ্ধি তাঁহার উদ্দেশ্য নয়, তবুও তাঁহাকে না চাহিয়া পারেন না। শঙ্করাচার্য বলিয়াছিলেন—'সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবৈবাহং' ইত্যাদি। ইহা সেই অবস্থা। ইহাকেই শ্রীমদ্‌ ভগবদ্‌গীতাতে 'জ্ঞানী ভক্ত' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত, কারণ ইনি নিত্যযুক্ত এবং একভক্ত।

দেহসিদ্ধি

১

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ", "মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাম্" প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা পঞ্চভূতময় ষাট্‌কৌষিক দেহের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতে বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন 'কিমাশ্চর্যং'—আশ্চর্য কি? তখন যুধিষ্ঠিরের উত্তরে এইরূপ তথ্যই প্রকাশিত হইয়াছিল যে প্রত্যহ ভূতসমূহ যমালয়ে গমন করিতেছে ইহা জানিয়াও প্রত্যেক প্রাণী মনে করে সে সংসারে স্থায়ী হইবে এবং তাহার মৃত্যু হইবে না। ইহাই এক পরম আশ্চর্য ব্যাপার। এই বিষয়ে যোগশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে সমস্ত জীবই স্বতঃসিদ্ধভাবে হৃদয়ে প্রার্থনা করে, আমি যেন স্থায়ীভাবে সংসারে থাকিয়া যাই, আমার যেন অভাব না হয়।

দেহ বলিতে আমরা শুক্র-শোণিতের দ্বারা রচিত যোনিজ শরীরকে বুঝিয়া থাকি। প্রারব্ধকর্মের ফলভোগের নিমিত্ত জীব এই দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই দেহ চেষ্টা, ইন্দ্রিয় এবং ভোগের আশ্রয় বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ন্যায়-বৈশেষিকমতে দেহশুদ্ধির ইহাই তাৎপর্য। সাংখ্যমতে 'সপ্তদশৈকং লিঙ্গং' সূত্রের দ্বারা লিঙ্গশরীর স্বীকৃত হইয়াছে; এবং পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহ স্বীকৃত হইয়াছে। বেদান্তে স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ হইতে ভিন্ন মূল অবিদ্যারূপ কারণদেহ স্বীকৃত হইয়াছে। এই পর্যন্ত গুণমণ্ডলের ব্যাপ্তি। কার্য ও কারণভেদে ভৌতিক দেহ দুইপ্রকার। আবার কার্যদেহও স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দুইপ্রকার। প্রচলিত দর্শন, পুরাণ ও উপ-পুরাণে তিনপ্রকার দেহেরই উল্লেখ ও বিচার লক্ষিত হয়।

ভৌতিকদেহ বিকারিস্বভাব। এই বিষয়ে মতভেদ নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মন্ত্র, ঔষধি তপঃপ্রভাবে, উপাসনাযোগ ও জ্ঞানপ্রভাবে অথবা অন্য কোন প্রক্রিয়ার ফলে ভৌতিক শরীরও এত অধিক নির্মল হইতে পারে যে উহা নশ্বর হইয়াও অবিনাশী হইতে পারে এবং মৃত্যু জয় করিতে পারে। ইহা কল্পনামাত্র

নহে, শাস্ত্র ও অনুভবসিদ্ধ। এই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ 'কালদহন তন্ত্র' এবং 'মৃত্যুঞ্জয় তন্ত্রে' কায়সিদ্ধির বিবরণ দেখিতে পারেন। চিদম্বর নিবাসী রামলিঙ্গশাস্ত্রী প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বে কায়সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং সমাগত জনসমক্ষে দিবালোকে তিরোহিত হইয়াছিলেন। ইহা একটি প্রামানিক তথ্য। এই বিষয়ে আরও সত্য ঘটনা উপস্থিত করা যাইতে পারে।

ভূতসমূহ স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয়, অর্থবত্ত্ব এই পঞ্চ স্বভাবযুক্ত। ভূতসমূহের এই পঞ্চবিধ স্বরূপের সংযমের দ্বারা জয়লাভ হইলে যোগীর অণিমাদি সিদ্ধি ও কায়সম্পৎ-এর অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। ভূতজয় হইলে যোগীর যেমন একদিকে রূপলাবণ্যের বিকাশ ঘটে অন্যদিকে তেমন শরীরটি বজ্রবৎ দৃঢ় হয়। ইহাই মুখ্য কায়সম্পৎ। সিদ্ধদেহ ভৌতিক-ধর্মের দ্বারা অভিভূত হয় না। ইহাই সিদ্ধদেহের প্রধান লক্ষণ।

দেহ সিদ্ধ হইলে উহা জরা, ব্যাধি প্রভৃতি বিকার হইতে মুক্ত হইয়া মৃত্যুকেও জয় করিতে সমর্থ হয়। কখন কখন দেখা যায় যে দেহ একই সঙ্গে অজর ও অমর উভয়ই। আবার কখন কখন দেখা যায় যে অজরত্ব ও অমরত্ব এক সঙ্গে বিদ্যমান নাই। যখন অজরত্ব ও অমরত্ব এই দুটি ধর্ম একই দেহে থাকে তখন ঐ সিদ্ধদেহকে দিব্যতনু বলা হইয়া থাকে, আবার কোন কোন দেহ জরা-রহিত হইয়াও দীর্ঘকাল পরে কালগ্রাসে পতিত হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাতে দিব্যশব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়া থাকে। আবার কখন কখন এইরূপও দেখা যায় যে দেহ মরণরহিত হইলেও তাহাতে জরা আসে কিন্তু এই জরা সোমকলার দ্বারা ইচ্ছানুসারে নিবৃত্ত করা যাইতে পারে। তারপর যখন ঐ শরীর জীর্ণ হইয়া যায় তখন ঐ দেহ জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় ত্যাগ করিয়া ঔপপাদিক দেহের ন্যায় বালক, পৌগণ্ড এবং কিশোর অবস্থাপন্ন পুরুষের ন্যায় নবীন দেহ গ্রহণ করা চলে। অথবা যৌবনের উন্মেষমাত্র হইয়াছে এইরূপ তরুণ শরীরও লাভ করা সম্ভবপর। জীবের দেহসম্বন্ধ জন্ম, আয়ু ও ভোগের ন্যায় প্রারব্ধ কর্মের ফলে হইয়া থাকে। ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং দেহপাত ঘটে। ইহারই নাম মৃত্যু। যোগ-প্রক্রিয়ায় কায়সম্পৎ লাভ হইলে শুধু যে ভূতধর্মের দ্বারা অনভিভব হয় তাহা নহে, দেহপাতও নিরুদ্ধ হইয়া থাকে।

সৌগত মতে বোধিসত্ত্বের দশভূমিরূপ হেতু অবস্থায় চারিপ্রকার সম্পৎ আবির্ভূত হয়। তন্মধ্যে বজ্রসার স্থিরকায়সম্পদ্রূপ রূপকায়সম্পৎ উল্লেখযোগ্য।

শ্রুতিতেও এইরূপ যোগাগ্নিময় শরীরে ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর অভাবের কথা শ্রুত হইয়া থাকে।

> ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ।
> প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্॥ (শ্বেতাশ্বতর ২-১২)

দেহসিদ্ধির বিভিন্ন প্রক্রিয়া বিভিন্ন স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেহ বজ্রাঙ্গ এবং আয়ুর অসামান্য বৃদ্ধি হইলেও এবং ভূতসমূহের দ্বারা উহা অনভিভূত হইলেও যুগান্তে মহাযুগান্তে কল্পান্তে বা মহাকল্পান্তে ঐ দেহের পতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং দেহসিদ্ধিও আপেক্ষিক এইরূপ বলা উচিত। কারণ, দেহের উপাদানসমূহের সম্যক্ শুদ্ধি না হওয়ায় প্রদীপ্ত কালাগ্নির প্রভাবে উহা দগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু এইসব সিদ্ধ পুরুষ চিরজীবী এবং কল্পান্তস্থায়ী রূপে বর্ণিত হইয়া থাকেন। 'অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম' এই উক্তির দ্বারা সোমপানের প্রভাবে অমরত্বলাভ যেরূপ প্রলয়কাল স্থায়ী—দেহও তদ্রূপ। এইপ্রকার দেহসম্পদ্ কালাবচ্ছিন্ন সুতরাং উহা বাস্তব নহে। কিন্তু এইরূপ স্থিতি কোন বিশেষ-প্রকার দেহ সম্বন্ধে সত্য হইলেও আমরা যে প্রকার দেহ-শুদ্ধির বিষয় আলোচনা করিতেছি তাহা এইরূপ নহে। দেহ যখন শুদ্ধ সত্ত্বময় অথবা চিন্ময়রূপে স্থিতিলাভ করে তখন নিরপেক্ষ পারমার্থিক সিদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় মৃত্যুর কোন সম্ভাবনা নাই। এই বিষয়ে জ্ঞাতব্য এই যে ষোড়শকল পুরুষের যে ষোড়শী নামক কলা বিদ্যমান উহাই অমৃত কলা এবং পূর্ণ সোম কলা। উহা দ্বারা দেহের আপূরণ হইলে কালানল ঐ দেহে প্রবেশ করিতে পারে না এবং তাহার ফলে দেহের শোষণও ঘটে না। ঐ অবস্থায় দেহ ও আত্মা অভিন্ন হইয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধাবস্থা ও মৃত্যুঞ্জয়তা লাভ। সম্যক্রূপে যে দেহে সাধনক্রিয়া ঘটিয়া থাকে—আয়ুক্ষয় হইলে উহার পতন যোগীর ইচ্ছায় অথবা কাল-প্রভাবে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সম্যক্প্রকারে দেহসিদ্ধি সম্পন্ন হইলে ঐ সিদ্ধদেহ চিন্ময়রূপ ধারণ করে, তখন সিদ্ধ যোগীর দেহ তাহার শক্তিরূপ বলিয়া সিদ্ধস্বরূপেরই অন্তর্গত হয়। সুতরাং তখন পতনের কোন সম্ভাবনা থাকে না। শুধু স্বাতন্ত্র্যবশতঃ তিরোভাব মাত্র ঘটিয়া থাকে। পূর্ণ সামরস্য দশায় দেহ ও আত্মা শিব-শক্তিরূপ ধারণ করিয়া সর্বতোভাবে সমরস হয়। উহা অদ্বয় স্বরূপ ও নিত্য স্বপ্রকাশ থাকে। সেইজন্য তখন তিরোভাব হয় না।

সিদ্ধ সম্প্রদায়ে কিম্বদন্তী আছে—যাহা দ্বারা সম্যক্ ও অসম্যক্‌রূপে কায়-সিদ্ধির ভেদ স্পষ্ট প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, একবার গোরক্ষনাথ অল্লাম প্রভুদেব নামক কোন একজন মহাসিদ্ধের নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহার নিকট নিজের ভূতজয় এবং বজ্রাঙ্গতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রভুদেবের মতে কেবল মাত্র বজ্রাঙ্গতা লাভ সম্যক্ সিদ্ধি বলিয়া স্বীকৃত হয় না। দেহের স্থিরতা হইলেও যতক্ষণ মায়ানিবৃত্তি না হয় ততক্ষণ পরামুক্তির সম্ভাবনা নাই। তাঁহার মতে ক্ষর ভূতসমূহের এবং অক্ষর কূটস্থের অধীশ্বর মহাদেবের প্রতি ভক্তিই পরামুক্তির উপায়। এই ভক্তির উদয় না হইলে দেহসিদ্ধি হইলেও উহা পরমাসিদ্ধিরূপে পরিগণিত হয় না।

গোরক্ষনাথ বলিলেন যে তাঁহার শরীরে তীক্ষ্ণধার অসির প্রহারেও কোন ক্ষতি হইবে না। প্রভুদেবের মতে ছেদন ভেদন প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা কায়সিদ্ধির পরীক্ষা আসুরিক পরীক্ষা। তাহা সত্ত্বেও যখন গোরক্ষনাথের দেহে খড়্গ প্রহার করা হইল তখন দেখা গেল তাঁহার শরীরের কোন অংশ ছিন্ন হয় নাই। এমন কি তাঁহার শরীরের একটি রোমকূপও ছিন্ন করা গেল না, শুধু দেহ হইতে বজ্র দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত পর্বতের ন্যায় শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। তখন প্রভুদেব বলিলেন যে কায়সিদ্ধ যোগী—বাত, আতপ, অগ্নি, বৃষ্টি, হিম প্রভৃতির দ্বারা পীড়া অনুভব করে না। এইপ্রকারে যোগী জরা-মৃত্যুবর্জিত হইয়া থাকে। সিদ্ধযোগী সর্বপ্রকার সম্বন্ধ বর্জনপূর্বক ঈশ্বরে পূর্ণ সমাহিত থাকে। গোরক্ষনাথ সমস্ত কথা শুনিয়া প্রভুদেবকে পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি তরবারী লইয়া নানাপ্রকারে প্রভুদেবের শরীরে আঘাত করিলেন। কিন্তু প্রভুদেব ঐ আঘাতের সময় আকাশের ন্যায় অচল রহিয়া গেলেন। আঘাত যে কোথাও প্রতিহত হইয়াছে তাহা বুঝা গেল না। গোরক্ষনাথ এই আশ্চর্য সিদ্ধি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার নিজের শরীরে আঘাতের ফলে শব্দ উত্থিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রভুদেবের শরীর আকাশবৎ নিঃশব্দ। প্রভুদেব বলিলেন—"কায়ে ঘনীভবতি সাপি ঘনৈব মায়া।"

রস সম্প্রদায়ে অতি প্রাচীনকাল হইতে জীবমুক্তির সাধনের জন্য কায়সিদ্ধির উপযোগিতার বিষয়ে জানা ছিল। রসতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন এই শরীরে পরমার্থ সংবেদন হওয়া আবশ্যক। শরীর-ত্যাগের পর জ্ঞানলিপ্সা নিরর্থক। কিন্তু

নানাপ্রকার ব্যাধি, জরা, মরণ প্রভৃতি দুঃখে তাপিত ক্ষণভঙ্গুর শরীর দ্বারা মনের অগোচর পূর্ণ ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার লাভ করা সম্ভবপর নহে। অতএব মহাজ্ঞান লাভ করার পূর্বেই অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিসম্পন্ন স্থির দেহ লাভ করিবার জন্য প্রযত্ন আবশ্যক। দিব্যদেহ নির্মাণের জন্য শিববীর্য পারদ এবং শক্তিবীজাত্মক অভ্রকের উপযোগিতা রসতন্ত্রে বারংবার লিখিত হইয়াছে এবং এইজন্য দেহকে হর-গৌরীসম্ভূত বলা হইয়া থাকে। পারদ যেহেতু শিবের অঙ্গজাত সেইজন্য ইহাকে রস বলা হয়। অষ্টাদশ সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত রস যেমন একদিকে লৌহ বেধ করিতে সমর্থ হয় তদ্রূপ উহা দ্বারাই দেহের বেধন ক্রিয়াও সম্পন্ন হইয়া থাকে। রসের দ্বারা লৌহের বেধন হইয়া উহা স্বর্ণরূপে পরিণত হয় এবং উহা দ্বারা নরদেহের বেধ হইলে ইহাই সিদ্ধদেহে পরিণত হয়। বেধক্রিয়া দ্বারা শরীর সম্যক্ শুদ্ধ হইলে দেহ আকাশগমনাদি কার্য করিতে সমর্থ হয়। রসায়ন বিদ্যার উদ্দেশ্য লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করা নহে পরন্তু দেহের অমরতা সাধন করা। লৌহের বেধন এইজন্য করা হয় যাহাতে বুঝিতে পারা যায়—রস সম্যক্রূপে সংস্কারবিশিষ্ট হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করা—অন্য কোন কারণে নহে। জীবকে পার প্রদান করে বলিয়া—উহার নাম 'পারদ'। শিব-শক্তি বীজরূপ পারদ ও অভ্র উভয়ের সংঘট্টবশতঃ রসদেহের অভিব্যক্তি ঘটে। অনিত্য ভৌতিক দেহ যেরূপ রজোবীর্যের সহযোগে উৎপন্ন হয় তদ্রূপ রসদেহও শিব-শক্তির সামর্থ্য হইতে উৎপন্ন হয়। যাহা লয় প্রাপ্ত এবং যাহাতে উহা লীন হয়—তদ্উভয়ের মধ্যে সাম্য ঘটে। যে পারদ অভ্রকে গ্রাস করে তাহাতে স্বুবর্ণ প্রভৃতি লীন হইলে অমৃত সত্তা প্রকট হয়, যাহার ফলে দেহের স্থিরতা ঘটে।

দেহসিদ্ধি লাভের ফলে সমস্ত মন্ত্রবর্গ, শুদ্ধ অধ্বান্তর্গত সমস্ত দেবতা, রসসিদ্ধ পুরুষের কিঙ্কর হইয়া থাকে। অনাদিকাল হইতে বহু উপাসক এই দেহলাভ করিয়া সিদ্ধরূপে পরিচিত হইয়াছেন—তন্মধ্যে মহেশ্বর, দত্তাত্রেয়, শুক্রাচার্য প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এইরূপ মন্থানভৈরব, সিদ্ধবুদ্ধ, নাগার্জুন, নিত্যনাথ, বিন্দুনাথ প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। ইঁহারা অমর দেহলাভ করিয়া কালবঞ্চনাপূর্বক ত্রিলোকে বিচরণ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। চতুষ্পাদ্ ব্রহ্মের মাত্র এক পাদ মৃত্যু দ্বারা ব্যাপ্ত, অন্য পাদত্রয় "অমৃতম্ দিবি" অর্থাৎ মৃত্যুহীন ও দিব্য। উহারা নিজ মহিমায় বিরাজিত। সমগ্র জগৎ এক পাদে স্থিত, উহা চলস্বভাব বলিয়া হেয় কিন্তু ত্রিপাদ-বিভূতি উপাদেয়

ও মনের অগোচর। ঐ ব্রহ্মতত্ত্ব একমাত্র যোগগম্য। যোগ শব্দ এখানে প্রকৃতি ও পুরুষের শুদ্ধিসাম্যমূলক বলিয়া বুঝিতে হইবে। নরদেহ প্রাকৃত বলিয়া স্বভাবতঃ মলিন। সুতরাং যোগসম্পাদনের পূর্বেই উহার বিশুদ্ধিসম্পাদন আবশ্যক। যোগের দ্বারা আত্মসংবেদন হয় ও সমগ্র জগতের ভাসক চিদ্ জ্যোতির আবির্ভাব হয়। দেহের কালগ্রাস শঙ্কা নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত দেহ ও আত্মার ঐ যোগ সম্ভবপর নহে এবং উপযুক্ত চিদ্ জ্যোতির স্ফুরণ হয় না। ঐ জ্যোতিঃ সর্বক্লেশ হইতে মুক্ত, বিকল্পহীন, শান্ত, এক, স্বয়ং বেদ্য। মনের যোগের ফলে বিশ্ব চিদ্রূপে প্রতিভাসমান হয়, সর্বকর্ম ছিন্ন হয়। বহিঃপ্রবণ ইন্দ্রিয়গণ স্বতঃই প্রত্যাহৃত হয় এবং চিরকালের জন্য রাগ-দ্বেষের পরিহার হয়। মানব-জীবনের পূর্ণ সফলতা ইহাতে নিহিত। তখন দেহ তেজোরূপ হইয়া নিজের শক্তিরূপে পরিণত হয়।

আরব দেশের রসায়নবিদ্গণের মতে সব বস্তুতে দুইটি অংশ বর্তমান থাকে। তন্মধ্যে এক ভাগ জড় ও পার্থিব এবং অপর ভাগ সূক্ষ্ম ও চেতন, লঘু ও জ্যোতির্ময়। একটি দেহ, অপরটি উহার আত্মা। ঐ সূক্ষ্ম অংশটি যাহা স্থূল হইতে বলবান্—আত্মরূপ। ঐ আত্মা স্থূলে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্থূলকে কোন উপায়ে পরিবর্তিত করিয়া থাকে।

রসবিদ্গণের প্রথম কর্তব্য স্থূল ও সূক্ষ্মের পৃথক্করণ। তারপর স্থূলে তদনুরূপ সূক্ষ্ম সত্তার সঞ্চার করা উচিত। ইহারই নামান্তর যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের যোজনা। রসবিদ্যায় নিষ্ণাত ও কর্মকুশল ও ধী-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি স্থূল সত্তা হইতে নির্গত সূক্ষ্ম সত্তাকে পুনঃ আকর্ষণ করিয়া স্থূলে পুনরায় স্থাপন করিতে পারে। সূক্ষ্ম সত্তার এতদূর শুদ্ধির প্রয়োজন যাহাতে উহা সবেগে নিজের অনুরূপ স্থূল সত্তাতে প্রবেশ করিতে পারে; এবং উহাকে এতদূর শুদ্ধ করা প্রয়োজন যাহাতে উহা তেজোরূপ ধারণ করিয়া বাহ্য তেজকেও প্রতিহত করিতে পারে। এই বিষয়ে পর্যালোচন করিলে বুঝা যায় যে রসতত্ত্ববিদ্গণের উদ্দেশ্য ছিল প্রাকৃত সত্তাকে অপ্রাকৃত সত্তাতে পরিণত করা। অপ্রাকৃত সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃর দ্বারা সংশ্লিষ্ট নহে এবং উহা ঘনীভূত। সুতরাং উহা অখণ্ড-স্বভাব। সংযোগকালে উহা সংঘর্ষ সহন করিতে পারে।

নাথ-যোগিসম্প্রদায়ের মূল প্রবর্তক আদিনাথ হইলেও সংসারে উহা মৎস্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রচারিত হয়। পরে গোরক্ষনাথ, জলন্ধর, চৌরঙ্গী, ভর্তৃহরি

প্রভৃতি বিশিষ্ট যোগী ঐ সম্প্রদায়ে আবির্ভূত হন। এইরূপ শুনা যায় যে কপিল, মার্কণ্ডেয়, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি হঠযোগের উপদেষ্টা ছিলেন। নাথযোগিগণের মধ্যে কেহ কেহ দেহসিদ্ধির জন্য রসপ্রয়োগ, কেহ কেহ বায়ুপ্রক্রিয়া, অন্য কেহ কেহ বিন্দুসিদ্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতেন। ঐ সব উপায় যোগপ্রক্রিয়ারূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। উক্ত নাথযোগিগণ লোকোত্তর যোগ-সিদ্ধির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু একথা সকলেই স্বীকার করেন যে মহাজ্ঞান ভিন্ন কায়সিদ্ধির কোন উপায় নাই। ইহাই তাহাদের মুখ্য সিদ্ধান্ত। পরপিণ্ড হইতে স্বপিণ্ড পর্যন্ত সমস্ত পিণ্ডের জ্ঞান সম্পন্ন হইলে পর পরমপদে সমরসতা লাভ হয়। কিন্তু স্বাত্মবিশ্রান্তি ভিন্ন পিণ্ড ও পরমের সমরসীভাব সম্ভব নয়। সুতরাং সর্বপ্রথমে বিশ্রান্তি প্রয়োজন। ঐ বিশ্রান্তির কারণ সদ্‌গুরু স্বয়ং। তিনি বাক্য কিংবা দৃষ্টির দ্বারা শিষ্যের চিত্তের বিশ্রান্তি সম্পাদন করেন। বিশ্রান্তির পর পরমপদ সাক্ষাৎকার আবশ্যক। এই সাক্ষাৎকার দুঃসাধ্য হইলেও বিশ্রান্তচিত্তের পক্ষে অনেকটা সুকর।

পরমপদ-সাক্ষাৎকার করিবার পর পরপদে ও নিজ পিণ্ডে সামরস্য সম্পাদন আবশ্যক। তখন অত্যাবশ্যক নিরুত্থান দশার উদয় হইয়া থাকে। পরমপদ স্বয়ংবেদ্য এবং বাক্য ও মনের অগোচর।

যোগী মহত্ত্বপূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিবার পর নিজস্বরূপ অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছায় নিজাবেশ লাভ করেন এবং নিরুত্থান দশাও প্রাপ্ত হন। সচ্চিদানন্দ-চমৎকার, অদ্ভুত আকারসমূহের প্রকাশ, প্রবোধ, পরমপদ প্রবেশ প্রভৃতি, ক্রমানুসারে ধীরে ধীরে লাভ হয়। এই অনুভবের বলে নিজপিণ্ডের সিদ্ধি হয়। তখন সিদ্ধ নিজপিণ্ডের সহিত পরপদের একাকারত্ব সম্পন্ন করেন।

এই মার্গে কোথাও কোথাও ক্রমিক চারিটি জ্ঞানের কথা বর্ণিত হইয়াছে দেখা যায়। উহারা ক্রমশঃ সহজ, সসংযম, সোপায় এবং স্বাদ্বয় নামে বর্ণিত হইয়া থাকে। ইহাদের আবির্ভাবের ফলে প্রকৃষ্ট নিরুত্থান দশার পূর্বাঙ্গরূপ স্বাত্মবিশ্রান্তি সুলভ হইয়া থাকে।

আচার্য বলভদ্রমতে পরম্পরা-প্রাপ্ত সন্মার্গ-প্রদর্শক পুরুষই গুরুরূপে স্বীকৃত। আত্মবিশ্রান্তি-প্রদানের শক্তি শুধু তাঁহাতেই বর্তমান। তাঁহার দ্বারা প্রদর্শিত পথে যাঁহারা চলেন তাঁহারা স্বয়ংবেদ্য বস্তুকে দেখিতে পান। পরমাত্মারূপ সদ্‌গুরুর করুণাদৃষ্টিই সর্বপ্রকার কল্যাণের মূল। যোগিগণ সমস্তপ্রকার সিদ্ধি

ত্যাগ করিয়া স্বাত্মৈকবেদ্য নিরুত্থান দশা লাভ করেন ও নিজপিণ্ডকে সমরস করিতে পারেন।

প্রথমে নিজাবেশ জন্মে। তারপর স্থির মহানন্দ দশা অভিব্যক্ত হয় এবং ঐ সঙ্গে অমল প্রকাশের আবির্ভাব ঘটে। এই পর্যন্ত সম্পন্ন হইলে নিখিল ভেদ বিগলিত হইয়া অভেদময় চৈতন্যভাসক পরমপদের উন্মেষ হয়। উহার অনুভবের ফলে নিজ পিণ্ডের সম্যক্‌জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া পরমপদে নিজ পিণ্ডের নির্বাণ অথবা ঐক্য সম্পাদিত হয়। তারপর নিজের রশ্মি প্রত্যাবৃত্ত হয়। উহাই দ্বিতীয় উন্মেষ। উহার প্রত্যাহার হইলে সামরস্য ঘটে। নিজ কিরণপুঞ্জ নিজরূপে সাক্ষাৎকৃত হয়। এই সামরস্যই অদ্বয় তত্ত্ব। অবধূত-গীতায় উক্ত সমতত্ত্ব ইহাই। অমনস্ক বর্ণিত ভাবাভাববিনির্মুক্ত নাশ ও উৎপাদরহিত। সর্বসংকল্প বর্জন ও পরব্রহ্মদশাও ইহারই নামান্তর।

মহাজ্ঞানের দ্বারা পরমশূন্যযোগ লাভ হয়। আদিনাথ, শ্রীশঙ্কর হইতে এই জ্ঞান মৎস্যেন্দ্রনাথের ন্যায় গোরক্ষনাথও লাভ করিয়াছিলেন। সিদ্ধ নাথযোগি-গণের নামাবলীতে বহু নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সব নাম রসসম্প্রদায়ের গ্রন্থেও উপলব্ধ হয়। ৮৪ সিদ্ধগণের নাম কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রসমার্গে সিদ্ধ, কেহ কেহ হঠযোগের দ্বারা সিদ্ধ, আবার কেহ বা তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কিংবা বিন্দুসাধনের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে স্থির কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন।

প্রায় সমস্ত মার্গেই সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে একটি মার্গ লক্ষিত হয়। উহা ব্রহ্মমার্গ। উহাই শূন্যপদবী নামে প্রসিদ্ধ সুষুম্নানামক মধ্যমা প্রতিপৎ, যাহার বর্ণনা নিম্নপ্রকারে করা হইয়া থাকে।

"ভোক্তৃ সুষুম্না কালস্য গুহ্যমেতদুদাহৃতম্"।

অর্বাচীনকালে বজ্রযান মার্গে গমনশীল সাধকগণের ভাবে ভাবিত বাউল এবং সহজিয়া সাধকগণের ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া নাথযোগমার্গ কিঞ্চিৎ বিশিষ্টতা লাভ করে। তাহার ফলে তাঁহারা কায়সিদ্ধির জন্য অতিগুহ্য চারি-চন্দ্রের সাধন নামক উপায় অবলম্বন করেন। এই মতে সাপেক্ষ এবং নিরপেক্ষ নামে দ্বিবিধ অমরত্ব স্বীকৃত হয়। সাপেক্ষ অমরত্ব বাস্তবিকপক্ষে নাথনিরঞ্জন পদ লাভ এবং উহাই পূর্ণতা। সাপেক্ষ অমরত্ব সিদ্ধপদ লাভ। অমৃতধারার স্রাবণ এবং উহার দ্বারা দেহসংজীবন করা উক্ত প্রকার অমরতা লাভের

উপায়রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। অধোমুখ সহস্রদল-কমলকে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া ঐ কমলে স্থিত অমৃত দ্বারা মনের অভিষেক করা প্রয়োজন। ঐখানে প্রণবের ধ্যান করা আবশ্যক। ব্রহ্মরন্ধ্রের দ্বার এবং ত্রিবেণীর দ্বার রোধ করা আবশ্যক। ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে সুধাধারা আর অধোদেশে পতিত হইতে পারে না। যোগিগণের মতে এই ক্রিয়া আকাশচন্দ্রভেদ নামে পরিচিত। এখানে একথা জানা আবশ্যক যে দেহরস অমৃতরূপে পরিণত হইয়া ঊর্দ্ধগামী বায়ু দ্বারা ঊর্দ্ধে নীত হয় এবং সহস্রারে সঞ্চিত হইয়া থাকে। এই মতে চারি-প্রকার চন্দ্র স্বীকৃত : (১) আদিচন্দ্র, (২) নিজচন্দ্র (৩) উন্মদচন্দ্র ও (৪) গরলচন্দ্র।

রসাত্মক নিজচন্দ্রকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণপূর্বক আকাশচন্দ্রে যোজনা করা কর্তব্য। ঊর্দ্ধগতির ফলে রস অমৃতরূপ পরিণত হইয়া থাকে। আকাশচন্দ্র সহস্রারে সংলগ্ন, এইরূপে যোগী গরলচন্দ্রকে পান করিবেন। গরলচন্দ্রের পান এবং প্রণবের ধ্যান আবশ্যক। গরলচন্দ্রের দ্বারা দেহ ও মনের শোধন এবং সংজীবন সম্পন্ন হইলে সিদ্ধদেহ লাভ ঘটে।

মহাযানী বৌদ্ধগণও কায়-সাধনের বিষয়ে উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন পরপ্রজ্ঞা লাভের জন্য বোধিসত্বভূমি প্রবেশ করা কর্তব্য এবং ভূমিভেদ করাও প্রয়োজন। উহা সম্পন্ন হইলে প্রজ্ঞাপারমিতা প্রাপ্তি ঘটে এবং উহাই বুদ্ধত্ব-সম্পাদক মহাজ্ঞান। অক্লিষ্ট অজ্ঞান যতক্ষণ বর্তমান ততক্ষণ পূর্ণত্বলাভ সম্ভবপর নহে এবং সম্যক্ সংবোধিও জন্মে না। বোধিসত্বের কায়সম্পৎ হেত্ববস্থাতেই জন্মিয়া থাকে।

তান্ত্রিক বৌদ্ধমতে কেহ রসাত্মক বিন্দুকে বোধিচিত্ত বলে। চতুর্দল কমল হইতে ইহাকে ঊর্দ্ধে উষ্ণীষ কমলে স্থাপন করা যোগসাধনার ফল। ষট্‌চক্রভেদের ন্যায় উত্থাপন ক্রিয়া অতি কঠিন। প্রথমে বিন্দুর নিম্নতল চক্রে স্থিতি আবশ্যক। তারপর নির্মাণচক্র হইতে উহাকে মহাসুখচক্রে উত্থাপিত করা। সেখানে বোধিচিত্তের উদয় হয়। তাহা কর্মমুদ্রার স্থান। উদ্ভবের তাৎপর্য ক্ষোভ। তারপর ঐ ক্ষুব্ধ বিন্দুকে অবধূতী নামক মধ্যমার্গ দিয়া সঞ্চালিত করিতে হয়। ক্ষুব্ধবিন্দুর ঊর্দ্ধগমন পথে ভিন্ন ভিন্ন আনন্দ আস্বাদিত হইয়া থাকে। বিন্দুর অধোগমনেও আনন্দের অভিব্যক্তি অবশ্যই হয় কিন্তু তাহা অস্থায়ী এবং মলিন বলিয়া উহা ত্যাজ্য। বিন্দুর অধোগতির ফলে যেরূপ কামদেহের উৎপত্তি হয় তদ্রূপ উহার ঊর্দ্ধগমনে দিব্যদেহ প্রকটিত হইয়া থাকে।

২

কায়সাধন বিষয়ে একথা জানা আবশ্যক যে বিন্দুর অধঃস্খলন যেন কোন প্রকারেই না হয়, তাহা হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যোগিগণ বলিয়াছেন—মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ। বিন্দুর উর্দ্ধগতির সম্পাদনের ফলে কায়সাধন সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিন্দু স্বভাবতঃ মলযুক্ত বলিয়া উহা অধোগতি-সম্পন্ন। ঐ অশুদ্ধ বিন্দুকে বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ সংবৃতি-বোধিচিত্ত নামে অভিহিত করেন। অশুদ্ধ বিন্দুর ভূমিপ্রবেশে সামর্থ্য নাই, সুতরাং তাহার দ্বারা ভূমিভেদও সম্ভব নয় এবং তাহার ফলে প্রজ্ঞারও শুদ্ধি ঘটিতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধত্ব লাভ সুদূরপরাহত। সেইজন্য সর্বপ্রথমে শোধন-শক্তি ও নিরোধ-শক্তি দ্বারা বিন্দুর অধোগতি রোধ করা প্রয়োজন। তারপর কর্মমুদ্রার দ্বারা উধ্বর্স্রোত খুলিলে অমরতার মার্গ সিদ্ধ হয়। এখানেই বুদ্ধভাবের উদয় হয়। নির্মাণচক্রে বিন্দুর গতি ও স্থিতির ফলে যে কায়ের উদয় হয় তাহার নাম নির্মাণকায়। বিন্দুর উধ্বর্গমনের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দেরও তারতম্য হয়। অবধূতি মার্গ আশ্রয় করিয়া বোধিচিত্ত যখন ধর্মচক্র পর্যন্ত উত্থিত হয় তখন পূর্বোক্ত আনন্দ পরমানন্দরূপে পরিণত হয়। নির্মাণচক্রে যাহা কর্মমুদ্রা, ধর্মচক্রে উহা ধর্মমুদ্রা। এ অবস্থায় বোধিচিত্ত যোগীর শিরোদেশে থাকে। ইহার পর উৎকর্ষ লাভ হইলে সম্ভোগচক্রে বিরমানন্দের অনুভব হয়—এই সময়কার মুদ্রার নাম মহামুদ্রা। পরমানন্দ ও বিরমানন্দ ক্রমশঃ ভব ও নির্বাণ রূপ। এ সময় সময়মুদ্রা কার্যকরী হয়, কিন্তু ইহাও পূর্ণতা লাভ নয়। এখানে ক্লেশাবরণ এবং জ্ঞেয়াবরণের নিবৃত্তি ঘটে এবং ভব ও নির্বাণ একাকার হইয়া যায়। ইহার উধ্বের্ মহাসুখচক্রে সহজানন্দের উপলব্ধি হয়। তখন অহং-বোধের সর্বথা বিলোপ ঘটে।

যেরূপ নির্মাণচক্রে বুদ্ধের নির্মাণকায় আবির্ভূত হয় তদ্রূপ ধর্মচক্রে ধর্মকায়, সম্ভোগচক্রে সম্ভোগকায় এবং মহাসুখ-চক্রে মহাসুখকায় প্রকটিত হয়। ইহাই দিব্যদেহের প্রকটন। এই স্থিতিতে দিব্যচক্ষু, দিব্যশ্রোত্র, সর্বজ্ঞত্ব, বিভুত্ব প্রভৃতি মহাগুণের আবির্ভাব ঘটে, সর্বশেষে সম্যক্ সম্বুদ্ধ রূপে বোধিচিত্তের স্ফূর্তি হইয়া থাকে।

আনন্দই অমৃত, চন্দ্রকলা হইতে তাহার উন্মেষ ঘটিয়া থাকে। অবধূতি মার্গ দিয়া যখন বোধিচিত্ত উধ্বের্ গমন করিতে থাকে তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার

আনন্দের উন্মেষ হয়। ষোড়শকলাত্মক চন্দ্রের প্রথম পাঁচটি কলা হইতে ধর্মচক্রে পরমানন্দের আবির্ভাব হয়, মধ্যম পঞ্চকলা ও অন্তিম পঞ্চকলা হইতে অন্য দুইপ্রকার আনন্দের উদ্ভব হইয়া থাকে। অমৃতা নামক ষোড়শী কলা মহাসুখচক্রে সহজানন্দরূপে অনুভূত হয়। এই অমৃতকলাই মানবদেহের অমরতা সম্পাদন করিয়া থাকে।

সহজ সাধক বৈষ্ণবগণও কায়সাধনকে সাধনার উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে দেহে চারিটি সরোবর বিদ্যমান। কায়সাধনে সিদ্ধ হইলে এই সরোবর অভিব্যক্ত হয়। সরোবরের দুইটি বামাঙ্গে এবং দুইটি দক্ষিণাঙ্গে। ইহারা প্রকৃতি-পুরুষরূপ। কাম সরোবর এবং মান সরোবর বাম অঙ্গে, প্রেম সরোবর এবং অক্ষয় সরোবর দক্ষিণ অঙ্গে বর্তমান। সন্তবাণীতে লক্ষিত হয় যে মান-সরোবরে স্নান সম্পাদনের পর ব্যাপক মনোময় রাজ্য লাভ হয়, পরে তাহা অতিক্রম করিয়া মহাশূন্য ভেদ করা কর্তব্য। অন্যথা চিদানন্দময় ভগবদ্ধাম লাভ ঘটে না অক্ষয় সরোবরই ভগবদ্ধাম। মহাপ্রলয়ে সমস্ত জগতের নাশ হইলেও একমাত্র অক্ষয় সরোবরই বিদ্যমান থাকে।

মানবদেহে এই স্থান মস্তকস্থিত সহস্রদল কমলে অবস্থিত। ইহা সহজপুর। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ভেদ হইলে ইহা অধিগত হয়। এখানে কাল নাই, জরা নাই, মৃত্যুও নাই।

সহজ সাধকগণ কায়সিদ্ধি বিষয়ে তিনটি ভূমি স্বীকার করেন। প্রথম প্রবর্তক ভূমি, দ্বিতীয় সাধক ভূমি, তৃতীয় সিদ্ধ ভূমি। প্রথম ভূমিতে নামসাধনা। যতক্ষণ মন্ত্রসিদ্ধি না হয় ততক্ষণ প্রবর্তক অবস্থার অতিক্রম সম্ভব নয়। দ্বিতীয় ভূমিতে ভাবসাধনা ও প্রেমসাধনা। ভাবদেহ প্রাপ্তির পর সেই দেহে সাধন চলে। সিদ্ধাবস্থায় তৃতীয় ভূমিতে রসময় তনু লাভ হয় এবং শ্রীভগবানের নিত্য লীলামণ্ডলে প্রবেশ লাভ ঘটে।

মৃত্যুকালে জীব নব দেহ গ্রহণ করিয়া জীর্ণ কায় ত্যাগ করে ইহাই বস্তুস্থিতি। এইরূপে নব নব দেহ ধারণ করিলে দেহের অবশ্যই শুদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু চরম শুদ্ধি তাহাতেও আসে না। প্রাকৃত সত্ত্ব শুদ্ধির প্রকর্ষে যেমন অপ্রাকৃত সত্ত্বরূপ হয় না, কেননা পূর্বোক্ত প্রাকৃত সত্ত্বে রজঃ, তমের সম্পর্ক

অবশ্যই থাকিয়া যায়, তদ্রূপ দেহ হইতে দেহান্তর লাভ হইলেও তাহাতে অশুদ্ধ মায়ার লেশ থাকিয়াই যায়, শুদ্ধ মায়ার যোগ তাহাতে আসে না।

সিদ্ধ সম্প্রদায় মতে মায়া তিনপ্রকার—অশুদ্ধ মায়া, শুদ্ধ মায়া এবং মহামায়া। শুদ্ধ মায়া এখানে শৈবাগম প্রসিদ্ধ বিন্দু তত্ত্ব বা মহামায়া, প্রায় চিচ্ছক্তি রূপ। অশুদ্ধ সত্ত্ব বিকারস্বভাব, শুদ্ধ সত্ত্ব কিন্তু অবিকারী। এইজন্য দেহশুদ্ধি সম্যক্ করিতে হইলে অশুদ্ধ মায়াজাত দেহকে শুদ্ধ মায়াকোটিতে আনয়ন করা আবশ্যক। যখন এইপ্রকার শুদ্ধি সম্পন্ন হয় তখন মায়া হইতে জাত বিকারসমূহ তিরোহিত হয়। কিন্তু শুদ্ধ মার্গে অবস্থিত মুক্ত পুরুষের অনুগ্রহ ব্যতীত শুদ্ধ দেহের উৎপত্তি সম্ভব নয়। যতদিন পর্যন্ত অশুদ্ধ প্রাকৃত দেহ শুদ্ধ মায়াদেহরূপে পরিণত না হয় ততদিন মৃত্যু ও সংসার নিবৃত্তি হয় না। কর্মের অভাব ঘটিলেও অশুদ্ধ দেহের বীজ তখনও থাকে, সুতরাং সংসরণ হইবেই। কিন্তু ঐ সংসরণ স্বেচ্ছাধীন। উহা কোন কর্মের অধীন নয়। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, সূক্ষ্ম কর্ম সেখানেও বর্তমান। শুদ্ধ মার্গে অবস্থিত পুরুষের কৃপা লাভ হইলে শুদ্ধ বীজলাভ ঘটে এবং অশুদ্ধ দেহের শুদ্ধিও ঘটে। তখন মৃত্যু হইয়া থাকে। মুক্ত পুরুষের অনুগ্রহে অশুদ্ধ মায়া শুদ্ধ মায়ায় পরিণত হয় এবং তখন দেহেরও অমরতা লাভ ঘটে।

এই শুদ্ধ দেহ অমৃতকলাময় 'প্রণবতনু' নামে প্রসিদ্ধ। প্রণবতনু লাভ জীবন্মুক্তি। এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষ জীব হইয়াও ঈশ্বরকল্প। তিনি শুদ্ধ ও অশুদ্ধ জগতের সন্ধিস্থলে অবস্থান করেন। অশুদ্ধ জগতের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ অল্প কিছুকাল থাকে। পরামুক্তি তাঁহার আসন্ন। যখন তাঁহার পরামুক্তি লাভ ঘটে তখন তিনি চিন্ময় জ্যোতিঃস্বরূপে অবস্থান করেন এবং দেহ থাকে জ্যোতিঃস্বরূপে। তখন মায়াসম্বন্ধ নাই, শুদ্ধ মায়াও তখন নাই। জীবন্মুক্তের দেহ শুদ্ধমায়াময় ; পরমুক্তের দেহ মহামায়াময়। পরমুক্ত পুরুষের দেহ জ্ঞানময়। সেখানে দেহ ও আত্মার ভেদ বিগলিত হইয়া যায়। প্রণবদেহধারী জীবন্মুক্ত পুরুষ মুমুক্ষু মায়াগ্রস্ত জীবগণকে মায়াগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। শুদ্ধ বাসনার নিবৃত্তি হইলে তাঁহারা শুদ্ধ মায়ারাজ্যও ত্যাগ করেন। তাঁহাদের দেহ অকস্মাৎ দিবালোকেই তিরোহিত হয়। সিদ্ধগণ বলেন, দেহে থাকিয়াই জীবন্মুক্তি লাভ করিতে হইবে ; মৃত্যুর পরে নহে। সিদ্ধমতে মানুষের একমাত্র কর্তব্য—

দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি। উভয়ের মিলনে পরমসত্ত্বের অভিব্যক্তি হয়। রসসিদ্ধ ও নাথযোগিগণেরও ইহাই সিদ্ধান্ত।

প্রতীচ্য দেশেও কায়সিদ্ধি সম্বন্ধে অনুশীলন হইত। ঐ সব দেশের গুপ্ত সংস্কৃতি ও প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে এ বিষয়ে অনেকটা অবগত হওয়া যায়। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রামাণিক তথ্যগুলি এখানে উল্লেখযোগ্য মনে হয়।

বাইবেলের নব বিধানের (New Testament) চতুর্থ খণ্ডে অপ্রাকৃত জন্ম শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাহাতে মনে হয় ঐ শব্দের দ্বারা দিব্যদেহ প্রাপ্তির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে।

জ্ঞান হইতে জ্ঞেয়ের ভেদ দূর করিয়া জ্ঞানকে জ্ঞেয় আকারে পরিণত করার শক্তিই মহাজ্ঞানের লক্ষণ। মনুষ্যশরীরে অনাদি কাল হইতে অসংখ্য শক্তি সুপ্ত ভাবে বর্তমান রহিয়াছে। ঐ শক্তিসমূহকে জাগরিত না করিতে পারিলে জ্ঞান মহাজ্ঞানে পরিণত হইতে পারে না। ফলে আত্মবিকাশও হয় না এবং তাহার অভাবে স্বরূপপ্রতিষ্ঠাও হইতে পারে না। শক্তিজাগরণের উপায় অন্তর্দৃষ্টির উন্মীলন। উন্মীলিত শক্তিসমূহের দ্বারাই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা লাভ হয় এবং জরা মরণাদি বিকার-বর্জিত এবং মল ও পাপলেশহীন দিব্যদেহের উদয় ঘটে।

ইহাই দ্বিজত্ব সম্পাদনকারী দ্বিতীয় জন্ম (Regeneration অথবা Birth from Above)।

আমাদের দেশে যেমন উপনয়ন সংস্কারের প্রভাবে অথবা দীক্ষার ফলে শুদ্ধ-দেহের উদয় হয় তদ্রূপ খৃষ্টীয় সম্প্রদায়েও দীক্ষার প্রভাবে (Baptism) শুদ্ধদেহ লাভ হয়, এইরূপ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন এই—অন্তর্দৃষ্টির উন্মীলন কিরূপে হয়? ইহার উত্তরে বলা হয় যে এই সম্প্রদায়ের মতে পূর্ণ সত্য অখণ্ড একরসস্বভাব। উহা মহাসাম্যরূপ। উহা সকলপ্রকার করণের অগোচর বলিয়া ঐ নির্বিকল্পস্বরূপ বস্তু দ্বৈতও নয়, অদ্বৈতও নয়। এই মতে এক অচিন্ত্য বাহ্যসত্তা স্বীকৃত হয়, উহাকে আমরা বিশ্ব-সৃষ্টির মূল এক আদিদ্রব্য বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি। সৃষ্টির সময়ে এই সত্তায় ক্ষোভ জন্মে, যাহার ফলে উহা বিভক্ত হইয়া সূক্ষ্ম ও স্থূল নানা অসংখ্য জড় অংশ রূপে পরিণত হয়। পূর্ণ সত্তার বাহিরে ক্রমশঃ নিত্য ও অনিত্য-মণ্ডলের উদয় হয়। তন্মধ্যে নিত্যমণ্ডল সত্য কিন্তু অনিত্যমণ্ডল মিথ্যা।

পূর্ণত্ব এতদুভয়ের অতীত অবস্থা। নিত্যমণ্ডল নির্বিকার, অনিত্যমণ্ডল বিকারময়। নিত্যমণ্ডলে একতার ভান থাকিলেও বহুর সমষ্টি বলিয়া তাহাতে বাস্তবিক একতা নাই। সমষ্টিগত বৈকল্পিক একতা অবশ্য তাহাতে আছে। সাংখ্য-সম্মত প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। কিন্তু সাম্যাবস্থায় তাহাতে যে জাতীয় একতা বর্তমান তদ্রূপ একতা এই নিত্যমণ্ডলে আছে। পূর্ণ স্বরূপে যে একতা তাহা সাম্যরূপ নয় বলিয়া উহা বিলক্ষণস্বভাব।

এই নিত্যমণ্ডল শ্রীভগবানের ভাবরূপ অথবা আদি কল্পনারূপ। উহা সৃষ্টির সময়ে ভৌতিকরূপে প্রকটিত হয়। কিন্তু সৃষ্টির উন্মেষ সময়ে ঐ মণ্ডলদ্বয় অব্যক্ত অবস্থায় থাকে।

চিদ্‌রূপে (Logos) নিত্যমণ্ডলের অধিষ্ঠান হয়। ইহার সঙ্গে সৃষ্টি-প্রকৃতির (Archeus) কি সম্বন্ধ? খৃষ্টীয় যোগিগণের মতে এই চিৎ ও অচিৎ সত্তা সমকালীন ও সমভাবাপন্ন বলিয়া কথিত হয়। এই চিৎ মূলদ্রব্যে আচ্ছন্ন অবস্থায় নিহিত থাকে, এবং মূলদ্রব্য-রূপ প্রকৃতিও চিৎস্বরূপের প্রাণ-শক্তি। সাংখ্য মতে যেমন সত্ত্ব ও পুরুষে কল্পিত সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়া থাকে তদ্রূপ এখানেও বুঝিতে হইবে। চিৎ জ্যোতিরূপে প্রতিভাত। দ্বৈত শৈব মতে যেরূপ বিন্দুক্ষোভের ফলে চিচ্ছক্তির অভিব্যক্তিরূপ জ্যোতির প্রকাশ স্বীকৃত হয়, এখানেও কতকটা তদ্রূপ। অখিল সৃষ্টি, সর্বপ্রকার স্থূল সূক্ষ্ম দেহ, এই জ্যোতিঃ হইতেই আবির্ভূত হয়। খৃষ্টিয় যোগিগণের পরিভাষায় এই জ্যোতিকে Pneuma বলা হয়।

এই জ্যোতি-রূপা মূল শক্তি সমস্ত জড়বস্তুতে নিহিত এবং উহারই প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান ভিন্ন ভিন্ন কার্য-রূপ প্রাপ্ত হয়। নব বিধানে Paraclete নামে জীবাত্মশক্তির কথা উল্লিখিত হইয়া থাকে। তাহা এই মূল শক্তিরই নামান্তর।

মহাজ্ঞান সম্পাদন করিতে হইলে এই শক্তিই কার্য করিয়া থাকে। ইহাকে ত্যাগ করিয়া কোন নির্মাণকার্য সম্ভব নয়। ভারতীয় যোগিসমাজের ন্যায় খৃষ্টীয় যোগিসমাজেও পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু লক্ষিত হয় তাহা সবই পিণ্ডেও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে এবং যাহা পিণ্ডে তাহা ব্রহ্মাণ্ডে। বাহ্য প্রপঞ্চে কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল এইপ্রকার তিনটি ভূমি বর্তমান। পূর্বোক্ত অন্তর্মণ্ডলই (Logos) কারণভূমি। উহা জ্যোতির্ময়।

মধ্য ভূমি মনোময় (Psychic) ; উহা সূক্ষ্ম। অন্তিম ভূমি ভৌতিক—স্থূল। উহা সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য। স্থূল ও সূক্ষ্মের অন্তরালে একটি ভূমি আছে, উহা কাহারও মতে স্থূলের অন্তর্গত, কাহারও মতে উহা সূক্ষ্মের অন্তর্গত। ঐ ভূমি কল্পনাময়। এইপ্রকার মানবের অন্তঃসত্তায়ও তিনটি ভূমি বর্তমান। উহা কারণরূপ, সূক্ষ্মরূপ ও স্থূলরূপ এবং কারণাদি দেহত্রয় নামে প্রসিদ্ধ।

কারণদেহ (Pneumatic body) জ্যোতির্ময়, কোথাও কোথাও উহা আত্মরূপ (Spiritual body) দেহ নামেও উক্ত হইয়া থাকে। অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা নিরীক্ষমাণ হইলে উহা অণ্ডাকার প্রভামণ্ডলরূপে প্রতিভাত হয়, এবং উহাতে পূর্ববর্ণিত জ্যোতি (Paraclete, Logos) সুপ্তবৎ নিহিত থাকে। উহার উদ্দীপন হইলে উহা মানবের অধ্যাত্ম জীবনকে নির্মল করিতে পারে। জাগরণের সময় ইহা তীব্র প্রাণশক্তিরূপে বিদ্যুতের প্রভার ন্যায় সর্পের ন্যায় গতিতে বিসর্পিত হয়। এই শক্তি অমিত। ভারতীয় যোগশাস্ত্রে ইহাকে কুণ্ডলিনী বলা হয়। প্রাচীনকালের যবন শাস্ত্রেও এই শক্তি কুণ্ডলাকার সর্পের ন্যায় বলিয়া ইহাকে Speirema নামে অভিহিত করা হইত। যখন এই শক্তির কুণ্ডল ভঙ্গ হয় তখন এই বৈদ্যুতী শক্তি কারণদেহের অন্তঃস্থিত সত্ত্ব গ্রহণ করিয়া জ্যোতির্ময় দেহ রচনা করিয়া থাকে। এই দেহের নির্মাণকৌশলই দীক্ষা নামে প্রসিদ্ধ। চিদুজ্জ্বল এই দেহকে রহস্যবিদ্‌গণ Augoeides শব্দে অভিহিত করেন। অজর ও অমর এই দেহকে সৌরদেহ নামেও অভিহিত করা হয়। এই দেহে অচিন্ত্য বৈশিষ্ট্য বর্তমান। ইহার আকার পূর্বোক্ত বিদ্যুৎ জ্যোতিতে নিমগ্ন থাকে। যোগসাধনার বলে এবং শ্রীভগবানের অনুগ্রহে এই দিব্য মৃত্যুহীন দেহ মূল আকার অনুসরণ করিয়া ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হয়। এই স্বয়ংপ্রকাশ দেহ সুবর্ণ জ্যোতির্মণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। উপনিষদে বর্ণিত হিরণ্ময় জ্যোতির ইহা ঘনীভূতরূপ। ইহাতে অবয়বের সংঘাত নাই বলিয়া ইহা অখণ্ড। অবয়ব নাই বলিয়া ইহাকে বিভক্ত করা যায় না, তাই ইহা অবিনাশী, অপরিণামী, অজর ও অমর। স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া ইহার প্রকাশে বাহ্য আলোকের অপেক্ষা নাই, অন্তঃকরণের কিংবা করণশক্তিরও অপেক্ষা নাই।

সূক্ষ্ম মনোময় দেহ চান্দ্রদেহ নামে পরিচিত। মনের চন্দ্রাত্মকতা আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ কথা। সৌরদেহ ও চান্দ্রদেহ উভয়ই জ্যোতির্ময়। এই দৃষ্টিতে সমান

হইয়াও উভয়ে ভেদ বর্তমান। সৌরদেহ নিরবয়ব, অখণ্ড। চান্দ্রদেহ সাবয়ব। সাবয়ব বলিয়া বিনাশধর্মী। সৌরদেহ অবিনশ্বর।

স্থূলদেহ ভৌতিক একথা সকলেই জানেন, সুতরাং এ বিষয়ে আলোচনা নিরর্থক। সূক্ষ্মদেহের ছায়ারূপ একটি দেহ আছে, মরণের পরে কোন কোন জীব উহা গ্রহণ করিয়া থাকে, মরণের পূর্বেও উহার গ্রহণ হইতে পারে। ইহা প্রায়ই মানুষের হানিকর, সুতরাং ঐ বিষয়ে আলোচনা নিরর্থক। সুতরাং ঐ ছায়াময় দেহ হইতে আত্মরক্ষা করা আবশ্যক—অন্যথা ধর্মজীবনে উন্নতি কঠিন।

যোগশাস্ত্রে জ্ঞানচক্ষুকে তৃতীয় নেত্র নামে অভিহিত করা হয়। পূর্বোক্ত সঞ্জীবনী শক্তির প্রভাবে নেত্রের সূক্ষ্মক্রিয়া উন্মিষিত হয়। আত্মার ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই কুণ্ডলিনীর জাগরণ সম্ভব। ঐ কুণ্ডলিনী জাগ্রৎ হইয়া নাড়ীগত অসংখ্য আবরণ অপসারিত করে এবং দেহও বিমল করে। ইহাই আত্মশুদ্ধির উপায়। শুদ্ধির ক্রমিক উৎকর্ষের ফলে শক্তির কেন্দ্রস্থিত সব চক্র নিজের আয়ত্তে আসে। আত্মার শক্তিবিকাশের ইহাই ক্রম।

দিব্যদেহ লাভ করিয়া দিব্যজীবন লাভের জন্য ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচারশুদ্ধি ও বোধশক্তির পরিশীলন করা প্রয়োজন। পবিত্র জীবন, চিন্তারাহিত্য ও একাগ্রতা দিব্যভাবের সহায়ক। একাগ্রতা লাভের ফলে চিত্ত অন্তর্মুখ হয় এবং সূক্ষ্ম ধ্যানে প্রবণতা আসে। ইহার ফলে চিৎশক্তির বিকাশ হয় এবং ইচ্ছামাত্র সমাধি লাভ হয়। এই সমাধি প্রচলিত জড় সমাধি হইতে বিলক্ষণ। ইহাতে চেতনা লুপ্ত হয় না, স্ব-নিয়ন্ত্রণ সামর্থ্য থাকে। প্রাচীন খৃষ্টীয় যোগিগণের মতে ইহার নাম Mantea। এই আন্তর যোগমার্গ বিশুদ্ধ মনের ভাবনার বলে উন্মীলিত হয়। কিন্তু কুণ্ডলিনীর জাগরণ এবং প্রাণকেন্দ্রের জয় সম্পন্ন না হইলে উক্ত ভাবনা কার্যকরী হয় না। বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের জন্য গুপ্ত শক্তিসমূহ লাভ করিবার ইহাই উপায়, অন্য পথ নাই।

৩

আমরা এতক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান আশ্রয় করিয়া কায়সিদ্ধির বিবরণ সংক্ষেপে উপস্থিত করিলাম এবং প্রসঙ্গক্রমে প্রতীচ্য দেশেও কায়সাধন বিষয়ে কিরূপ প্রচার ছিল তাহারও কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করা হইল। এখন কৌলিক আগম সম্প্রদায়ের যোগিগণের মধ্যে এই কায়সাধন প্রক্রিয়া কিরূপ ছিল তাহার উল্লেখ

করা যাইতেছে। কিন্তু প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞানের পূর্বেই দেহের বিজ্ঞান আবশ্যক। এইজন্য নরদেহের মহত্ত্ব প্রদর্শনের নিমিত্ত ঐ দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদার্থসমূহের বিবরণ দেওয়া যাইবে। এইসব পদার্থের সম্যক্‌জ্ঞান ভিন্ন দিব্য দেহসম্পাদক কৌলিক যোগক্রিয়া আরম্ভ করা সম্ভব নয়।

ঐ পদার্থগুলি কি যাহার জ্ঞান কার্যসাধনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক? নেত্রাগমে মহেশ্বর এই বিষয়ে পদার্থসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। উহারা নিম্নপ্রকার—

ঋতুং (৬) চক্রং স্বরাধারং (১৬) ত্রিলক্ষ্যং (৩) ব্যোমপঞ্চকম্ (৫)।
গ্রন্থিদ্বাদশসংযুক্তং (১২) শক্তিত্রয়সমন্বিতম্ (৩)॥
ধামত্রয়পর্যাক্রান্তং (৩) নাড়িত্রয়সমন্বিতম্ (৩)।
জ্ঞাত্বা শরীরং সুশ্রোণি দশনাড়িপয়োবৃতম্ (১০)॥
দ্বাসপ্ততিসহস্রৈস্তু (৭২০০০) সার্ধকোটিত্রয়েণ চ (৩৫০০০০০০)।
নাড়িবৃন্দৈঃ সমাক্রান্তং মলিনং ব্যাধিভির্ধৃতম॥
সূক্ষ্মধ্যানামৃতেনৈব পরে নৈবেদিতেন তু।
আপ্যায়ং কুরুতে যোগী আত্মনো বা পরস্য চ।
দিব্যদেহঃ স ভবতি সর্বব্যাধিবিবর্জিতঃ।

(১) কৌলমতে ষট্‌চক্র

(ক) জন্মস্থানস্থ নাড়িচক্র। উহাকে আশ্রয় করিয়া বিশাল নাড়ীসমূহ জালের ন্যায় বিস্তৃত রহিয়াছে।

(খ) মায়াচক্র নাভিদেশে অবস্থিত। ঐ স্থান হইতে মায়া সর্বতোব্যাপ্ত রহিয়াছে।

(গ) যোগচক্র হৃদয়ে। ইহা যোগ-প্রসরের আশ্রয় স্থান।

(ঘ) ভেদনচক্র তালুদেশে।

(ঙ) দীপ্তিচক্র বিন্দুস্থান ভ্রূ-মধ্যে।

(চ) শান্তচক্র নাদস্থানে অবস্থিত।

(২) ষোড়শ আধার

এই আধারসমূহ জীবের আধার বলিয়া আধারপদবাচ্য। পায়ের অঙ্গুষ্ঠ হইতে দ্বাদশান্ত কমল পর্যন্ত ইঁহার বিস্তার। তাহাদের নাম অঙ্গুষ্ঠ, গুল্ফ, জানু, মেঢ্র পায়ু, কন্দ, নাড়ি, জঠর, হৃৎকমল, কূর্ম নাড়ী, কণ্ঠাধার, তালুদেশ, ভ্রূ-মধ্য, ললাট, ব্রহ্মরন্ধ্র ও দ্বাদশান্ত। ইহারা সব আধার নামে পরিচিত।

(৩) তিন লক্ষ্য

(ক) অন্তর্লক্ষ্য

তড়িৎ-প্রভার ন্যায় অতি সূক্ষ্ম কুণ্ডলিনীস্থিত আকাশের দর্শন। অথবা মস্তকের উর্ধ্বে দ্বাদশাঙ্গুল পর্যন্ত জ্যোতির দর্শন। ইহা আন্তর ও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এ বিষয়ে কিছু মতভেদ বর্তমান। যোগিগণের অন্তর্লক্ষ্য সহস্রারে জ্বলজ্জ্যোতির দর্শন। বৈষ্ণবগণের মতে বুদ্ধিগুহায় সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষরূপের দর্শন। শৈবগণের মতে শীর্ষস্থমণ্ডলে উমা-মহেশ্বররূপ দর্শন। দহর উপাসকগণের অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষরূপ এই দর্শন।

(খ) মধ্যলক্ষ্য

নানা বিচিত্রবর্ণ সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির শিখার ন্যায় অথবা তদ্‌বিহীন অন্তরীক্ষের ন্যায়।

(গ) বহির্লক্ষ্য

নিজের নাসিকাগ্রে অভ্যাসের ফলে অল্পদূর পর্যন্ত ব্যোম।

(৪) পঞ্চ ব্যোম

এই ব্যোমসমূহ জন্মস্থান, নাভি, হৃদয়, বিন্দু ও নাদে ভাবনা করিতে হয়। তন্মধ্যে প্রথম ব্যোম অনন্ত বিশ্বের আশ্রয় অনন্ত শূন্যরূপ। এইসব শূন্য সুষুপ্তির আবেশকারক বলিয়া হেয়। পঞ্চ আকাশের নাম অন্য অন্য স্থানে অন্যপ্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে—যেমন গুণরহিত আকাশ, পরাকাশ, মহাকাশ, তত্ত্বাকাশ, সূর্যাকাশ।

(৫) দ্বাদশ গ্রন্থি

মায়া হইতে শক্তি পর্যন্ত দ্বাদশ গ্রন্থিসমূহের স্থান জানিতে হইবে। মায়া-গ্রন্থি দেহের উৎপত্তির কারণ। পাশব-গ্রন্থি পশুগণের সংকুচিত দৃষ্টির কারণ। এই গ্রন্থি কন্দে অবস্থিত। হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া ললাট পর্যন্ত পাঁচটি

কারণ-গ্রন্থি বিদ্যমান। ইহারা পশুগণের সৃষ্টির কারণ। সেইজন্য উহা নিরোধ করা কর্তব্য। নিরোধনীয় বলিয়া ইহাদিগকে গ্রন্থি বলা হয়। ব্রহ্ম-গ্রন্থি হৃদয়ে, বিষ্ণু-গ্রন্থি কণ্ঠে, রুদ্র-গ্রন্থি তালুমূলে, ঈশ্বর-গ্রন্থি ভ্রূ-মধ্যে, সদাশিব-গ্রন্থি ললাটে অবস্থিত। ইহারও উর্ধ্বে আরও কয়েকটি গ্রন্থি আছে—উহারা নাদশক্তিরূপ বলিয়া নিরোধিকার উর্ধ্বে অবস্থিত। উহাদের নাম—ইন্ধিকা, দীপিকা, বৈষ্ণব, নাদ ও শক্তি। ইহারাও পরচিৎ প্রকাশে আবরণস্বরূপ।

(৬) তিন ধাম

চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নিরূপ ধাম বাম, দক্ষিণ ও মধ্যস্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত। মানব দেহাধিষ্ঠাতৃ তিনপ্রকার বায়ু দ্বারা ধামত্রয় সৃষ্ট। ইড়াদি নাড়িত্রয় ও বায়ুত্রয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বস্তুতঃ নাড়ী অসংখ্য এবং বায়ু তাহাদের অধিষ্ঠাতা।

পরচিৎ শক্তি হইতে প্রসৃত অমৃত দ্বারা দিব্য শাক্তকায় উদ্ভূত হইয়া থাকে। এই যে শক্তি তাহা কি? ইহা আত্মার ধর্ম, ভগবানের তিনি স্বরূপ মহিমা, শিবের প্রাণরূপ সামর্থ্য। কিন্তু শক্তিরূপে ব্যবহার হইলেও উহা স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত নয়, কেননা ইহা কেবল স্বরূপে আশ্রিত নয়, স্বরূপ হইতে অভিন্ন এবং স্বরূপের সঙ্গে একরস। এই চিতিরূপ পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যশক্তি আশ্রয় করিয়া যোগিগণ পরমপদের অভিমুখে যাত্রা করেন। সমগ্র বিশ্বের তিনি মধ্যভূত, বিশ্বের হৃদয়-গুহায় অতিগুপ্তরূপে তিনি নিহিত। মানব নিরন্তর শ্বাস-উচ্ছ্বাসশীল এবং নানা দ্বন্দ্বের উপঘাতে পীড়িত বলিয়া মধ্যমার্গে সঞ্চরণশীল সমগ্র বস্তুর মধ্যভূত এই শক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। অন্যান্য বিরুদ্ধ প্রাণ ও অপানের বৃত্তি-সংঘট্টের দ্বারা জীবদেহের সমগ্র কার্য ও চিন্তা পরিব্যাপ্ত। সুতরাং কোন না কোন প্রক্রিয়ায় ঐ বৃত্তিসমূহকে অভিভূত করা আবশ্যক। বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের বিরোধ উপশান্ত হইলে সুষুম্নাস্থিত মধ্যম প্রাণে পরাশক্তির সঞ্চার হইয়াছে এরূপ ভাবনা করা কর্তব্য। এই মধ্যম প্রাণই উদান নামক প্রাণব্রহ্ম। যখন দেহাদিতে অহম্ভাব ত্যাগ হইবে এবং পূর্ণাহন্তায় সমাবেশ সিদ্ধ হইবে তখনই সব ভাবনা সফল হইয়াছে মনে করিতে হইবে। অহম্ভাব পরামর্শের জন্য ইহা ক্রমশঃ কর্তব্য। যোগী পূর্ণাহন্তাময় মূলমন্ত্রের সঙ্গে পরাশক্তির সামরস্য চিন্তা করিবেন। এইরূপ ভাবনার ফলে প্রাণাদি সংস্পর্শশূন্য স্পন্দ স্বয়ং উদিত হইবে। এই স্পন্দনের দ্বারা পূর্বোক্ত সামরস্য লাভ আর কঠিন থাকিবে না।

এই পর্যন্ত সিদ্ধ হইলে ভাবনাধ্বায় মন্ত্রবীর্যের সার সমুদিত হইয়া থাকে। ইহাই অভিমান উদয়রূপ রহস্ত। তারপর দেহ, প্রাণ প্রভৃতি পরিচ্ছিন্ন প্রমাতাতে বিদ্যমান অভিমান পরিহারপূর্বক এই অভিমান আনন্দচক্র হইতে উত্থান করাইয়া মূলাধারে স্থাপন করিতে হয়।

এতদ্দুর পর্যন্ত প্রারম্ভিক প্রক্রিয়া। ইহার পর বেধক্রিয়ার সময় আসে। প্রথমে, আধার প্রভৃতি ষোড়শ কেন্দ্রগুলিকে একটি একটি করিয়া বেধ করিতে হয়। বেধন কার্যে করণ নাদ। উহা মন্ত্রাত্মক প্রাণরূপে অথবা স্ফুরত্তার উন্মেষরূপে আবির্ভূত হয়। এখানে সূক্ষ্ম যোগ ও প্রয়োগের অপেক্ষা আছে।

উন্মিষিত স্ফুরত্তার তীব্র উত্তেজনা সঞ্চারই সূক্ষ্ম যোগ ব্যাপার। ইহার প্রয়োগ এইরূপ যে প্রাণাত্মক মন্ত্র পূর্বোক্ত উত্তেজনাবশতঃ নিজস্থান ত্যাগ করিয়া কিছু ঊর্ধ্বে সুষুম্না মার্গ দ্বারা আরোহণ করে। এই আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে কৌলিক মত অনুসারে সব আধার ও সব গ্রন্থির বেধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। বেধক্রিয়া সমাবেশরূপ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। দ্বাদশান্তে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে মহামায়া পর্যন্ত নিখিল বন্ধন পরিহৃত হইয়া যায়; তারপর ধ্রুবপদে স্থিতি। অন্তিম বেধ সম্পন্ন হইলে পর মহাব্যাপ্তির আবির্ভাব ঘটে। উহা নিত্যোদিত পরাশক্তির সামরস্যরূপ। এই পর্যন্ত যোগসম্পন্ন হইলে পরা-শক্তির সঙ্গে অভিন্নতা স্ফুরিত হয়। ঐ অভিন্নতা আবার শিবতাদাত্ম্য-রূপ।

কৌলিক প্রক্রিয়ায় প্রথম প্রপঞ্চ এই পর্যন্ত। পরমশিবের সঙ্গে অভিন্নতা এবং তাহার ফল সমস্তই এই প্রপঞ্চের অন্তর্গত। ইহার পর দ্বিতীয় প্রপঞ্চ। দ্বাদশান্তে প্রসরণশীল যে শক্তিধারা তাহার সাহায্যে মধ্যমমার্গের পথে হৃদয় আপূরিত হইলে পরমানন্দ প্রকটিত হইয়া থাকে। এই আনন্দ পরামৃত প্রবাহ বলিয়া জানিতে হইবে।

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য যে হৃদয়ে প্রবিষ্ট পরানন্দ রসায়নের কাজ করিয়া থাকে। যতক্ষণ উহা হৃদয়ে থাকে ততক্ষণ ভাবনাবলের দ্বারা উহার স্বসং-বেদ্যতা সম্পন্ন করা আবশ্যক। হৃদয় হইতে উচ্ছলিত পরমানন্দ প্রবাহ ধারা চারিদিকে প্রসৃত করা কর্তব্য যাহাতে ঐ প্রবাহ সমস্ত নাড়ীর অগণিত তন্তুতে গমন করিতে পারে। ইহার পর অমৃতরূপ ধ্যান করা কর্তব্য।

তারপর ঐ অমৃতের দ্বারা দেহের বাহির ও অন্তর পূরণ করা প্রয়োজন। এইভাবে স্বদেহ অমৃতময় হইলে তীব্রবেগে এই প্রবাহকে দেহস্থ রোমকূপের

মধ্য দিয়া বাহিরে বিষয়সমূহে নিরন্তর প্রেরণ করা কর্তব্য। তারপর শাক্তানন্দ জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জগৎ আপ্যায়িত হইয়াছে এইরূপ ধ্যান করা কর্তব্য। ঐ ধ্যানের ফলে অজর ও অমরভাব আসে এবং আত্মসিদ্ধিও ঘটে। কৌলিক শাস্ত্রে এই প্রক্রিয়া মৃত্যুজয়ের জন্য উপদিষ্ট হইয়া থাকে।

তান্ত্রিক বাঙ্‌ময়েও এইরূপ অথবা এতদ্‌ভিন্ন প্রক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। তান্ত্রিকগণ বলেন, প্রথমে মস্তগন্ধস্থান সংকোচ-প্রসরণরূপ কোন মুদ্রার দ্বারা নিজ সূক্ষ্ম প্রাণশক্তির উদ্বোধন আবশ্যক। এই শক্তিকে আশ্রয় করিয়া পরবর্তী ক্রিয়াসমূহের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই স্পন্দনের দ্বারা আবিষ্ট মধ্যমা কলা নামক প্রসিদ্ধ শক্তি কন্দ নামক জন্মস্থানে সুপ্ত অবস্থায় আছে। কৌলমতে জন্মস্থান আনন্দেন্দ্রিয়, তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উহা কন্দরূপ শুধু এইটুকু উভয়ে ভেদ।

যোগী অতি সাবধান চিত্তে সতত এই শক্তির ভাবনা করিবেন যতক্ষণ সমাবেশ না হয়। তারপর ভাবনাবলে পাদাঙ্গুষ্ঠে স্থিত কালাগ্নির আশ্রয় আধারকে আশ্রয় করিয়া ঊর্ধ্বে আরোহণের প্রযত্ন করা কর্তব্য।

ইহা প্রথম পর্ব। ইহা সমাপ্ত হইলে কন্দভূমিতে প্রাপ্ত শক্তিস্পন্দাত্মক বীর্য তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্ফুট ভাবনার দ্বারা স্ফুট করিবেন। তারপরে প্রাণস্পন্দরূপ ক্রিয়াশক্তি দ্বারা উক্ত বীর্য আপূরিত হয়। ইহার মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে দেহের মধ্যভূত নাড়ির প্রাপ্তি ঘটে। ইহার তিনটি প্রকার আছে। একটি ইচ্ছারূপ, যাহাতে সংকোচক্রমজাত ঊর্ধ্বারোহণ প্রযত্ন কর্তব্য। দ্বিতীয় ভাবনারূপ। তৃতীয় ক্রিয়ারূপ, যাহার দ্বারা ঊর্ধ্বগ্রন্থিসমূহের ভেদ বা বেধ হইয়া থাকে। এই গ্রন্থিগুলি গুল্‌ফ, জানু, মেঢ্র ও কন্দরূপ জানিতে হইবে।

মূলস্পন্দের আশ্রয় মস্তগন্ধস্থানের বারম্বার সংকোচ-বিকাশরূপ ক্রিয়ার তাৎপর্য নিরোধ। ইহা স্বচ্ছন্দ শাস্ত্রে বর্ণিত দিব্য করণের উপলক্ষণ।

ইড়া ও পিঙ্গলা, পার্শ্বস্থ এই নাড়ীদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছার অবষ্টম্ভ যোগের দ্বারা মধ্যমার্গে প্রবাহিত মধ্যপ্রাণ ব্রহ্মশক্তির দ্বারা সুষুম্নার আশ্রয় করা কর্তব্য। সুষুম্নায় প্রবেশ হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বিষয় হইতে বিরত হওয়া উচিত। তখন মায়ারহিত বিজ্ঞানের দ্বারা (চিদাত্মক জ্ঞানশক্তির দ্বারা) ক্রমশঃ হৃদয়াদি স্থানে স্থিত ব্রহ্মাদি কারণবর্গকে একটি একটি করিয়া ত্যাগ করিতে হয়। এখানে প্রাণাদির প্রাধান্য নাই বলিয়া ইহা বিজ্ঞানরূপ বলিয়া জানিতে হইবে।

এই ব্রহ্মাদি সৃষ্টি প্রভৃতি সংবিৎস্বভাব। তারপর মায়াগ্রন্থি ভেদ করিয়া পঞ্চ আকাশ ত্যাগ করিবেন। তখন ব্রহ্মাদি শিবান্ত কারণসমূহের ঊর্ধ্বে বিরাজ-মানা—সমনা নামক কুণ্ডলীশক্তিকে লাভ করিতে হইবে। উহারই গর্ভে শূন্যাতিশূন্য অখিল বিশ্ব কুণ্ডলের ন্যায় অবস্থিত। সমনা প্রাপ্তির পর ঊর্ধ্বে বিরতি; এখানে উন্মনা প্রাপ্তি হয়। উহাই পরশিব দশা—পরসামরস্যরূপ পরব্যোম।